সবারে আমি নমি

কানন দেবী

অনুলিখন

সন্ধ্যা সেন

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ভূমিকা

জীবনী কেন লিখলাম সে সম্বন্ধে এই জীবন পর্য্যালোচনার প্রথমে ও শেষে যা বলেছি, তার চেয়ে নূতন করে আর কি বলব? একই কথার পুনরাবৃত্তি না করেও এইটুকুই বলতে পারি যে এই সূত্র ধরে পিছনে ফেলে আসা নানা রং-এর দিনগুলিব দিকে তাকিয়ে আনন্দ, বেদনা, সংঘাত ও দ্বন্দ্বের বিচিত্র পর্য্যায়ে পরিক্রমার মধ্যে মানস পরিণতির বিভিন্ন অধ্যায়কে আস্বাদ করা যে কত আনন্দ সেই কথাটিই হৃদয়ংগম করা গেল জীবনের নানান ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মালা গাঁথার সময়।

আর এই প্রসঙ্গে যার নাম অপরিহার্য তিনি হলেন শ্রীমতী সন্ধ্যা সেন। ওর অমন অস্থির তাগাদার তাড়া না থাকলে এ জীবনে হয়তো কোনো দিনই লেখা হয়ে উঠতো না। এর আগে অনেকবার অনেকেই এই আবেদন নিয়ে এসেছেন, এবং সকলকেই আমার এ বিষয়ে নিস্পৃহতার উল্লেখ করে নিবস্ত করতে পেরেছি। কিন্তু হার মানতে হলো সন্ধ্যার ব্যাকুল আগ্রহের কাছে। কেন জানিনা হঠাৎই একদিন সম্মতি দিয়ে ফেললাম। ওর আবদারের সংগে শ্রদ্ধেয় তুষারবাবুর আগ্রহ মিশে আমার সকল আপত্তিকে ধূলিসাৎ করে দিল। তারপরে দুজনে মিলে বসে যখন অতীতের পর্দাটা তুলে একটি একটি করে এগিয়ে চলার সিঁড়িগুলি আবিষ্কার করতে লাগলাম তখন মনে হোলো ভুল করিনি। জীবনকে অধ্যয়ন ও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠার জীবনদর্শনের স্বরূপকে উপলব্ধি করায় কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো একটা আনন্দ তো আছেই। আর উপরি পাওনা হিসাবে পাওয়া গেল আত্ম বিশ্লেষণের আলোয় চিত্তশুদ্ধি ঘটানোর নিটোল নিবিড় তৃপ্তি। নিজেকে যেন নতুন করে জানলাম আর সেই সঙ্গে বহু ঘটনায়, বেদনায় বহুজনের সংস্পর্শে গড়ে ওঠা ব্যক্তিত্বকে। মন্দির পরিক্রমা করে দেবতাদের প্রণাম জানানোর মতোই প্রণাম জানাবার সুযোগ পেলাম তাঁদের যাঁদের স্নেহ, শ্রদ্ধা, বিদ্বেষ ও বিরোধিতায় আমি আজ এই আমি হতে পেরেছি।

ঠিক এই কারণেই সন্ধ্যার সংগে একটা নিবিড় আত্মিক সম্বন্ধকে অনুভব করতে পারছি। ও আমায় ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে আমার কল্যাণ-কামী এইটুকুই জানতাম। কিন্তু ভালবাসার যে সংবেদনশীলতা থাকলে অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করে তার মনের যথার্থ খবরটি টেনে বার করা যায় সেই গভীর বোধের সহজ আলোতেই ও আমার দ্বন্দ্ব, বেদনা ও আনন্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপটি যেন দেখতে পেয়েছে। এই খবরটি আমার কাছে নূতন উপলব্ধি। একটি ইঙ্গিতেই ও বুঝে নিয়েছে এমন অনেক কথা যা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েও বোঝানো যায় না—ওর দরদ ভেজা প্রশ্নের উত্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই বেরিয়ে এসেছে এমন অনেক অনুভব যা কোনোদিন কারো কাছে প্রকাশ করার কল্পনাও করিনি। শুধু তাই নয়। বলতে বলতে কখন যে আমায় বলার নেশায় পেয়ে বসেছে বুঝতেই পারিনি। আমি যে এত কথা বলতে পারি—এটাও আমার কাছে একটা অভিজ্ঞতা।

ওর মধ্যের যে বস্তুটি আমায় অবাক করেছে সেটি হোলো লিখতে জেনেও আত্মসংবরণ করার সংযম। আমার বক্তব্য ঠিক আমার ভাষায় হওয়া চাই এবং তাতে আমার ভাবের ছায়াই থাকবে—ঠিক এই নীতিই ও নিষ্ঠার সঙ্গে মেনেছে। অনুলেখিকার কোনো কেরামতী দেখাতে চায়নি। হয়ত সেইজন্যই আমার জীবনীতে আমি যেমন আমাকে খুঁজে পেয়েছি, আমার পাঠকরাও পেয়েছেন। 'অমৃত' পত্রিকায় এ কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নানান প্রান্ত থেকে অনেক চিঠি আমার কাছে এসেছে, যার মধ্যে তাদের উচ্ছ্বাসের ছায়াটি দেখতে পেয়েছি। তাদের আনন্দ ও অভিনন্দন আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই আসে শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় সরকারের কথা। অন্তরালে থাকলেও আমার প্রতি তাঁর যথার্থ দরদ, শ্রদ্ধা, সম্মান বোধের পরিচয় একাধিকবার পেয়েছি এবং 'সবারে আমি নমি-'র যে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছে সে কৃতিত্বের অনেকখানি তাঁরই উদ্যম। উল্লেখযোগ্য আর একটি কথা হোলো এই যে ধারাবাহিকভাবে 'অমৃতে' প্রকাশিত হবার আগে এই পত্রিকারই বেশ কয়েকটি বিশেষ সংখ্যায় বিভিন্ন শিরোনামায় প্রথম জীবনের কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমনীন্দ্র রায়ের উদ্যোগে। এই সুযোগে তাকেও আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার অভিজ্ঞতা, সন্ধ্যার একাগ্রতা ও সহৃদয় রসিকদের আগ্রহের ফসল 'সবারে আমি নমি' আমি আপনাদের হাতেই তুলে দিলাম এর ভালমন্দ সবটুকু নিয়ে। এ বই যদি সমাদৃত হয় তার মূলেও থাকবে সুপ্রিয়বাবুর রসানুভূতি ও বইটিকে সবদিক দিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলবার একাগ্র চেষ্টা। শেষ বিচারের ভার মহাকালের হাতে।

কানন দেবী

অনুলেখিকার নিবেদন

আমার নিজের বলার বিশেষ কিছু নেই। শুধু এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকটি ঘটনার ছবি তুলে ধরে আমার বক্তব্য পেশ করবার চেষ্টা করব।

এক নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়া কিশোরী (কিশোরী না বলে তাকে বালিকা বলাই বোধহয় সঙ্গত), পিতৃহীন হয়ে মার হাত ধরে আশ্রয় নিলো এক আত্মীয়ের বাড়ি। সেখানে উভয়ে মিলে শুধুমাত্র দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য বিনাবেতনের পাচিকা ও পরিচারিকার কাজ করার বিনিময়ে তাদের কপালে জুটেছে এমন কটুবাক্য ও হৃদয়হীন আচরণ যে আচরণ মানুষ সবেতন পরিচারিকার প্রতিও করতে দ্বিধাবোধ করে। একদিন লাঞ্ছনার মাত্রা চরমে উঠতে সেই সম্বলহীনা বালিকা মরীয়া হয়ে তার মার হাত ধরে পথে বেরোলো, কোথাও তার দাঁড়াবার ঠাঁই নেই আর জীবনের নিরাপত্তা অনিশ্চিত একথা জেনেও।

দ্বিতীয় ছবির দৃশ্যপট কোলকাতারই এক অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে। সেই মেয়েটিরই জয়দৃপ্ত মধ্যাহ্নের একদিনের ঘটনা। আজ তিনি অত্যাচারিতা নন—সমাজের শীর্ষস্থানীয়াদের অন্যতমা। ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির মুকুটমণি, অভিনয়ে সংগীতে অনন্যা, সমাজের বহুধা বিস্তৃত কল্যাণকর্মে পুরোধাস্থানের অধিকারিনী—এককথায় এক দীপ্তিমতী ব্যক্তিত্ব. যাঁকে অনায়াসে dimensational personality বলা যায়। সেদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। তাঁকে দেখে স্বয়ং রাজ্যপাল সম্মান প্রদর্শনার্থে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

সহরের সেরা নাগরিকবৃন্দ, শিল্পীমহল বিদগ্ধ রসিকের দল এগিয়ে এসে তার সংগে সৌজন্যে বিনিময় করে যেন কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছিল। অটোগ্রাফ শিকারী পরিবেষ্টিতা গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছেন, তবু মুখে এতটুকু বিকার নেই। প্রসন্ন হাসির অকৃপণ দানে সকলের হৃদয় ভরে দেওয়ায় নেই ক্লান্তি। ছোটবড় সকলের কাছেই করজোড়ে অভিবাদনরতা। এ অভিবাদনে কোনো ভান নেই ; অভিনয় নেই। হৃদয়ের সৌজন্যবোধ ও মানুষের প্রতি সম্মানবোধ থেকে উৎসারিত বলেই তা সকলের অন্তর স্পর্শ করে।

একই মানুষের দুটি পরস্পরবিরোধী জীবনের এতবড় দূরত্বের পরিপূরণ, ধূলি থেকে আকাশের উত্তরণের কাহিনী পৃথিবীর যে কোনো দেশে, যে কোনো মানুষের কাছে যে কোনো সময় নিঃসন্দেহে এক পরমাশ্চর্য্যের বিষয়বস্তু।

আবার প্রতিদিনের অভ্যস্ত সংসারজীবনে নিরালা গৃহকোণে দেখেছি দীনতিদীনের জন্য এঁর হৃদয়ভরা সমবেদনার দাক্ষিণ্য।

সরস্বতীপূজার প্রীতিভোজে পাড়ার সকলের (কোনো নামকরা লোক সেখানে ছিলেন না) ভোজনের মাঝেই বাইরের গেটে দারোয়ানদের ভিখারীদের ভীড় তাড়া করতে দেখে ওঁকে নিজে ছুটে গিয়ে বলতে শুনেছি— 'একটি লোকও যদি ফিরে যায় আমি আজ খাবনা। এটা মনে রেখে কাজ কোরো।'

সেই ভিখারীর দল ভেতরে এল। বাড়ির বিরাট প্রাংগণে তাদের বসিয়ে নিজে হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। তারপর ভৃত্যদের নির্দেশ দিলেন, 'আমরা যে কজন খেতে বাকী আছি তাদের খাবার রেখে বাদবাকী মাটির হাঁড়ীতে কি গেলাসে করে ওদের দিয়ে দাও। বাড়ি নিয়ে যাক।'

'সব দিয়ে দেব ?' ওরা ইতস্ততঃ করে।

'সব দিয়ে দেবে। আমাদের ত এসব খাবার সুযোগ প্রায় মেলে। ওদের ত তা হয়না।' তারপর বললেন, 'আমার যেমন কোথাও কোনো ভালো খাবার খেলেই রাণার জন্য মন কেমন করে। ওদেরও হয়ত তেমনই খেতে খেতে ছেলেমেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরের কৃপায় আমি হয়ত ইচ্ছে করলে রাণাকে যে করে হোক খাওয়াতে পারি ওরা ত তা পারবেনা। একদিন অন্ততঃ ওদের ইচ্ছেটা পূর্ণ করার চেষ্টা করি, যতটুকু সাধ্যে কুলোয়।'

এইরকম অনেক ছোটো খাটো ঘটনার আয়নায় দেখি তার বিরাট বিস্তৃত হৃদয়ের ছায়া। লক্ষ লোকের সভায় হাততালি পাবার জন্য মানুষ ঝোঁকের মাথায় অনেক মহৎ কাজ করে ফেলতেও পারে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালেও ফুলের মত ফুটে-ওঠা এই নীরব অনাড়ম্বর মহত্ব ? এর কোনো তুলনা আছে ? চরম গৌরবের মুহূর্তেও তিনি জীবনের দ্বন্দ্ব-করুণ দিনগুলির কথা মনে রাখতে পেরেছেন বলেই তাঁর জীবন ও কর্মে এমন আশ্চর্য ভারসাম্য দেখা যায়। আর নানান বিরোধী শক্তির সমন্বয়ী যোগফল

হলেন আজকের কানন দেবী যাকে একটু আগেই আমি dimensational personality বলেছি।

ওঁর জীবনের টুকরো টুকরো মুহূর্তে নানা ঘটনায় জলে ওঠা ছবিগুলি আমায় বিহ্বল করেছে। মনে হয়েছে এমন জীবনের জীবনী যদি লেখা নাই হোলো তবে আর 'জীবনী' কথাটার সৃষ্টি কিসের জন্য? আপন পুরুষাকারের শক্তিতে সব বাধাকে অতিক্রম করে আজ তিনি জয়ী। তবু কখনও কোনো ঔদ্ধত্যের রূঢ়তা, অভিযোগের মালিন্য অথবা ঐশ্বর্যের অহং-কারকে ওঁর মধুর নম্রতা ও সরলতার ওপর ছায়া ফেলতে দেখিনি।

সবাই ওঁর বাহিরের অপরিমিত ঐশ্বর্যের খবর জানে। কিন্তু যতই বিপুল হোক ওঁর অন্তরের ঐশ্বর্যের কাছে সে সম্পদ ম্লান হয়ে যায়। যত বেশী ওঁর কাছে এসেছি এই কথাটিই অনুভব করেছি আর মুগ্ধ হয়েছি। সেই মুগ্ধ অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন রইল এই অনুলিখনীতে। আমি যতদূর সম্ভব ওঁর ভাষা, কথা বলার সুবিখ্যাত মধুর ভঙ্গি এমনকি সুষমামণ্ডিত ম্যানারিজমও রাখবার চেষ্টা করেছি। এই মুগ্ধতা যদি কারো অন্তরকে এতটুকুও দোলা দিতে পারে আমি ধন্য হব।

সন্ধ্যা সেন

ঝড়-তুফানের কাণ্ডারী

আমার প্রাণের গোপালকে—

তখন খুবই ছোট। কিন্তু কোন বই হাতে এলেই বুঝি না-বুঝি তাই নিয়েই পড়ে থাকতাম। পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত হলে ত কথাই নেই। এমনি ভাবেই একদিন ভাগবতের গল্পসঞ্চয়নের একটি বই হাতে এল। তারই একটি গল্পে ছিল, এক পণ্ডিত রাজাকে রোজ ভাগবত পড়ে শোনান। শোনানর শেষে রোজই প্রশ্ন করেন, "রাজা, বুঝলে কিছু?" রাজা হেসে বলতেন, "তুমি আগে বোঝো।"...এমনি করে কাটল কিছুদিন। হঠাৎ একদিন পণ্ডিতের রক্তে বইল বৈরাগ্যের জোয়ার। পুঁথি রইল পড়ে। সংসার হোল বিষ। একনিমেষে সব ছেড়ে চলে যান বহুদূরে, চেনামহলের সীমানা ছাড়িয়ে। যাবার আগে রাজাকে একটি চিঠি লিখে রেখে যান। তাতে লেখা ছিল শুধু একটি কথা "রাজা বুঝেছি"।

গল্পটি তখন বুঝতে না পারলেও মনে গভীর দাগ কেটেছিল। যেমন কোন রাগের নাম না জানলেও শ্রুতিমধুর সুর সারাক্ষণ প্রাণে গুন গুন করে। আজ জীবনের পরিণত লগ্নে সেই কথাটি যেন তাঁর সকল ব্যাকুল মাধুর্যে একখানি ছবি হয়ে ওঠে।

সবার অনুরোধে আজ আমার জীবন-দর্শনের ছবি আঁকতে বসে পণ্ডিতের ঐ বক্তব্যকেই একটু পরিবর্তন করে বলতে ইচ্ছে করে, একটি কথা ঠিক না বুঝলেও বোঝার কিনারায় এসেছি যে জীবনে সম্মান, মর্যাদা কেহ হাতে তুলে দেয় না। অতি সহজ বস্তুও পাবার পথে বহু বিঘ্ন। অনেক পোড় খেয়ে, অনেক বেদনা বয়ে, অনেক রক্ত-ঝরা অন্তর্দ্বন্দ্বের বন্ধুর পথে চলে বুঝেছি পৃথিবীটা সরল নয়। কঠিন পর্বতের মত এবড়ো-খেবড়ো। গাঁইতি দিয়ে কেটে কেটে তাকে সমতল করে নিজের চলার পথ নিজে তৈরী করে নিতে হয়। এই পথের বিবরণ জানাবার তাগিদ এসেছে। জীবনে কোন কাজ এত কঠিন মনে হয়নি, যেমন মনে হচ্ছে আজকের এই আত্মবিশ্লেষণ আর পিছন ফিরে তাকিয়ে স্মৃতিচারণ। যা একান্তই অনুভবের বস্তু, প্রকাশ করতে গেলে তার অনেকখানি রসই অপচিত হয়ে যায়।

জীবনী লেখায় পক্ষপাতী আমি নই। ওতে আমার মন কোনদিনই সায় দেয় না। জীবনী লেখা তাঁদের সাজে যাদের চারিত্রিক মহত্ব ও

বিরাটত্ব আলোক স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকে অনেকদূর অবধি আলোর রেশ ছড়িয়ে। সামান্য সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি শুধু বলতে পারি আমার পথচলার কিছু অভিজ্ঞতার কাহিনী। কবির ভাষায় "জীবনে যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নেই"—"সেই তুলনা তার নেই"—সেই তুলনা বিহীনকে অনুভব করার বিস্ময় রোমাঞ্চ। জীবনী লেখার মত স্পর্ধা আমার নেই। অতএব আমার এই প্রচেষ্টাকে কেউ যেন 'জীবনী' ভেবে ভুল না করেন এই আমার বিনীত অনুরোধ।

জীবনের অনেক উপলব্ধির মত আমার আর একটা উপলব্ধ সত্য হোল এই যে ঘটনাটাই জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। অনেক সময় ঘটনার জঞ্জালস্তূপ সত্যের রূপকে আবৃত করে। তাই জীবনের ঘটনা বর্ণনায় আমি বিশ্বাসী নই। ঘটনাকে মনেও রাখিনি। ঘটনার অতীত যে অপরূপের কাছে কৃতজ্ঞ-নম্রচিত্ত বলতে পারি "এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর", যাঁর অযাচিত করুণায় জীবনের সকল বাধা দৈন্য আলোর বন্যায় ভেসে গেছে, অকল্পিত, অভাবিত অসম্ভবকে না চাইতেই যিনি হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছিল তাঁকে দেখিনি। কিন্তু তাঁর কল্যাণ স্পর্শ অনুভব করেছি বারবার আর বারবার বিস্মিত হয়েছি—"এ কেমন করে সম্ভব হোল, আমি ত এর যোগ্য নই"—এই বিস্ময়ের, এই আনন্দের কণামাত্রও যদি কারো হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারি তাহলেই আমি ধন্য।

জীবনবিধাতার সেই বরদানের ফলেই হয়ত পেয়েছি সবার ভালবাসা ও উৎসাহ যা বারবার আমায় এগিয়ে চলবার প্রেরণা জুগিয়েছে। এ ঋণ ত শোধ হবার নয়। কিন্তু জীবনের অনেক বড় দায়ের মত ঋণ স্বীকারও একটা চূড়ান্ত দায়। জীবনের পাতাগুলো উল্টে দেখবার সময় সবাইকে আমার প্রণাম জানানোর কর্তব্য পালন করার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

কতদিনের কথা। তবু মনে হয় যেন সেদিনের। ছোটবেলা থেকে আমি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। যে বয়সে মেয়েরা সঙ্গিনীদের সঙ্গে হেসে-খেলে বেড়ায়, সেই বয়স থেকেই আমি একলা থাকতে ভালবাসতাম। আপন মনে পুতুল খেলতাম। কতরকম করে পুতুলের ঘর সাজাতাম, বেশ বানাতাম, আবার ভাঙতাম, আবার গড়তাম। এই ঘরসংসার গড়ার নেশাই ছিল আমার সকল সত্তা জুড়ে। এ নেশা আজও কাটেনি। চারপাশে আমার বয়সী মেয়েদের খেলাধুলা কোনটাই আমার মনের মত ছিল না।

সবাইকে সভয়ে এড়িয়ে চলতাম। কারণ চেষ্টা করেও খাপ খাইয়ে চলতে পারব না, অজান্তেই যেন এটা বুঝে ফেলেছিলাম। শিশুমন অনেক দিক থেকে ঠিক বিজ্ঞব্যক্তির চেয়েও প্র্যাকটিকাল। অনেক জিনিস দেখেছি, বিজ্ঞদেরও বুঝতে দেরি হয়, কিন্তু শিশুরা যেন সহজাত অনুভূতির মত এক নিমেষেই বুঝে ফেলে কোনটা তাদের এলাকার মধ্যে, কোনটা নয়। কিংবা অল্পবয়সে ঘা খাওয়ার দরুন আমার অনুভূতি গড়পড়তা অন্য পাঁচটা মেয়ের চেয়ে তীক্ষ্ণ ছিল এমনও হতে পারে। যাঁরা স্নেহ করতেন তাঁরা বলতেন "লাজুক", অন্যেরা কেউ ভাবতেন "গরবিনী", কেউ ভাবত "কুনো"—তবু স্বভাব বদলাতে পারিনি।

যাই হোক, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন বাবাকে হারালাম। চারিদিকে যেন অন্ধকার নেমে এল। মনের দিক থেকে বেদনার ভার ত ছিলই। তার উপর ছিল দুশ্চিন্তার বোঝা। সংসারে আমি, দিদি ও মা ছাড়া কেউ নেই। দিদির বিয়ে তার আগেই হয়ে গেছে। ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই, শোক সামলে ওঠবার অবকাশ শেষ না হতেই একটা প্রচণ্ড দায়িত্বের তাড়না যেন চাবুক মেরে অস্থির করে তুলেছিল। কি করে চলবে? আমার বাবা (শ্রীরতনচন্দ্র দাস) মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন। এছাড়া সোনারূপোর ছোটোখাটো একটা দোকানও ছিল। আয় মন্দ ছিলো না। কিন্তু নানারকম কু-অভ্যাসের জন্য আয়ের চেয়ে তাঁর ব্যয়ের অঙ্কটাই ছিল বেশী। এবং সেই কারণেই আমাদের জন্য মোটা অঙ্কের ঋণ ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারেননি।

একটু বড় হয়ে কারো কারো কাছে শুনেছি মা বাবার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। আবার এর উল্টোটাও শুনেছি। কোনটা সত্যি জানি না। কিন্তু এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি "মানুষ" সেই পরিচয়টাই আমার কাছে যথেষ্ট। শুধু দেখেছি বাবার প্রতি তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসা কোনো বিবাহিত পত্নীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। হয়ত বা সেই ভালবাসা-জাত কর্তব্যবোধের দায়িত্বেই বাবার সমস্ত ঋণভার অম্লানবদনে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। তাই দরিদ্রের সংসারের যা কিছু সোনাদানা ও বিনিময়ে অর্থ পাবার মত জিনিসপত্র ছিল সব বিক্রী করে বাবার ঋণ শোধ করলেন।

এরপরই শুরু হোলো চরম দুরবস্থা। একবেলার আহার সবদিন

জুটত না। জীর্ণতম বস্ত্র মায়ের অঙ্গে, আমার অবস্থাও একইরকম। তখন কোন উপায়ান্তর না দেখে দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি যেয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। আশ্রয়দাতারা যে প্রসন্নমনে আশ্রয় দেননি সেকথা বলাই বাহুল্য।

মাথার ওপর ছাদ একটা জুটল। কিন্তু সে কেমন করে? আমরা যাওয়ার পর তারা ঝি রাঁধুনী দুই-ই ছাড়িয়ে দিলেন। রান্নাবান্না এবং অন্যান্য সমস্ত কাজই মা করতেন। আমি ছোটো। তবু সবকাজে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। কিন্তু আমরা দুজন মিলে প্রাণপাত পরিশ্রম করেও তাঁদের খুশী করতে পারিনি। দিবারাত্র তর্জন গর্জন ও কটু-বাক্যের তাড়নায় প্রতিমুহূর্ত্ত সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হোতো। সে অপমান ও লাঞ্ছনার ভয়াবহ দিনগুলির কথা মনে হলে আজও শিউরে উঠি। যাইহোক চরমে না উঠলে বোধহয় কোনো দুরবস্থা থেকেই মুক্তি পাওয়া যায় না। একদিন আমার মায়ের হাত ফসকে একটা চায়ের প্লেট পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। আজও মনে পড়ে বাড়িশুদ্ধ সবাই মাকে যেন তেড়ে মারতে এল। আমি তখন খুবই ছোটো। কিন্তু মার সে লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, "মা, আর একমুহূর্তও এখানে নয়, উপোষ করে মরব সেও ভালো। এখনই এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি চল।"

মারও তখন অগ্রপশ্চাৎ ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল না। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মনে পড়ে এক উঠান, অনেক ঘর এইরকমই একটা বাড়িতে আমরা উঠলাম। বাড়ির মালিকের সঙ্গে আগে একটু জানাশোনা থাকায় যৎসামান্য ভাড়ায় তিনি থাকতে দিতে রাজী হলেন। অবশ্য এখন যেটা বলছি যৎসামান্য তখন সেটাই চিন্তাগ্রস্থ হবার মত অঙ্ক ছিল। সেখানেও কায়ক্লেশে কোন রকমে দিন কাটত।

দাঁড়াবার মাটি যেন পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। তবু তাকে ধরেই দাঁড়াবার করুণ প্রচেষ্টা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই কোথাও না কোথাও একটুকরো আলোর দিশা জাগিয়ে মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা যোগান। একদিন একলা বসে আছি। মনটা বিষণ্ণতায় ভরে গেছে। হঠাৎ মনে হোলো আমার ত ভেঙে পড়লে চলবে না। যেমন করে হোক দাঁড়াতেই হবে। অন্তত মায়ের মুখ চেয়েও একটা চেষ্টা করা দরকার। না হলে হয়ত মাকেও হারাতে হবে। চারপাশের পরিবেশে যেন শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে

আসত। সব সময় মনে হোত আমি এখানের নয়। এই আবহাওয়া পরিবেশ সবের ওপরে আমায় উঠতে হবে। এই সময় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাকে বৌদি বলে ডাকতাম। খুব সংবেদনশীল অন্তর। আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে কতভাবে যে সাহায্য করতেন আজও ভুলিনি। তখন কারো মুখের এতটুকু মিষ্টি কথারই অনেকখানি দাম। বৌদি ছিলেন যেন মরুভূমিতে ওয়েসিসের স্বপ্ন।

এমনি সময়েই একদিন আমাদের পরিচিত শ্রীতুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিতে কাজ করবার প্রস্তাব নিয়ে এলেন। আমি তাঁকে কাকাবাবু বলতাম। আমায় বললেন, "তোমার চেহারা ভাল, একবার যদি চান্স পাও ব্যস আর দেখতে হবে না। মা ও দিদির একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। এতটুকু মেয়েকে নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে বাইরে কাজ করতে পাঠাবো? না, এ হতে পারে না। কিন্তু আমার যতখানি বয়স ছিল, তার চেয়েও তীক্ষ্ণ ছিল অনুভূতি। আবার তার চেয়েও বড় ছিল জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা,—স্বপ্ন। আমি জেদ ধরলাম এইভাবে কোনরকমে দিনযাপনের গ্লানি বয়ে বেড়ানোর চেয়ে মৃত্যু ভাল। বাঁচার মত বাঁচতে না পারলে জন্মানোর অর্থ কি? সুন্দর জীবন এই পৃথিবীরই কোথাও না কোথাও আছেই এবং যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে যে কোন মূল্যে। তখন হয়ত এমন করে গুছিয়ে ভাবিনি। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাকে যদি গুছিয়ে বলি তাহলে এই রকমটিই দাঁড়ায়।

যাই হোক, একদিন স্টুডিওতে গেলাম। কিন্তু খুব আশাপ্রদ লাগল না। একপাশে বসে আছি ত বসেই আছি। কেউ কথাই বলে না। কাউকে চিনি না। কিন্তু মনে হচ্ছে সবাই হোমরা-চোমরা। আমার দিকে তাকানোটাও যেন তাঁদের পক্ষে সময়ের অপচয়। কেউ বা হয়ত তিরছি চোখে তাকিয়ে অনুগ্রহ করে জিজ্ঞেস করেন, "কি নাম তোমার খুকী?".

মনে হোল স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। কিন্তু হতাশা ও বিরক্তির শেষ সীমায় প্রায় পৌঁছেচি এমন সময় হাসিমুখে এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। সবার মধ্যে একটা যেন সন্ত্রস্ত ভাব দেখা গেল। উনি সোজা এগিয়ে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, "এ কি, এমন কাঁদকাঁদ মুখে বসে কেন? ভয় করছে? না, ক্ষিদে পেয়েছে?"

এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে সামলে ছিলাম, ওঁর স্নেহস্পর্শে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।—"দূর বোকা মেয়ে, কান্না কিসের? দেখবে তোমার কত সুন্দর ছবি উঠবে, সবাই দেখবে, কত নাম হবে? এ স্টুডিওটাই সেদিন কত আপনার বলে মনে হবে!"

তারপর যাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁকে বললেন—"এতটুকু মেয়েকে এইভাবে বড়দের দলে বসিয়ে রেখেছ কেন? দেখ ত ভয়ে কেমন জড়সড় হয়ে আছে? যাও, একটু বাগান-টাগানে ঘুরিয়ে আন।" আমার দিকে চেয়ে বললেন—"গাছে উঠতে পার ত? দেখগে গাছ ভর্তি কত পেয়ারা, এক লাফে উঠে পাড়বে আর খাবে।"

দমকা হাওয়ার মত ওঁর স্নেহ মাখানো কথায় মনের মেঘ কোথায় উড়ে গেল।

শুধু প্রথম দিনটিতেই নয়, কর্মজীবনের প্রথম যুগে ওঁর স্নেহ, আনুকূল্য ও সহায়তা আমায় যেন আশ্রয় দিয়েছিল। আজ বলতে দ্বিধা নেই, উনি না থাকলে ছবির কাজে নামবার হয়ত সুযোগই পেতাম না। ইনিই তখনকার সুবিখ্যাত পরিচালক স্বর্গতঃ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যাডান থিয়েটারের ব্যানারে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালিত "জয়দেব" চিত্রে রাধার ভূমিকায় আমার শিল্পীজীবন শুরু হল। এখন যত সহজে এ জীবনকে 'শিল্পীজীবন' আখ্যা দিচ্ছি তখন কি তা অজ্ঞাতসারেও ভেবেছিলাম? বোধহয় না। ন-দশ বছরের এক অনভিজ্ঞ মেয়ের পক্ষে শিল্পী শিল্প ইত্যাদি বড় বড় কথা ভাবা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। বরং এইটুকুই বলা যায় যে জীবনধারণের প্রয়োজনে অভিভাবকহীন, অসহায়, এক বালিকা ঐ একটি পথের সন্ধানই পেয়েছিল এবং স্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার চরম মুহূর্তে মরীয়া হয়ে খড়কুটোকে অবলম্বন করে বাঁচবার প্রচেষ্টার মত তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে চেয়েছিল। পরে যদি এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আমার মধ্যে শিল্পীসত্তা কিছু গড়ে উঠে থাকে তার মূলে আছে বহু সহৃদয় ব্যক্তির সম্মিলিত অবদান। আমার কৃতিত্ব অতি সামান্য।

যাক, যা বলছিলাম। আমার মতই চলচ্চিত্রেরও তখন যাকে বলে একেবারে শৈশব অবস্থা। হয়ত আমার চেয়েও আরও শৈশবাবস্থা, কারণ তখনও তার মুখে বুলি ফোটেনি। সেই যুগের চলচ্চিত্রে আমার প্রথম ছবি "জয়দেব"।

এই ছবিতে আমার ছবি ও কাজ মোটের ওপর সকলের ভালই লেগেছিল। একটা মজার কথা আজও ভুলিনি। দক্ষিণাস্বরূপ আমার হাতে এল মাত্র পাঁচটি টাকা। তাই আমার কাছে তখন লক্ষ টাকার সমান। পরে জেনেছিলাম আমার প্রকৃত বেতন ধার্য হয়েছিল পঁচিশ টাকা। সে টাকাটা নাকি দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু আমার হাতে এসে পৌঁছেছিল পাঁচ। বাকী কুড়ি টাকা কার হাত দিয়ে কোন অতলে তলিয়ে গিয়েছিল জানি না। তবে শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। এখন ভাবি আমার অনভিজ্ঞতার খেসারত মাত্র কুড়ি টাকার ওপর দিয়েই যদি গিয়ে থাকে সে আর কি এমন বেশী? তবু ত পাঁচটা টাকাও পেয়েছি, তাও ত না পেতেও পারতাম? এইভাবেই আমি চিরদিন জীবনের গরমিলের হিসেব মিলিয়ে এসেছি। তাতে আর যাই হোক, ক্ষতি হয়নি। অন্তত গোঁজামিল ত হয়নি। তাতেই আমি খুশী।

আমার ওপর বিধাতার অসীম করুণা যে একেবারে প্রথমেই জ্যোতিষ বাবুর মত হৃদয়বান মানুষের কাছে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি। উনি যেমন স্নেহপ্রবণ ছিলেন তেমনিই নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি কঠোর। আদরের সঙ্গে সঙ্গে শাসন করতেও ভুলতেন না।

প্রথমদিন স্যুটিং-এর সময় যখন আয়না ও রিফ্লেকটার ইত্যাদি নিয়ে মুখে আলো ফেলে ছবি নেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম, সারা শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। "আমি পারব না, কিছুতেই পারব না" বলে কান্না জুড়ে দিলাম। জ্যোতিষবাবু কাছে এগিয়ে এসে সেই প্রথম দিনের মত স্নেহ-কোমল স্বরে বললেন, "ছি, অত ঘাবড়াতে নেই। একটু ধৈর্য ধরে থাক, দেখ্‌ব আর কষ্ট হবে না।"—দেখলাম সত্যিই তাই।

আবার একদিন স্যুটিং-এর সময় আমার 'শট' ছিল। কিন্তু সেট তৈরী হতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি একেবারে রাধার বেশভূষাতেই পেছনের বাগানে একটা পেয়ারাগাছের কাছে গিয়ে দেখি একটু উঁচুতে ডালের কতকগুলি শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে একেবারে ঠিক ঠেসান দিয়ে বসার চেয়ারের মত হয়ে আছে। চারদিকে রোদ। ঐটুকু মাত্র ছায়া ঢাকা জায়গা। আমি একটা বেশ বড় দেখে ডাঁশা পেয়ারা নিয়ে একলাফে ঐ ডালে উঠে খেতে খেতে কখন আরামে একটু ঘুমের আমেজ এসেছে জানি না।

ওদিকে সেটের সব তৈরী। ক্যামেরা রেডী, শ্রীকৃষ্ণ এসে প্রতীক্ষমাণ। কিন্তু রাধার পাত্তা নেই। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর যখন সবাই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, কে একজন আমায় ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ারা হাতে ঐ গাছের ডালে আবিষ্কার করলেন। জ্যোতিষবাবুর কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলতেই উনি আমার গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, "দুষ্টু মেয়ে, পেয়ারা খাবার আর সময় পেলে না। তোমার জন্য সব্বার কত অসুবিধে, কাজের ক্ষতি এবং সময় নষ্ট হয়েছে জান? আর কখনও যেন কাজের সময় সেটের বাইরে না দেখি।" সেই চড় গালে যত না লেগেছিল তার চেয়ে বেশী লেগেছিল মনে। তখন কাঁদিনি, কিন্তু বাড়িতে এসে কতক্ষণ ধরে যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি তার ঠিক নেই। মা, দিদি কত আদর করে জানতে চাইলেন কি হয়েছে। আমি বলতে পারিনি। ছেলেবেলা থেকে, যত প্রচণ্ড ছিল অভিমান, তার চেয়েও বড় আত্মসম্মান। প্রাণ গেলেও নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারতাম না। মনে হোত তাতে যেন নিজেকে ছোট করা হয়। অবশ্য মার কাছে বলতে না পারার কারণ আলাদা। আমার কষ্টের কথা শুনলে মা দুঃখ পাবেন সেই ভয়েই নিজের অনেক দুঃখ ঐ বয়সেও মার কাছেও লুকোতে চাইতাম। হয়ত এই কারণেই আমি ছেলেবেলা থেকেই একটু চাপা প্রকৃতির হয়ে পড়েছি।

যাক, অবশেষে মাকে সব বলতে হোল। কারণ আমার কান্না দেখে উনি বড় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সব শুনে বললেন—"দুর, পাগল—উনি তোকে খুব ভালবাসেন তাই বকেছেন। বকুনী না খেলে কি কাজ শেখা যায়?"

তখন এত দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু আজ মনে হয় ঠিকই ত করেছেন। একজনের কাজের অবহেলার জন্য সবাইকে কি শাস্তি পেতে হয় তা প্রযোজক-জীবনে প্রতি পদে পদে অনুভব করেছি। সবাই হাঁ করে বসে আছে, হিরোইন বা হিরো হয়ত ভ্রূক্ষেপ না করে কোথাও গল্পে মত্ত, কখনও বা এসে পৌঁছলেন না, যদি বা পৌঁছলেন কাজে গা নেই বা মুড নেই। সেদিনের ঐ চড়েরই সুদূরপ্রসারী ফল পরবর্তী জীবনের মজ্জাগত নিয়ম ও শৃঙ্খলা। সেদিনের ঐ শাসন ও ভয় না থাকলে কর্মে নিষ্ঠা ও অনুরক্তি নিশ্চয়ই জন্মাত না। তাই এজন্য আজও তাঁকে প্রণাম জানাই।

এরপর ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস-এর কে পি ঘোষ পরিচালিত 'শঙ্করাচার্য'-তে অভিনয় করেছি।

তারপর আস্তে আস্তে ছবি কথা বলতে শিখল। টকির এই সবাক চিত্রের যুগে ম্যাডান থিয়েটারে 'জোর বরাত'-এর নায়িকারূপে আমার প্রথম সবাক অভিনয়ের অভিজ্ঞতা। ছবিটি রিলিজ হয়েছিল ক্রাউন সিনেমায় (এখনকার উত্তরা) ১৯৩১ সালের ২৭শে জুন।

এ-ছবি আমার প্রথম যুগের কর্মের অধ্যায়ের এক অগ্নিপরীক্ষা বলা যায়।

জীবনের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ত অনেকই থাকে। কিন্তু টকির যুগের শুরুতে সাউণ্ড রেকর্ডিং মেসিন যেদিন ম্যাডান স্টুডিওতে এসে পৌছল, সেদিন সন্দেহ, দ্বিধা, হতাশা ও ভয়মিশ্রিত যে বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে কয়েকটা মুহূর্ত কেটেছিল তার তীব্রতা আজও ভুলিনি। মেসিনটির চারিদিকে ঘুরেফিরে চোখের এ-কোণ ও-কোণ দিয়ে কৌতূহল ভরে সবাই মিলে দেখছিলাম। কিন্তু কৌতূহলের অন্তরালে যে-বস্তুটি মনকে প্রতি মুহূর্ত্তে দমিয়ে দিচ্ছিল, তাকে নির্ভেজাল ভয় বললেই বোধহয় সত্যি কথা বলা হবে।

এখনই সাউণ্ড টেস্ট হবে। কপালে কি আছে কে জানে। হয়ত এখানেই কাজের 'ইতি' হয়ে যাবে। হায়রে, নির্বাক যুগের সেই সোনার দিনগুলো কে কেড়ে নিল? কেনই বা নিল?

এই সাউণ্ড টেস্টের কত গল্প শুনেছিলাম। কত বিখ্যাত শিল্পী যাঁরা নির্বাক যুগে রীতিমত নাম করেছিলেন, 'সাউণ্ড টেস্টের' দৌরাত্ম্যে তাঁদের ছবিতে কাজ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাইক ফিটিং গলা নয়—অতএব চলবে না ওকে দিয়ে—এই অজুহাতই ত যথেষ্ট।

যে জীবনে দারিদ্র্য ও অনটন নিত্য সঙ্গী, ছবিতে উপার্জিত সামান্য অর্থে সংসার চালাতে হয়, সে-জীবনে এই যন্ত্রের আবির্ভাবকে অভিশাপ মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এ যেন নিষ্ঠুর নিয়তির মত রক্তচক্ষু মেলে অন্ধকারভরা অপেক্ষমান দুর্ভাগ্যের দিনগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

যখন আমায় ডাকা হোল, আমার অবস্থা হোল ফাঁসিকাঠে যাবার আগে অপরাধীর মত। ঠোঁটদুটো শুকিয়ে গেছে, গলা বুজে আসছে। নিজের

হৃৎকম্পের শব্দই যেন কানে বাজছে, জিভ আড়ষ্ট, চোখে সর্ষেফুল দেখছি—ঠিক এই অবস্থায় আমায় সংলাপ বলতে এবং গান গাইতেও বলা হোল। মনের এই মুহ্যমান অবস্থায় যতখানি পরিষ্কার করে বলা এবং গাওয়া সম্ভব বললাম। গলাটা কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরছে। ফল যা হবার তাই। চাপা গলার ক্লিষ্ট রুদ্ধ প্রাণহীন স্বর নিজের কানেই এত কদর্য শোনালো যে, ইচ্ছে হচ্ছিল মেসিনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই।

দৌড়ে পালিয়ে পাশের ঘরে ভয়ে জড় সড় হয়ে বসে রইলাম। চাকরি ত গেল। এখন কি উপায়!

কিন্তু না, একটু বাদেই খবর পেলাম চাকরি বহাল তবিয়তেই আছে। প্রথমের 'নার্ভাসনেস'-কে ওঁরা লিবারালি দেখেছেন। আমার কণ্ঠস্বর অমনোনীত হয়নি।

মনে মনে ভগবানকে প্রণাম জানালাম। 'জোর বরাত'-এর একটা বেদনাদায়ক ঘটনা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেল।

একটা সিনের টেক হচ্ছিল। রিহার্স্যাল অনুযায়ী যথারীতি সংলাপ বলে গেলাম। সিনের শেষে হঠাৎ ছবির হিরো ইংরাজী ফিল্মের ঢঙে আমায় জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন।...ঘটনার আকস্মিকতায় হঠাৎ বিহ্বল হয়ে পড়লাম। সামলে উঠতে সময় লাগল। যখন প্রকৃতিস্থ হলাম, বিস্ময়, বেদনা, অপমান, অভিমান, নিজের অসহায় অবস্থার জন্য কষ্ট সব মিলিয়ে একটা নিষ্ফল কান্না যেন মাথা কুটতে লাগল। অল্প বয়স, তখন ভাব-প্রবণতাও প্রবল। তাছাড়া, বাঙালী ঘরের মেয়ে, আবেগের এমন উগ্র প্রকাশে অভ্যস্ত নই। আর এ-কাজ ঘটল তাঁরই পরিচালনায় অভিভাবক ভেবে যাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। যাঁর দায়িত্বজ্ঞানের ওপর আমার এত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস! যদি অভিনয়কে স্বাভাবিক করবার জন্য এই চুম্বনের প্রয়োজন, তবে আমাকে আগে থেকে বলে মনকে কেন প্রস্তুত করবার অবকাশ দিলেন না?

জ্যোতিষবাবুকেও আমি এ প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, "বললে তুমি রাজী হতে না। ইট ইজ অ্যান এক্সপেরিমেণ্ট, অত 'টাচি' হলে চলে? আর্টিস্টদের আরো স্পোর্টিং হতে হয়। সাধারণ মানুষ যা কল্পনায় আনতে পারে না, শিল্পীরা অনায়াসে তা পারে বলেই না তারা শিল্পী।" ইত্যাদি অনেক স্তোকবাক্য শোনালেন।

কিন্তু যাই বলুন আমার মনের ভার নামল না। নিজেকে বড় অপমানিত মনে হয়েছিল, আমি কি পরিচালকের হাতের ক্রীড়নক? নিজের মতামত, স্বাধীন সত্তা কিছুই থাকবে না? ভেবেছি আর কেঁদেছি।

আজ ত নায়িকাদের সম্রাজ্ঞীর সম্মান। আমার এ-সমস্যা এ-যুগে হাস্যকর। এখন ত নায়ক-নায়িকার একটিমাত্র ইচ্ছে বা সাজেশনই এ-লাইনে বেদবাক্য। এ আঘাত আজও ভুলিনি। তবে এর মধ্যেও ভাববার কথা আছে বৈকি।

এখন চলচ্চিত্রের অগ্রগতির স্বর্ণযুগ। তবুও বোম্বে ফিল্মে আলিঙ্গন ত আছেই অথবা চুম্বনের প্রায় চালু অবস্থা। কিন্তু এই প্রগতিশীল যুগের বাংলা ছবিতে চুম্বনের অবতারণা করা যায় কিনা এ নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়'ন। কিন্তু আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে চলচ্চিত্রের শৈশবে, বাংলাদেশেরই এক পরিচালক চুম্বন-এর দৃশ্যের কথা ভেবেছিলেন এবং তাকে ছবিতে প্রয়োগ করার দুঃসাহসও হয়েছিল—এটা প্রোগ্রেসিভ মাইণ্ডের লক্ষণ নিশ্চয়। তাঁর সঙ্গে সমান তালে আমাদের মন পা ফেলতে না পারলেও, দুঃসাহসিক পরীক্ষার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নিশ্চয়ই। ভালমন্দর বিচার ত আপেক্ষিক।

যাই হোক, ঐ দৃশ্যে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে নায়ককে দুহাতে ঠেলে দেওয়ার জন্য ছাবটি ঠিক পরিবেশনযোগ্য হয়নি এবং সেইজন্যই শেষ-পর্যন্ত ঐ দৃশ্যটি এন জি হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা আজও ভুলিনি। স্টুডিওতে যে বাবুর্চি বা বেয়ারার ওপর আমাদের খাওয়াবার ভার থাকত, আপাতদৃষ্টিতে খুব হাসিখুশি চেহারা। কি বদান্যতা! সবাইকে তাড়াতাড়ি খাওয়াবার সে কি ব্যগ্রতা! কিন্তু ব্যগ্রতা' অন্তরালের কাহিনীটুকু আর কেউ জানত কিনা বলতে পারি না, তবে আমার অজানা ছিল না। ওর একটা অভ্যাস ছিল, একজনকে খাইয়ে পাঁচজনের হিসেব দেওয়া। উদ্বৃত্তাংশ যেত তারই ছাঁদায়। অন্য সবার ভাগ্যে কি জুটত জানি না। তবে লাঞ্চ বলতে আমার বরাদ্দ ছিল চায়ের প্লেটে দু' স্লাইস পাউরুটি, দু-টুকরো আলু ও চার-টুকরো মাংস। ওপর থেকে পরিমাণের সত্যিই নির্দেশ দেওয়া ছিল কিনা বলতে পারি না। তবে আমার হাতে পৌঁছত ঐটুকু এবং তালিকায় থাকত আমার মত চারজনের উপযোগী ভোজ্যবস্তুর হিসেব।

তারপর ১৯৩২ খ্রীঃ ম্যাডান থেকে 'রাধা' ফিল্মসে যোগ দিলাম। রাধা

ফিল্মে প্রথম ছবি "শ্রীগৌরাঙ্গ"র স্যুটিং শুরু হয় ১৯৩২ খ্রীঃ মাঝামাঝি। কিন্তু মুক্তিলাভ করেছিল ১৯৩৩ খ্রীঃ। এই ছবির বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রের অভিনয় আমায় শিল্পীর সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে—এ ছবির পরই কলা-রসিক সমাজে আমি 'প্রতিভাময়ী' রূপে গৃহীত ও স্বীকৃত হই। শুধু অভিনয়ই বা বলব কেন? গানের জন্যই যেন রাতারাতি একটা বিরাট কিছু হয়ে যাবার সম্মান পাওয়া এই প্রথম। অনেকেই অভিনন্দন জানালেন, আবার কেউ বা বিদ্রূপবিদ্ধ করতে ছাড়েননি। "একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর, এমনিতেই মেয়ের অহঙ্কারের সীমা নেই, এখন বোধহয় আর মাটিতে পা পড়বে না।" আমি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে ভাবতাম এত প্রশংসারই কিই বা আছে! কটূক্তিরই বা প্রয়োজন কি! আমি প্রথম দিন যেমন মনপ্রাণ ঢেলে, একাগ্রচিত্তে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজকে সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি, সেদিনও তাই করেছি।

এই সময় স্টুডিও থেকে ক্রমশঃ গ্রামোফোন কোম্পানি অবধি কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হোল। প্রথম রেকর্ড করার আমন্ত্রণ আসে "মানময়ী গার্লস স্কুল"-এর পর। অনেক পরের ঘটনা হলেও অ্যালবামের মাঝের অনেক পাতা টপকে কেন জানি না বিশেষ একটি পাতার ওপর যেন বারবার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। গান এসে আমার অভিনয়ের পাশে দাঁড়াতেই মনে হোল যেন আমার জীবনের এক পরম পাওয়ার সঙ্গে শুভদৃষ্টি ঘটল। নীরস, ক্লান্তিকর কর্মজীবন যেন রসের প্রবাহে সরস হয়ে ওঠে। কাজে যে এত আনন্দ এই প্রথম অনুভব করলাম। নিজের কণ্ঠ রেকর্ডে যখন প্রথম শুনি সে যে কি রোমাঞ্চ বলে বোঝাতে পারব না। নিজেকে যেন নতুন করে চিনলাম। আমার ভেতর থেকে কোন এক অজানা আমার ডাক শুনতে পেলাম। মনে হোল যে 'আমি' প্রতিদিন নিয়মিত সেটে আসি, তোতা-পাখির মত পার্ট মুখস্ত করি, কলের পুতুলের মত ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই, অন্যের দ্বারা লাঞ্ছিত হই, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যে আমি বড় হতে চাই, প্রতিদিনের শ্বাসরোধকারী গ্লানি, তুচ্ছতা ও অপমান থেকে মুক্ত হয়ে সুন্দরের স্বপ্ন দেখি, সেই আমিই যেন তাঁর অপরূপ মায়া ও মাধুর্যের রঙীন পাখা মেলে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাঁর সঙ্গে মুহূর্তের মিলনেও মনের মালিন্য কেটে যায়, শ্রান্তি ভুলে আবার নতুন প্রেরণায় পথ চলি।

অন্যভাবে বলা যায়, সিনেমা-জীবনকে যেন নিছক বেঁচে থাকারই বাস্তব প্রয়োজনে আঁকড়ে ধরেছিলাম। এই ভয়াবহ জীবনের নাগপাশ যখন সকল আনন্দের টুঁটি চেপে ধরে জীবনকে দুঃসহ করে তুলত তখন গানের এই স্পর্শটুকুই আমায় যেন বাঁচিয়ে দিত। মনে হোত এই ত আমার সত্যি করে বাঁচা। তা বলে কিন্তু চিত্রজগতকে আমি ছোট করছি না। জীবনে দাঁড়াবার মাটি যুগিয়েছে এই শিল্পই। সুখ সৌভাগ্য সম্মান যা কিছু পেয়েছি তাও ঐ পথ বেয়েই। অতএব সিনেমাকে তুচ্ছ করব এতবড় অকৃতজ্ঞ আমি নই। তবে এ ক্ষুব্ধতা কেন? তখনকার যুগের নায়িকাদের ত আজকের মত সাম্রাজ্ঞীর মর্যাদা ছিল না। অত্যন্ত আনন্দের কথা—আজকের যুগের নায়িকা সত্যিকারের শিল্পীর সম্মান পেয়ে থাকেন। তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছেয় শুনেছি নায়ক নির্বাচন হয়ে থাকে। কিন্তু তখনকার দিনের নায়িকা নামেমাত্র নায়িকা, কার্যতঃ প্রযোজক, পরিচালক থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত নায়কদের পর্যন্ত আজ্ঞাবাহিকা ছাড়া কিছুই ছিলেন না। মাঝে মাঝে মনে হোত আমি কি কলের পুতুল? নিজস্ব কোন সত্তা নেই? শুধু অন্যের জুলুম সহ্য করেই জীবনটা কাটাতে হবে? প্রযোজক, পরিচালকদের কথা ছেড়েই দিলাম। তাঁরা তো সবারই প্রভু। কিন্তু অল্প বয়স ও অনভিজ্ঞতার কত সুযোগই না সবাই নিয়েছে। নিরুপায় অবস্থার জন্য গ্লানিভরা মুহূর্তের সে অসহ্য যন্ত্রণা কি ভোলাব?

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কোন ছবির নায়কের হঠাৎ খেয়াল হোল আমায় 'ন্যাচারাল অ্যাকটিং' শেখাবেন। কাজের ফাঁকে সাজঘরে তাঁর হঠাৎ প্রবেশ। কি ব্যাপার! না তোমার অমুক সিনের অভিনয় বড় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অ:.রা ফ্রি হতে হবে। এখন ত সময় আছে। তাই মেক আপের আগে একটু তালিম দিয়ে দেব। তোমার জন্য আমার অভিনয়ও মাটি হয়ে যাচ্ছে যে। একে বয়োজ্যেষ্ঠ তায় 'সুপ্রতিষ্ঠিত' নায়ক। উঠতে হোল।

"দেখ, আমি তোমার হাতটা এই ভাবে ধরলে তুমি আমার দিকে ঠিক এই ভাবে তাকাবে।"

হিরো এগিয়ে এসে আমার ডান হাতটা সজোরে বুকের ওপর চেপে ধরে গদগদ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পার্ট শেখানোর কোন গরজ তখন অন্তর্হিত—কিন্তু হাত ছাড়ার নামই নেই। মেক-আপ ম্যানকে

এরই মধ্যে একফাঁকে চা খাবার পয়সা দিয়ে রেস্টুরেন্টে পাঠিয়ে সরানো হয়ে গেছে। হিরোর অপ্রত্যাশিত উদারতায় সে যতখানি উল্লসিত, আমি ঠিক ততখানিই শঙ্কিত।

হাতের মুঠির চাপ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। আর সহ্য করতে না পেরে বললাম—"বুঝেছি, ছাড়ুন। সময় হয়ে এল যে। মেক-আপ শেষ করতে হবে না?"

"না, না—সময় এখন হয়নি। শোন, অভিনয়ের সবচেয়ে বড় জিনিস হোল 'এক্সপ্রেশান'। আর সেটি নিখুঁত করতে হলে কোন রকম জড়তা থাকলে চলবে না।"

"কিন্তু হাতটা যে গেল। এবার ছাড়ুন। এখনও কি দেখানো শেষ হয়নি?"—একটু বিরক্ত হয়েই বলি।

"এত ধৈর্য্য কম হলে চলে?" বলে ডান হাত ছেড়ে বাঁ হাত ধরে সে কি বক্তৃতার পালা, "জানো—তোমরা এদেশের মেয়েরা ব্যাকওয়ার্ড বলেই অভিনয়ে এত কাঁচা? ওদেশের অভিনেত্রীদের কত 'প্রগ্রেসিভ্ আউট-লুক'। জড়িয়ে ধরা অথবা চুমু দেওয়া তাদের কাছে ডালভাত।" বলতে বলতে ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে-আসা হিরোদের চোখেমুখে ফুটে উঠত কি নির্লজ্জ লুব্ধতা আর স্থূল লোলুপতা! সারা শরীর যেন ঘৃণায়, ভয়ে শিউরে উঠত। ইচ্ছে হোত ছুটে পালাই।...এতেও কি ছাড়ান আছে? নায়ক যে আবার স্টুডিও সেটের বাইরেও তাঁর নায়কের রোল প্রলম্বিত করতে চাইতেন। সে যে কি বিড়ম্বনা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। প্রতিদিনই টেক্ অথবা রিহার্সালের সময় কাছ ঘেষে বসে "অমুক ছবি এসেছে—গ্রেটা গার্বো তাতে যা অভিনয় করেছে তোমার দেখা দরকার। অভিনয় কাকে বলে বুঝবে, শিখবে।" আমি বাড়ির কাজের দোহাই দিয়ে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি। পরের দিন আসে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখতে যাবার আমন্ত্রণ। সেও কোনরকমে এড়ানো গেল। তারপরের দিন মনটাকে চাঙ্গা করবার জন্য লেকের ধারে বেড়াতে যাবার আহ্বান—পাশ্চাত্য অভিনেত্রীদের 'স্পোর্টিং নেচার'-এর উদাহরণসহ। তা থেকেও যদি বা পালাতে পারি তাঁর ক্রুদ্ধ অপমানিত অন্তরের নীচতা থেকে রেহাই পাওয়া দায় হয়ে ওঠে। কারণে অকারণে কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আচরণ ও উদ্ধত স্বভাবের বিরুদ্ধে নালিশ, আমার অভিনয়ে স্বতস্ফূর্ততার অভাবের

দরুন 'ইম্পর্টেন্ট' রোল থেকে বাদ দিয়ে দেবার জোর সাজেশান। ওপর-ওয়ালা যদি বা আমার হয়ে ওকালতি করলেন, "কিন্তু মুখখানি ছবিতে বড় ভালো আসে। চেহারা দেখেই তো দর্শকরা কাত। অভিনয় ক্রমশঃ শিখে নেবে এখন।" হিরোর মুখ ভার। "ঐ তো আমাদের ডিফিকাল্টি স্যার। যা বলব কোন কথাই কানে নেবেন না। 'কো-একটার' ভাল না হলে অভিনয় খোলে? গরীবের কথাটা সত্যি কিনা বই রিলিজ হলেই বুঝবেন।" তারপর প্রতিশোধ নেবার অন্ধ জেদে—সেটে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে অন্যদের কাছে সদ্য দেখা কোন বিদেশী ছবির রসালো রসালো আলোচনা যে ভাবে ও ভাষায় চলত—হাল আমলের আধুনিকতম ঔপন্যাসিকও তা শুনলে লজ্জা পেতেন। এটা আমাকে এক রকম 'ইনডিরেকট টরচার' আর কি! উদ্দেশ্য 'ফাইনাল টেকে'র আগে আমার রুচিবিগর্হিত টপিকের অবতারণা করে আমার মুড নষ্ট করে দিয়ে ডিরেকটরের কাছে অন্যমনস্কতা ও অযোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা।

এ তো গেল নায়ক-সংবাদ। পরিচালক-সংবাদ আরো ভয়াবহ। ধরা যাক কোন এক নাম-করা ডিরেকটরের কথা। অমিত পানদোষ এবং রেসখেলা থেকে শুরু করে কোন গুণেই যাঁর ঘাটতি নেই। তাঁর অহেতুক কৃপাদৃষ্টিতে পড়ে শুধু বিব্রত নয়, এমন বিপন্ন হতে হয়েছে যে এভাবে কাজ করা সম্ভব কিনা—অথবা এ লাইন ছেড়ে অন্য কোন্ কাজ করা যায় সেকথাও ভাবতে শুরু করেছি। প্রথম যখন তার সঙ্গে কাজ করি আমার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি 'এক্সপ্রেশানে' তিনি বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেতেন। এমন কি আমার ভুল-ত্রুটিও তাঁর কাছে অসাধারণ প্রতিভাজাত অন্যমনস্কতারই রূপান্তর বলে মনে হোত। অবসর সময়ে সম্ভব অসম্ভব নানা গল্প বলে অল্পবয়সের ভাবপ্রবণ মনকে বিস্ময়বিহ্বল করে রাখতেন। বিভিন্ন লোকের 'টেম্পারামেন্ট' বুঝে রকমারি গল্প ফেঁদে যে কোন মানুষের মনকে একেবারে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার দক্ষতা যেন তাঁর সহজাত ক্ষমতা। এমনই নানা রকম গল্প করতে করতে হঠাৎ একদিন রেসের কথা তুললেন। কিভাবে কপর্দকশূন্য ব্যক্তিও একনিমেষে কোটিপতি হয়ে যেতে পারে তারই চমকপ্রদ চিত্র এমন কুশলতায় এঁকে গেলেন যে অনভিজ্ঞ তরুণ মন অভিভূত না হয়ে পারে না। আমিও আত্মবিস্মৃত হয়ে রেসের ঘোড়া কেমন করে ছোটে, কেমন করে মানুষ এমন আলাদীনের প্রদীপ

হাতে পায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদে মেতে উঠলাম। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই হয়ত হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "যাবে একদিন 'রেস' দেখতে? চল না, দেখবে তোমাকেই একদিন কত টাকা পাইয়ে দিই।"

ঐ টাকা পাওয়ার কথাটাই যেন চাবুকের মত আঘাত করে আমার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মার কাছে শুনেছি রেস, জুয়া এসব ভাল জিনিস নয়। এসব জিনিস মানুষকে বিভ্রান্ত করে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। এই পাপপুণ্য বোধটা যেন সংস্কারের মত মজ্জায় গেঁথে গিয়েছিল। হয়ত সেই জন্যই রেস খেলার কথায় সভয়ে আঁতকে উঠে বললাম, "ওরে বাব্বাঃ। না, না, না! ওসব রেস কেসের ব্যাপারে আমি নেই।"

"আচ্ছা নাই খেললে। একদিন রেস-কোর্সে গিয়ে খেলা দেখতে ক্ষতি কি?"

"না না—মা ভীষণ বকবেন। শুধু কি বকা? আমি ঐসব জায়গায় গেছি শুনলে হয়ত নাওয়া-খাওয়াই বন্ধ করে দেবেন—কিংবা মনে কষ্ট পেয়ে একটা অসুখ-বিসুখে পড়বেন। মার মনে আমি কিছুতেই কষ্ট দিতে পারব না।"

একমাত্র মার ক্ষেত্রেই ছিল আমার সীমাহীন দুর্বলতা এবং সেইখানেই আমার শক্তি। হয়ত সেই জন্যই অত জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে পেরেছিলাম। যাহ হোক ও নিয়ে সেদিন আর জোর করলেন না। কিন্তু কয়েকদিন বাদে এক শনিবার স্টুডিওতে দেখা হতেই এক কোণে আমায় ডেকে নিয়ে হাতে এক গোছা নোট দিতেই চমকে উঠলাম।

মনে হোল সাপে যেন ছোবল মারল। "আমি ত আপনার কাছে কোন টাকা পাই না?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

"কে বললে পাও না?" বলেই এমন একরকম করে হেসে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ খুব কাছে সরে এসে বললেন, "জান তুমি কত লাকি স্টার? তোমার নাম করে খেলে এবার অনেক টাকা পেয়েছি গো।—তারই কিছুটা তোমার প্রাপ্যহিসাবে দিতে এলাম। তোমার মত ধার্মিক না হলেও আমারও ত একটা ধর্ম অধর্ম আছে? না-কি?"—বলেই টেনে টেনে সে কি অস্বাভাবিক কদর্য হাসি। কথার ভাবভঙ্গি, হাসি রসিকতা এত নোংরা। এর পর ওঁর কাছাকাছি থাকতেও

নিজেকে ক্লেদাক্ত মনে হোল। আমি চলে আসবার চেষ্টা করতেই হাত ধরে টানলেন—"কি বোকা! এভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে?"

"কেন আপনি এভাবে আমায় আপমান করছেন? ছেড়ে দিন।" বলে একরকম জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য ঘরে যখন ছুটে পালিয়ে এলাম— নিজেকে আর সংবরণ করা গেল না। অন্য মেয়েরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস পাচ্ছে না।

কারণ সবাই জানত আমি ভীষণ চাপা। কেউ বা ভাবত অহঙ্কারী—সে কথা ত আগেই বলেছি। তবু কথা চাপা থাকে না। কোন না-কোন ভাবে এর ওর কানে যায়।

ঠোঁট উল্টে বলেন, "কত ঢং দেখব"। এতগুলো টাকা হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়াটা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। কেউ বা বলেছে নিজের দাম বাড়াচ্ছে। বোঝো না? উপরি পাওনার মতই এসব পরিপাক করেছি। কারণ নীরবে সহ্য-করা এবং বিরলে অশ্রুমোছাটা একরকম অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু বিপদ এল অন্যদিক থেকে। যাঁর একটু হাসি, দুটো কথার জন্য সবাই লালায়িত আমার মত সামান্যা অভিনেত্রীর পক্ষে তাঁরই এতবড় অনুগ্রহের দান প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা তিনিও সহ্য করেননি। তারই পরিণামস্বরূপ নানাদিক থেকে নির্যাতন শুরু হোল। অসাধারণ প্রতিভাময়ী হয়ে উঠলো "হোপলেস- একেবারে কিছু নয়"। তার সামান্য ত্রুটিও অসামান্য অপরাধ। যার ত্রুটি না থাকলেই বা খুঁজে নিতে কতক্ষণ? সবার সামনেই আমায় অহেতুক অপমান এবং তা এত স্থূলভাবে যে আমার প্রতি তাঁর আক্রোশ কারো কাছেই আর গোপন রইলো না। এই হোল আমার কর্মজীবনের অনাবৃত ছবি। এহেন জীবনকে যদি গোড়ার দিকে ভালো বাসতে না পারি--অথবা ভয়াবহ মনে করে থাকি সে কি আমার অপরাধ? এ যেন ক্ষুরের ধারে চলা—এদিকে পড়লে খাদ। ওদিকে গহ্বর। যদি এদের খেয়ালখুশীর কাছে আত্মসমর্পণ করতাম তবে তলিয়ে যেতাম কোন অতলে। আবার এঁদের অমান্য করব এমন জোরই বা কোথায়? তাহলে যে মাকে নিয়ে নিরম্বু উপবাস ও মৃত্যুবরণ। নিজের ক্ষতি যদি বা সহ্য হয় মাকে হারানোর দুঃখ ত সইবে না। যে বয়সে মেয়েরা অভিভাবকদের নিশ্চিন্ত স্নেহাশ্রয়ে হেসেখেলে বেড়ায়—সেই বয়সে জীবিকা

সম্বন্ধে কি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বোঝাই না আমার মাথার ওপর চেপেছে। যে মুহূর্তে শুচিতার স্বপ্ন-দেখা স্পর্শকাতর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার বিপরীত চিন্তাধারায় মনের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে আপোস করার করুণ প্রয়াস—কি কোনদিন ভোলবার ?

বারবার মনে হোত তখন শুদ্ধ সুন্দর জীবন রচনা করে এতবড় অবিচারের জবাব দিতে পারব কি কোনদিন ?

জীবনসাধনা বুঝি আজও অসমাপ্ত। কিন্তু সেসব কথা যথাস্থানে।

উপস্থিত যা বলছিলাম। এমন অসহনীয় মানসিক সংঘাতের মধ্যেও কাজ করছিলাম কিভাবে? ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম গ্লানিকর পরিস্থিতির উর্ধ্বে আমায় উঠতে হবে। প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন কবিতার মত সুন্দর হয়ে ওঠে। জন্মগত অধিকারে যা পাইনি অথচ যার জন্য প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে জন্মেছি ইষ্টমন্ত্রের মত জ্ঞানে অজ্ঞানে তারই ধ্যানমন্ত্র যেন জপ করতাম। কঠিন বাস্তব যখন সীমাহীন নিষ্ঠুরতায় সেই স্বপ্নকে আবিল করতে চাইত, নিজেকে ভোলবার কোন পথই থাকত না- তখনও প্রাণপণ শক্তিতে চোখ বুজে সেই জগতকে যেন অস্বীকার করার চেষ্টা করতাম। পিচ্ছিল পথে চলতে চলতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু কাদা গায়ে যদি ছিটিয়েই থাকে—তা ধুয়ে ফেলতে পেরেছি, এই আমার পরম লাভ।

কর্মজীবন—যেমনই চলতে থাকুক ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলাম সে কথা ত আগেই বলেছি। অর্থাগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভাবের তাড়না থেকে বেঁচে মনটা যেন একটু করে স্বস্তি পাচ্ছিল। সেটাও ত কম কথা নয় ?

দুশ্চিন্তার ভার লাঘব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকেও মনকে বিস্তৃত করতে পেরেছিলাম। যে বৌদি দুঃসময়ে কতভাবে সাহায্য করেছেন, কিছু টাকা হাতে আসতে তাঁকে একটা শাড়ি কিনে দিলাম। তখনকার দিনে দশ টাকাতেই দারুণ ভাল শাড়ি পাওয়া যেত। মনে পড়ে শাড়ি পেয়ে বৌদি যখন "ও আমার সোনা—তোর নিজের রোজগারের টাকার শাড়ি—এর দাম যে আমার কাছে লক্ষ টাকার চেয়েও বেশী"—বলে আদর ক'রে যখন আমায় বুকে চেপে ধরলেন—দু' চোখ বেয়ে যে ধারা গড়িয়ে পড়ল সে কি শুধু নিজের কৃতিত্বের আনন্দের অশ্রুজল না বিধাতার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা-

বোধও তাতে মেশানো ছিল? যাক সংসারের সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের শখ-শৌখীনতা মেটানোর সঙ্গতিও আমার হয়েছে এ বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ও নিজের কর্মক্ষমতায় আস্থা জন্মাতে লাগল।

আগে সেই বৌদির বিশেষ একখানা শাড়িই ছিল আমার কাছে ভাল শাড়ির চরম আদর্শ। বৌদির হাতের লাল পাথর বসানো একটা আংটির চেয়ে দামী গয়নার কথা ভাবতেই পারতাম না। যদি কোনদিন টাকা হয় তাহলে ঐ রকম একটা আংটি…এইটুকু ভেবেই থেমে যেতাম; শেষ অবধি আর ভাবা হোত না। দূর, তাই কি হয় নাকি? এত টাকা কোনদিন হবেই না।…

এরপর কর্মজীবনে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিল প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত 'মা'। অতি আধুনিকা, ঐশ্বর্যগর্বিতা ব্রজরাণীর চরিত্রে আমায় নাকি খুব মানিয়েছিল। জনপ্রিয়তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দামও যেন সবার কাছে বেড়ে গেল। আগে যারা 'দুর ছাই' করতেন এখন তাদের ব্যবহারে যেন সমীহের ছোঁয়া লাগল—আমায় মানুষ বলে যাঁরা গণ্যই করতেন না তাঁরা এখন একটু বেশীমাত্রায় আদর-আপ্যায়ন শুরু করলেন। সহকর্মীদের চোখে নেমে এল সম্ভ্রমের ছায়া। আবার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম অনেক প্রিয়জন, দুর্দিনে যাদের পরম আত্মীয় বলে মনে হয়েছে তাঁরা যেন বিমুখ হয়ে দূরে সরে যেতে লাগলেন।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা মানুষের দুঃখে দুখী হয়ে করুণা করতে পারেন, কিন্তু সুখের দিনে হাতে হাত মিলিয়ে বলতে পারেন না তোমার সুখে আমিও সুখী, তোমার আনন্দে আমি আনন্দিত। এ অভিজ্ঞতায় বেদনা যতখানি পেয়েছি তার চেয়ে বিস্মিত হয়েছি অনেক বেশী। এ যেন অন্ধ অহমিকার এক পাষাণ প্রাচীর যা মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্কের পথ আগলে দাঁড়ায়।

যাই হোক এ ত একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা। এ ছাড়াও জীবনে আনন্দের লগ্ন যতবার এসেছে ততবারই অনুভব করেছি এমন আনন্দ পৃথিবীতে দুর্লভ যার মধ্যে কোন—না-কোন দুঃখের ছায়া মিশে নেই।

বাইরের জীবনের পরিবর্তন ঘটছিলো নিশ্চয়ই। কিন্তু ভেতরের সেই আমি ছিলাম এক ও অপরিবর্তিত। আমার চারপাশের পরিধির চেনা-মহলের ব্যবহার যত কোমল হয়ে আসছিল আমার ভেতরটা ঠিক ততখানি

কঠিন প্রতিজ্ঞায় কঠোর হয়ে উঠছিল। কেবল মনে হোত নিজেকে হারিয়ে ফেললে চলবে না—তৈরি হতে হবে মস্ত বড় জীবনের জন্য। ক্ষুদ্র সাফল্যের সোপান বেয়ে সফলতর জীবনের পথে এগোতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো কিনা জানি না। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হতে দেব না। স্টুডিওতে যাবার পথে দেখতাম এক সূর্যমুখী গাছ, মাটিতে তার মূল কিন্তু নির্নিমেষ নয়নে যেন তাকিয়ে আছে সূর্যের পানে। যত তাড়াই থাক বেশ কিছুক্ষণ সেই ফুলের দিকে না তাকিয়ে পারতাম না। সময় সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। মনে হোত আমিই যেন ঐ সূর্যমুখী ফুল—মাটিতে জন্মেও যেন মাটির কেউ নই। আকাশই আমার আপন ঘর। অজ্ঞাতেই যেন ঐ সূর্যমুখীর স্বপ্ন আমার রক্তে মজ্জায় মিশে গিয়ে আমায় অলক্ষ্য প্রেরণা যোগাতো।

পড়াশোনার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু সুযোগ পাইনি। আর সুযোগ ছিল না বলেই লেখাপড়ার ওপর কেমন একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতাম। বড় ইচ্ছে ছিল আমি ডাক্তার হয়ে দরিদ্র অনাথাদের রোগের যন্ত্রণার উপশম ঘটাবো। চারিদিকে দেখতাম কতরকম অসুখে কতজন সারাক্ষণ কষ্ট পাচ্ছে। একটু চিকিৎসা, এক ফোঁটা ওষুধের অভাবে কত শিশুকে মায়ের কোল শূন্য করে করাল মৃত্যুর শিকার হতে দেখেছি। কত সময় মনে প্রশ্ন জেগেছে সর্ব্বদ্রষ্টা ঈশ্বর এদের কেন দেখতে পান না? যদি কোনো রকমে লেখাপড়ার সুযোগ পাই, আমি নিশ্চয়ই ডাক্তার হব। কিন্তু হায়। জ্ঞান হয়ে অবধি দুবেলা দু-মুঠো অন্নের চিন্তাতেই যার সমস্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করতে হোল লেখাপড়া তার কাছে বিলাস ছাড়া আর কি?

এখন অবসর সময়ে এদিকে মন দিতে পারলাম। একজন পণ্ডিত রেখেছিলাম। সামান্য কিছু পারিশ্রমিকে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ পাঠ করেই শুধু শোনাতেন না, তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে প্রকৃত বক্তব্য বুঝিয়ে দিতেন। সবটাই যে বুঝতাম এমন নয়। কিন্তু যেটুকু বুঝতে পারতাম না—বোঝবার ব্যাকুল আগ্রহে যেন মনটা তোলপাড় করে তুলত। স্টুডিওতে যেতাম, কাজ করতাম, কিন্তু ভিতরে [illegible] না-বোঝা তথ্যগুলি যেন জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত সামনে দাঁড়িয়ে আমায় থেকে থেকে অন্যমনস্ক করে দিত। মহাভারতের একটা বিশেষ ছবি আজও ভুলতে পারি না। পণ্ডিতমশায়েরই মুখে শোনা একটি গল্প। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে বিদায়কালে পাণ্ডবজননী কুন্তীকে বরপ্রার্থনা করতে বললেন। কুন্তী প্রার্থনা করলেন, "শান্তি নিরাপত্তা চাই না প্রভু। সারাক্ষণ বিপদে বিপদে আমায় ছেয়ে রেখো। কারণ যতক্ষণ বিপদ থাকবে তুমিও আমাদের পাশে থাকবে। বিপন্মুক্ত হলেই যে তুমি পালাবে। তাই বলছি প্রভু, বিপদ থেকে আমাদের কখনও মুক্ত কোরো না।"

কথাগুলি মনের গভীরে যেন দাগ কেটে বসেছিল। মেক-আপ-রুমে মেক-আপ করতে বসে হঠাৎ হাত থেমে যেত, ভাবতাম এ কী কথা? সাধ করে কোনো মানুষ বিপদকে চাইতে পারে? কি আশ্চর্য মানুষ কুন্তী! চাইবার এত জিনিস থাকতে কিনা দুম করে বিপদকেই চেয়ে বসলেন? বিপদকে চাওয়াটা যে কি দারুণ চাওয়া বুঝি বুঝি করেও বুঝে উঠতে পারতাম না। আর পারতাম না বলেই বুঝি তার আকর্ষণটা এমন তীব্র হয়ে উঠত।

...রবীন্দ্রনাথের ঋষির মত চেহারা মন টানত। কিন্তু ঐ মহাসাগরের তীরে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে ঢেউ-ওঠা ও পড়া দেখার বেশী অন্য কিছু দেখার আশা যে দুরাশা ছাড়া কিছুই নয় এইটুকুই শুধু অনুভব করতে পেরেছিলাম। পাড়ায় এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সবাই তাঁকে মাস্টারমশাই বলত। আমি তাঁকে রেখেছিলাম—কাজের ফাঁকে, কবিতা, উপন্যাস ছোট প্রবন্ধ পড়ে বুঝিয়ে দেবার জন্য।

স্টুডিওতে বসে অবসর সময়ে যে-যে কবিতা ভাল লাগত মুখস্ত করে আপনমনে আবৃত্তি করতাম। এক মুহূর্তও হেলায় হারাইনি। তাইত আর কিছু পারি না-পারি আমার জীবনদেবতাকে চ্যালেঞ্জ করে এইটুকু অন্ততঃ বলতে পারি, "তুমি জান ওগো করি নাই হেলা, পথেপ্রান্তরে করি নাই খেলা।" সত্যিই খেলা করিনি। কোনদিন, কোন সময়ে নয়।

এ যুগের নায়িকাদের মত আমাদের কণ্ট্রাক্ট বেসিস-এ কাজ করার রেওয়াজ ছিল না, অথবা গল্প, সিনারিও পড়ে নিয়ে আপন মর্জিমাফিক রোল নেওয়া অথবা না-নেওয়ার অধিকারও ছিল না। আমরা ছিলাম মাসমাহিনের শিল্পী। কণ্ট্রাক্ট একটা সই করতাম বটে। তবে সে কণ্ট্রাক্ট পড়তে অথবা বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হোত না। অতএব তাতে কি লেখা আছে না-আছে সে কথা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

'মা' কথাচিত্রে ব্রজরাণীর দর্পিত চরিত্রের অমন উজ্জ্বল প্রতিফলনের পরই 'বাসবদত্তা' যে ম্লান হয়ে যাবে অল্প বয়সের অপরিণত মন দিয়েও সে কথা বুঝেছিলাম।

কিন্তু আমার কথা কেই বা শুনছে? আর বলবার সাহসই বা কোথায়? অগত্যা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনিচ্ছা ও রুচির কাছে নিরুপায় আত্মবলিদান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

একটা ছবি সার্থক করে তুলতে হলে শিল্পীর পক্ষে যে বস্তুটি সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সেটি হোল অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। কিন্তু বেশভূষা ও ভাবভঙ্গির নির্দেশদানের সময় 'বাসবদত্তা'-র যে ছবি আমার কাছে মেলে ধরা হয়েছিলো তাতে নিজেকে 'বাসবদত্তা' কল্পনা করে পুলকিত হওয়া দূরে থাক, শালীনতাহীন পোশাকে ও ব্রীড়াহীন নির্লজ্জরূপে নিজেকে প্রকাশ করার সঙ্কোচ ও লজ্জায় মনটা যেন শতযোজন পিছিয়ে এল। রুচিবিকৃতির এই অসুন্দর প্রকাশের বিরুদ্ধে তরুণ মনের বিদ্রোহের উদ্যত ফণাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল রক্তচক্ষুর শাসনেই শুধু নয়, কণ্ট্রাক্টের আইনশৃঙ্খলা ভাঙ্গার শাস্তির ভয় দেখিয়ে। আমি আপত্তি করলাম—এমন অভব্য বেশে সহস্র দর্শকের সামনে দাঁড়ানো কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। 'বাসবদত্তা' রূপোপজীবিনী হলেও নারী ত। নারীর মধ্যে নারীসুলভ সুষমা ও সুকুমার লজ্জাই যদি না রইল---তবে আর তার আকর্ষণটা কোথায়? ঠিক এইভাবেই যে গুছিয়ে বলতে পেরেছিলাম তা নয়। কিন্তু যা বলেছিলাম তাকে গুছিয়ে বললে ঠিক এই রকমটাই দাঁড়ায়।

তার উত্তরে যা জানানো হোল তার সার মর্ম হোল এই যে কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ মানতে আমি বাধ্য। অন্যথায় ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে অর্থাৎ কোর্ট-কাছারিও হতে পারে। আমার অভিভাবকহীন অবস্থা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ভয় পাওয়ানোটাই ছিলো এঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই হুমকি প্রদর্শনের যে সত্যিই কোন কারণ ছিলো না এবং এই ভয় দেখানোটাও অমূলক সে কথা বুঝেছি অনেক পরে। কিন্তু তখন বোঝা না-বোঝা সমান। ছবির মুক্তিপ্রাপ্তি এবং তার অবশ্যপ্রাপ্য বিড়ম্বনা যা ঘটার ঘটেই গেছে।

ছবি দেখে সবাই খুব হতাশ হয়েছিলেন। 'বাসবদত্তা'য় যে আমার

অত্যন্ত নিষ্প্রাণ জড়ত্বপূর্ণ ও শ্রীবিবর্জিত দেখিয়েছে এ সম্বন্ধে সকল দর্শক ও সমালোচকই একমত হলেন। নিষ্প্রাণ ত হবারই কথা। যে চরিত্রে চোখ কান বুজে পরিচালকের ইচ্ছেয় কলের পুতুলের মত অভিনয় ক'রে যেতে হয়েছে প্রাণের আবেগ ও রং তাতে ফুটবে কেমন করে? শ্লীলতাহীন বেশ, বিকৃতরুচিসম্পন্ন অশিক্ষিত দর্শককে আমোদ দিতে পারে, কিন্তু মার্জিতরুচি কলারসিক তাতে আনন্দ পাবেন কেন?

এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো যাঁদের কর্তব্য ছিলো, তাঁরা সে কর্তব্য পালন করেননি। কিন্তু নিন্দার হলাহল পান করতে হোল একা আমায়। এক সীমাহীন গ্লানিতে সারা মন ভরে উঠল, যখন মনে হোত আমি যা নই, কখনও হতে পারি না, লোকে আমায় তাই ভাবল। এ লজ্জা রাখবার বুঝি জায়গা নেই। আপনার যথার্থ স্বরূপটি সহৃদয় দর্শকের কাছে তুলে ধরতে না পারার বেদনা যে কতখানি সে কথা সেইদিনই যেন প্রথম অনুভব করলাম। অথচ এই 'বাসবদত্তা'ই একটি চিত্তগ্রাহী সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারত যদি 'বাসবদত্তা'র বাইরের জীবনের তুচ্ছ বিষয়কে বড় করে দেখবার কাজে সময় ও অর্থের অপব্যয় না করে পরিচালক রাজনটী বাসবদত্তার নটী ও চিরন্তন নারীত্বের সুন্দর রূপটির প্রতি আলোকপাত করবার চেষ্টা করতেন। সেই আত্মহারা প্রণয়ের চিরন্তন বিষাদ মাধুর্যে হয়ত অনেক অপূর্ণতার ত্রুটিও মুছে যেতে পারত। ভবিষ্যতের অনেক অকল্পিত পাওয়ার আনন্দও সে লজ্জা ও বেদনাকে মুছে দিতে পারেনি।

এই দুঃসহ দুঃখরজনীরও অবসান ঘটল 'মানময়ী গার্লস স্কুল' রিলিজ হবার পর। ১৯৩৫ খ্রীঃ মে মাসে 'রূপবাণী'তে পরের পর দশ সপ্তাহ পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ আকর্ষণকারী এ ছবি জনপ্রিয়তায় আগের ছবিগুলিকে অনেক পিছিয়ে দিল। 'রূপবাণী'তে দশ সপ্তাহ চলার পর কর্ণওয়ালিশ টকিজে ছয় সপ্তাহ এবং তারপর পূর্ণ থিয়েটারেও চলেছিলো।

গান, অভিনয় দুই-ই চিত্তরসিকের সত্যিকারের অভিনন্দন ও প্রশংসা পেল এবং তার চেয়েও বড় কথা আমার শিল্পীসত্তা প্রকৃত সম্মান ও গৌরব— স্বীকৃতি পেল মানময়ী গার্লস স্কুলেই। কাহিনী কৌতুক রসাশ্রিত হলেও নারীহৃদয়ের জাগরণের বিস্ময় লাবণ্য রূপায়ণে আমার মন সত্যি করেই সাড়া দিতে পেরেছিল বলেই অভিনয়ে কোন খাদ ছিল না। কি তার চেয়েও বড় কথা কল্পনার রঙীন আকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত নিজেকে

মেলে ধরবার অবকাশ পেলাম মনের মত একটি চরিত্র পেয়ে। যদিচ এখানেও আমার ক্যামেরা অনভিজ্ঞতা বশতঃ রুচিবিগর্হিত কয়েকটি সিনের অবতারণা করা হয়েছিলো এবং তা যথারীতি মনকে পীড়িতও করেছিল। কিন্তু সামগ্রিক সাফল্যের তৃপ্তি এ অতৃপ্তকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল এইটুকুই বলতে পারি।

এই সময়ই গানের মধ্যে নিজেকে যেন নতুন করে খুঁজে পেয়েছিলাম। এই নতুন আত্মপরিচয়ের বিহ্বলতা যে কি মধুর বলা যায় না। চারপাশের বাস্তব কঠিন ধূলিধূসর জগতের গ্লানি থেকে এক দিগন্তহীন আনন্দলোকে মুক্তি পাবার শক্তি যে আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে এ অনুভবের আনন্দ ছোটোখাটো অনেক দুঃখকে তুচ্ছ করবার প্রেরণা জোগাত। কি অন্যভাবে বলা যায় জীবনের অনেক অপ্রতিরোধ্য যন্ত্রণার তীব্রতাও যেন এক করুণ মাধুর্যে অপরূপ হয়ে উঠত গানের স্পর্শমণির ছোঁয়ায়।

এই গানকে উপলক্ষ্য করেই এমন কয়েকটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি যাদের চরিত্র-মহত্ত্ব আজও মনে শ্রদ্ধা জাগায়। মনে পড়ে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন এক আধাবয়সী প্রৌঢ়। পরপর তিন দিনের মধ্যে স্ত্রী ও দুটি সন্তান হারিয়ে যাঁর জীবন যাকে বলে একেবারে একাকীত্বের সীমাহীন মরুভূমিতে পর্যবসিত হয়েছিল। দিনের বেলা কোথায় সামান্য কাজ করে কোনোরকমে তাঁর দিন গুজরান হোত। কাজের শেষে যখন বাড়ি ফিরতেন—জীর্ণ বেশ, মলিন মুখ দেখে দুঃখী বই আর কিছু মনে হোত না। কিন্তু বিকেলে পড়ন্ত গোধূলির ম্লান অস্ত-আলো যখন ছড়িয়ে পড়ত, ঘরের দাওয়ায় একটি ভাঙা হার্মোনিয়ম নিয়ে বসে চোখ বুজে গাওয়া একটির পর একটি গান তপ্ত অশ্রুধারার মত ঝরে পড়ে তাঁর ধূসর জীবনের রুক্ষতার ওপর যেন নানারঙা অনুভবের ফুল ফুটিয়ে দিত। সামান্য, সাধারণ মানুষটাও তখন যে কি অসামান্য, অসামান্য হয়ে উঠত না দেখলে বোঝা যায় না। আমি তাঁকে "ভোলাদা" বলতাম। গান-শোনার লোভেই অবসর পেলেই তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। আমায় খুব স্নেহ করতেন। ওঁর কাছে দু-চারটি গানও শিখেছিলাম। মীরার ভজন, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের কিছু গান, কীর্তন ও ভাটিয়ালীর কয়েকটি গানই ছিল তাঁর সম্বল। কিন্তু সুর, অনুভব, রসের ছোঁয়ায় সে গান মনকে যেভাবে ভিজিয়ে দিত—উত্তরকালে অনেক বড় গাইয়ের গানেও সে

সরসতার সন্ধান পাইনি। তখন বুঝিনি। এখন অনেক পোড় খেয়ে, আঘাটার ভরাডুবী পার হয়ে এইটুকু উপলব্ধির তীরে পৌঁছেছি যে—জীবন-বিবাগী একটা সুদূর-তৃষ্ণার আকুলতাই ভোলাদার গানকে এমন চিত্তস্পর্শী করে তুলত। মনে পড়ে নিজের দুঃখের কথা কখনও তাঁর মুখে শুনিনি।—ধু-ধু-করা শূন্যজীবনের প্রতি কারো সহানুভূতির বাষ্পও যেন সহ্য করতে পারতেন না। কেউ "আহা" করলেই আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন, 'দুঃখ-করা মানেই তাঁর ইচ্ছের বিরোধিতা করা। তাঁর বিচারকেই আমি শ্রেষ্ঠ বিচার মনে করি।'

জীবন ও বৈরাগ্যের সঙ্গে এমন সহজ সামঞ্জস্য সাধন করতে খুব কম লোককেই দেখেছি। অথচ তিনি সাধক নন, সন্ন্যাসী নন, গৃহত্যাগী নন। হঠাৎই একদিন শুনলাম—কাউকে না বলে ভোলাদা কোথায় চলে গেলেন। কতদিন তাঁর শূন্যঘরের শ্রীহীনতা দেখে হু-হু করে চোখে জল এসেছে। অনেক পরে এক মস্ত বড় পণ্ডিতের মুখে যখন শুনেছিলাম ত্যাগ ও ধর্ম হিন্দুর জীবনে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক— তখন আমার "ভোলাদা"র কথাই মনে হয়েছিল।

এই সময় একদিন রেকর্ড করার আহ্বান এলো মেগাফোন কোম্পানী থেকে। সেই সূত্রেই পরিচয় হোল জে এন ঘোষের সঙ্গে। ইনি এক আশ্চর্য মানুষ। শিল্প ও ব্যবসা এ দুটি বস্তুর মধ্যে যে অহিনকুল সম্পর্ক ছাড়াও অন্য সম্পর্ক হতে পারে—এ সম্পর্কে দৃষ্টি ফুটেছিলো তাঁকে দেখেই। কি নিরলস তাঁর শিল্পীসেবা! কি সংযম সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরদানে অর্থসমাগমের প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও। ধনী হয়েও এমন নিরাভমানী, সম্মান ও খ্যাতিতে সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েও শিশুর মত সরলতা, এবং ঐশ্বর্য্য সমারোহের মধ্যেও বিলাসবর্জিত, অতি সাধারণ বেশভূষার বিনয়ী মানুষ আমি আর দেখিনি।

সব সময় হাঁটুর ওপর অবধি ধুতি পরা, গায়ে সেকেলে ফতুয়া ধরনের হাফপাঞ্জাবি পরা অমায়িক মানুষটিকে সময়ের সুদূর ব্যবধানের বেড়া টপকে আজও যেন আশ্চর্য জীবন্তভাবে দেখতে পাই। গুণীর গুণপনার কাছে সবসময় যেন শ্রদ্ধানত হয়ে থাকতেন বয়সে সন্তানতুল্যই হোন কি অগ্রজ-তুল্যই হোন। জে এন ঘোষ সবার কাছে সবসময় হাতজোড় করেই আছেন এবং এই বিনয়ে এতটুকুও ভেজাল ছিলো না। স্টুডিওতে রেকর্ডিং ও রিহার্সালের সময় সকলের সুবিধা, অসুবিধা, প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি

ঠিক যেন মায়ের মত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। গরমের দিনে মুড়ি, শশা, আম, বর্ষার দিনে চিঁড়ে ভাজা, মাড়োয়ারীর দোকানের মিহি ডালমুট, স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে করানো বিশালকায় বেগুনী, কখনও কলকাতার বাইরে থেকে আনানো সরপুরিয়া, ল্যাংচা তাঁর হৃদয়ের স্নেহের রসে মিশে কি অপূর্বই না হয়ে উঠত। সবসময় নজর থাকত বাজারের সেরা এবং খাঁটি জিনিস আনার দিকে, তার যত দামই হোক। আমার আনানো খাবার খেয়ে আমার আর্টিস্টের কোনো অনিষ্ট যেন না হয় এই ভাব আর কি। আর কি যত্ন করেই নিজে হাতে প্রত্যেককে পরিবেশন করতেন। 'খাব না' বলার জোটি থাকত কি? তাঁর নিটোল স্নেহের কাছে আত্মসমর্পন না করে কারো উপায় ছিল না।

আবার তেমনই কড়া নজর হিসেবনিকেশ ব্যবসার দিকে। চশমা নাকে দিয়ে খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে যখন বসতেন কারো সাধ্য ছিল না একটি ক্রান্তিও ফাঁকি দেয়। কারো ফাঁকি তিনি সহ্য করতেন না এবং নিজে কাউকে ফাঁকি দিতেন না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাঁর এহেন স্বর্ণসাফল্যের রহস্য বোধহয় এইখানেই।

কোন শিল্পীর রেকর্ডের রেকর্ড সেলে অর্থসমাগম ফুলে ফেঁপে ওঠার মুহূর্তেও নিজের কৃতিত্বের মাপের তুলনায় গড়পড়তা ব্যবসায়ীর মত শিল্পীর কৃতিত্বকে ছোট করে দেখেননি। ব্যাঙ্কে নিজের লাভের অঙ্ক জমা দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীকেও নানাভাবে পুরস্কৃত করেছেন। ন্যায্য পাওনা ছাড়াও এঁর উপহৃত মূল্যবান গয়না, বেনারসী শাড়ি আজও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি শুধুমাত্র কর্মজীবনে কৃতিত্বের পুরস্কারচিহ্নের স্মারক হিসেবেই নয়। ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসেবের বাইরে আছে আর এক হিসেব যা হিসেবীকে ছোট করে না, করে এক অনন্যসাধারণ সম্ভ্রমে মহীয়ান, যে মহত্ত্বের কাছে মাথা নত না করে উপায় নেই।

তাই ত সময়ে সময়ে গভীর আক্ষেপে মন ছেয়ে আসে যখন ভাবি যে এইসব মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সুন্দর যুগের নিষ্ঠুর অবসান ঘটতে বসেছে!

দেবতুল্য নির্মলচরিত্রের সেই মধুর সরলতা, জীবনের প্রতি ঋজু দৃষ্টিভঙ্গি, শুভ্র সততা, নিরলস পরিশ্রম, নীরব সেবা, মানুষের প্রতি অনাড়ম্বর স্নেহ, সম্ভ্রমবোধ,— এসব যেন এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে বা যাচ্ছে।

আজকের যুগে মানুষের প্রতি মানুষের দরদহীন অসম্ভ্রমী দৃষ্টি উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুশ্রী কলহের কনট্রাস্টেই কি সে স্মৃতি এমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে? জে এন ঘোষের এই বেসিক অনেস্টি মনের গভীরে এমন রেখাপাত করেছিলো বলেই হয়ত অজ্ঞাতেই এই অনেস্টি উত্তরকালের ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির জীবনের আদর্শরূপে খাড়া রাখবার চেষ্টা করেছি। কতটা পেরেছি অথবা আদৌ পেরেছি কিনা জানি না। তবে এই আদর্শবোধ তাঁরই সংস্পর্শজাত। এ ঋণ কোনদিনই ভোলার নয়।

বক্তব্যবিষয় থেকে একটু দূরে এসে পড়েছি কি? কিন্তু আমি ত আগেই বলেছি জীবনের গতানুগতিক ঘটনাবর্ণনের উদ্দেশ্যে আমি কলম ধরিনি। ঘটনার জঞ্জাল সত্যের আসল রূপটিকে আবৃত করে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি চাই ঘটনার অন্তরালের সেই জীবনদর্শন যা ঘটনার ক্ষুদ্র পক্ষপুটে ধরে না অথচ মানুষের জ্ঞানের অহঙ্কার অভিজ্ঞতার আস্ফালন সবকিছুকে ভেঙেচুরে এমন একটা পরিণতির দিকে জীবনের মোড ঘুরিয়ে দেয়, যে পরিণতি কখনও কল্পনাতেও আনা যায়নি। কিন্তু অজ্ঞাতসারে এই পরিণতির জন্যই মন বুঝি উন্মুখ হয়ে থাকে, না থেকে পারে না বলেই। এ-যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় একটি স্ফুলিঙ্গের আলোয় যুগসঞ্চিত অন্ধকার কেটে যাওয়া। এক এক অধ্যায়ের শেষে জীবনকে যদি সন্ধানী দৃষ্টির আলোয় অধ্যয়ন করা যায় কত না-জানা রহস্য যেন স্ফটিকস্বচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু সেসব কথা পরে।

উপস্থিত যা বলছিলাম। 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর পর একই সঙ্গে 'কণ্ঠহার' ও 'কৃষ্ণ সুদামা'য় কাজ করবার জন্য আমন্ত্রিত হলাম। 'কৃষ্ণ-সুদামা'র রুক্মিণীর রোলে আমি, কৃষ্ণ ধীরাজ ভট্টাচার্য।

ছোটবেলা থেকেই বেদপুরাণের উপাখ্যানের ওপর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিলো বলেই কিনা জানি না 'রুক্মিণী'র চরিত্রে অভিনয় করবার আহ্বান পেয়ে আমি ভারী খুশী হয়ে উঠেছিলাম। যে 'রুক্মিণীর' দৃষ্টির বরদানেই মানুষের সুখসৌভাগ্য উথলে ওঠে সেই 'রুক্মিণী'—হব আমি? মনের মধ্যে কেমন যেন এক ধারণা জন্মে গেল 'রুক্মিণী'র অভিনয় যদি ঠিক করে করতে পারি আমার জীবন দারুণ একটা ভালোর দিকে মোড় নেবে। মনে আছে সাজঘরে মাথায় সেই নকল মণিমুক্তার মুকুট পরে বিরাট আয়নার সামনে নিজেকে দেখে চমকে যেতাম। সত্যিই কি আমি

রুক্মিণী হয়ে গেছি! অল্পবয়সের কল্পনাপটু মন নিয়ে উধাও হয়ে যেতাম সেই অমরাবতীতে, সেখানে কত কুবেরকে বর দিচ্ছি,—ভিখারীকে রাজা বানাচ্ছি, আরও কত কি অসম্ভব ব্যাপার ঘটাতে ঘটাতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। অকস্মাৎ স্টুডিও ম্যানেজারের ধমকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ঈষৎ কাঁদো কাঁদো হওয়া ও সেটে যাওয়া। এখন ভাবতে যতটা মজা লাগছে তখন কিন্তু ঠিক ততটা মজা লাগেনি।

কৃষ্ণ হয়েছিলেন ধীরাজবাবু। তখনকার দিনে চেহারার জন্য এঁর খুব নাম ছিল। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিনেতা বলতে যা বোঝায় ধীরাজবাবু ঠিক তা ছিলেন না। কিন্তু সব মিলিয়ে ওঁর অভিনয় মোটামুটি সবার প্রশংসাই পেয়েছিলো। সহকর্মীদের সঙ্গে ওঁর ব্যবহার সুন্দর। বেশভূষার পারি-পাট্যের দিকেও খুব নজর ছিল।

পৌরাণিক চিত্রে রুক্মিণী হওয়ার মুহূর্তেই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের চরিত্র 'কণ্ঠহার'-এর নায়িকা হতে হোল। এখানে রুক্মিণীর সহজ, সরল খাতে বয়ে যাওয়া দেবী ভাব নয়। জটিল আবেগের সংঘর্ষে বিক্ষিপ্তচিত্ত নায়িকার বেদনার রূপায়ণ। কিন্তু বেদনার গভীরতা ছোটবেলা থেকে মনকে সহজেই স্পর্শ করতে পারত বলেই কিনা জানি না খুব কঠিন চরিত্রও কঠিন বলে মনে হয়নি কোনদিন। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, 'কি রুক্মিণী, পারবে ত? না ভয় করছে?' আমি নীরবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাতাম। কেন জানি না বেদনাকে সবসময়ই বড় আপনার মনে হয়।

যাই হোক 'কৃষ্ণ-সুদামা' ও 'কণ্ঠহার' দুটি চিত্রই সুনাম ও সম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত করল।

এরপর ১৪ এপ্রিল (১৯৩৬) ফণী বর্মার পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চিত্ররূপে কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায় মনোনীত হলাম।

বিষবৃক্ষের সঙ্গে একই সঙ্গে কণ্ঠহার ছবির হিন্দী চিত্ররূপ 'খুনী কৌন'-এর সুটিংও চলতে লাগল। আর 'খুনী কৌন' শুরু হতে না হতেই প্রফুল্ল ঘোষের হিট্ পিকচার 'মা'-এর হিন্দী চিত্ররূপে ঐ 'ব্রজরাণী'রই ভূমিকায় আহ্বান। এ এক বেশ মজার ব্যাপার। সবসময়ে বিচিত্রভাবের নাগর-দোলায় নিজের মনটাকেই যেন বহুরূপী মনে হোত। কিন্তু কাজ জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনটাও একটা অটল প্রতিজ্ঞায় যেন কঠিন হয়ে এল। এ এক ভীষণ পরীক্ষা। এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই কোন অতলে তলিয়ে

যেতে হবে। মনে পড়ে প্রতিদিন সকালে উঠে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করতাম, 'আমি যেন হার না মানি' আর প্রতিমুহূর্তে মন্ত্রের মত একটি সঙ্কল্প জপ করতাম 'আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না।' এই বয়সেই অমন একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করবার শক্তি ঈশ্বরের করুণার দান নিশ্চয়। নৈলে পারলাম কি করে? শুধু পারা? তখনকার দিনে হিন্দী ছবির ভারতজোড়া জোড় জাল মারচেন্ট ও জুবোদয়ার বিপরীতে অভিনয় করে সে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলাম। গান ও অভিনয় দুই-ই সমালোচকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। জীবনের এক উজ্জ্বল দিগন্তের নিশ্চিত আশ্বাস যেন মনকে ভরসা দিল।

এরপরই 'চার দরবেশ'। 'রাধা' ফিল্মের ব্যানারে এই বোধহয় শেষ ছবি।

রাধা ফিল্মসের বেশ কয়েকটি ছবিতে জহর গাঙ্গুলির বিপরীতে নায়িকারূপে অভিনয় করেছিলাম। তবু, এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর কথা মনে পড়ে। কারণ বোধহয় এ ছবির পরই রাতারাতি আমাদের উভয়েরই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। অন্যভাবে বলা যায় আমাদের আসন চিত্ররসিকের দরবারে কায়েমী হয় এ ছবিরই মাধ্যমে।

এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে ১৯৩৫ সালের ১৩ মে কর্ণওয়ালিশ টকিতে (এখনকার শ্রী), এ ছবি রিলিজ হয়েছিল। কর্মজীবনে সার্থকতার প্রথম সোপানরূপে যে ছবিকে আণ্ডারলাইন করা যায় সে ছবির 'হিরো' বা সাথীশিল্পীর একটি বিশেষ মূল্য সকল শিল্পীর কাছে থাকাটাই স্বাভাবিক। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। মেয়েদের মন একটু বেশী মাত্রায় ভাবপ্রবণ বলেই হয়ত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' সম্বন্ধে আবেগ, আমার চাপা স্বভাব সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ত। আমার এ দুর্বলতা স্টুডিওতে সমসাময়িক সকল শিল্পী ও কর্মীর হাসি-কৌতুকের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিলো। সে সময়েই দেখেছি স্বাভাবিক কৌতুকপ্রবণতাবশতঃ জহরবাবু মুখে হয়ত সেইসব হাসিঠাট্টায় যোগ দিয়েছেন, কিন্তু যে মুহূর্তে অল্পবয়সী মনের স্পর্শকাতরতা বা যে কারণেই হোক আমার চোখ অজ্ঞাতে ছলছলিয়ে উঠেছে অমনি জহরবাবু অন্যমানুষ। 'যাঃ, ছেলেমানুষের পেছনে বড় লাগিস। ও ছবি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতাই কি কিছু কম রে। ওরে বাব্বাঃ, প্রথম যুগের সাকসেসফুল পিকচার। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী।' বলে দুহাত জোড় করে যখন কপালে ঠেকাতেন তখন তাঁর সেই গদগদ ভাবতন্ময়-

তার মধ্যে এমন একটা আন্তরিক দৃঢ়তা ফুটে উঠত যে, সকলেই হাসি-কৌতুক ভুলে সিরিয়াস হয়ে উঠতেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশও পাল্টে যেত। এই রকম হাসির সুরে গভীর কথা বলতে পারা বা কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্য দিকটির সম্বন্ধেও সচেতন থাকাটাই যেন জহরবাবুর জীবনসঙ্গীতের মূল সুর ছিলো। এই কারণেই হয়ত উত্তরকালে তিনি এই ধরনের অভিনয়-কুশলতার পাকা কারিগর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

অ্যালবামের প্রথমদিকের পাতা উল্টে যাবার মত জহরবাবুকে জড়িয়ে আজ কত ছবিই না মনে ভেসে উঠছে। কোনোটি স্পষ্ট, কোনোটি ঝাপ্সা।

সেসব দিনের অপরিণত মনের এলোমেলো স্মৃতির আলোছায়ার কাহিনী গুছিয়ে বলা বড় শক্ত। তবু সব মিলিয়ে জহরবাবুর আনন্দময় ব্যক্তিত্ব বুঝি ভোলার নয়।

বোধহয় 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর আগেই হবে। জ্যোতিষবাবুরই পরিচালনায় 'কণ্ঠহার' নামে এক অপরাধমূলক রহস্য-চিত্রে আমি ও জহরবাবু নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করি। আগেই বলেছি বয়স তখন অল্প, সবকথা ভাল করে মনে পড়ে না। কিন্তু দুটি সিনের কথা কেন জানি না ভুলতে পারি না। জহরবাবুর (নায়কের নাম মনে নেই) বন্ধু গৌরীকান্ত মদ্যপ এবং আনুষঙ্গিক দোষে অভ্যস্ত। ভিলেন গৌরীকান্ত (অভিনয়ে ছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য) নববিবাহিত বন্ধুকে নিজের পথে টানতে গিয়ে তাদের মধুর দাম্পত্যজীবনে অশান্তির ঝড় তোলে। মনে আছে বিয়ের কদিন পরে কোন এক সন্ধ্যায় গৌরীকান্ত 'পুরুষমানুষের কি সবসময় ঘরের কোণে বসে থাকা? চল একটু বেড়িয়ে আসি।' বলে বন্ধুকে জোর করে বাইরে নিয়ে আসবে। সে সময় বাইরে যাবার প্রবল অনিচ্ছা। অথচ সে অনিচ্ছা প্রকাশে পুরুষোচিত সঙ্কোচভাবে দোলায়মান নায়ক, আর ঘোমটার আড়ালে নায়িকার ভ্রূকুটির নিষেধ—এই ছিল আমাদের এক্সপ্রেশনের বিষয়।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি। আঃ ছাড়্ না'—বলে জহরবাবুর বারবার করুণ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকানোর উত্তরে আমার ঘোমটা ধরে সজল নয়নে চেয়ে থাকার কথা। কিন্তু অমন লম্বা-চওড়া মানুষটার এহেন নাজেহাল অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে আমার প্রায় গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হোত। আমার হাসি দেখে জহরবাবু, ধীরাজবাবু সবাই হেসে গড়াতেন। বার বার

শট নষ্ট হওয়ার জন্য জ্যোতিষবাবুর কাছে বকুনী খেয়ে শেষটায় সত্যিই কেঁদে ফেললাম। 'বাস বাস, এইবার ঠিক হবে। না কাঁদলে কখনও কোনো ভাল কাজ হয়?'

জহরবাবুর কথার মানে সেদিন বুঝিনি। তবু চমকে উঠেছিলাম। আজ বুঝেছি। কিন্তু এই কথা ভেবে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। অমন চিন্তার কথা অত সহজে কেমন করে বলতে পেরেছিলেন? তাঁর সহজাত অন্তর্মুখীনতার প্রসাদেই নয় কি?

...অনেক পরে আমার প্রডাকশনে কাজ করবার সময় তাঁর অমায়িক সরল ব্যবহার যে আমায় কত প্রেরণা দিয়েছে বলতে পারি না। ঠিক সময়ে সেটে আসা, কাজ করা, অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর পরমাত্মীয়ের মত সহায়তা ভোলার নয়। মনে আছে একদিন সামান্য অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সেটে এসেছিলেন বলে আমি রাগ করে বলেছিলাম, শরীর খারাপ নিয়ে সেটে আসার কি দরকার ছিলো? একটা ফোন করে দিলেই ত হোতো। সবেতেই আপনার বাড়াবাড়ি।

'সে কি হয়? এ ত শুধু তোমার আমার ব্যাপার নয়। অনেককে নিয়ে কাজ। একজন না এলে টিমওয়ার্ক সাফার করে। শিল্পী হয়ে সেটা কি করে বরদাস্ত করি বল।' জহরবাবুর কথার জবাব দিতে পারিনি। আমার প্রডাকশনেরই 'নববিধান' এর স্যুটিং চলার সময় জহরবাবু তিন-চার দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগার পর সুস্থ হয়ে যেদিন কাজে এলেন আমি ওকে স্টুডিওর খাবার না দিয়ে বাড়ি থেকে ওর জন্য তৈরী করে নিয়ে যাওয়া স্টু প্লেটে ঢেলে একটা চামচ দিয়ে ওঁর হাতে দিতেই বললেন, 'এটা কি? ওরে বাব্বাঃ! আমি বাঙালী মানুষ। এসব স্টু ফু কি আমার পোষায়? যাক এনেছ যখন দাও,' বলেই চামচটা ফেলে দিয়ে এক চুমুকে যাকে বলে একরকম গলায় ঢেলেই হাক দিযে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ওহে, এবার একটা কলাপাতা পেতে যা রান্না হয়েছে এনে দাও। হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বাবু হয়ে বসে হাপুস-হপুস করে কলাপাতা গড়ানো ঝোল দিয়ে ভাত না খেলে কি আমাদের পেট ভরে?' দোষেগুণে মেশানো এই নির্ভেজাল বাঙালীত্বকে তিনি আজীবন আঁকড়ে থেকেছেন। জহর গাঙ্গুলীকে যদি ভোলা যায়, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জনপ্রিয় 'সুলালদা'কে ভোলা সম্ভব কি?

জীবনকে পরিপূর্ণভাবে জানবার তাগিদেই কোন যুগে যাত্রায় যোগ দিয়ে

নাটক ও মঞ্চের পথ বেয়ে তিনি সিনেমায় এসে পৌঁছলেন জানি না। প্রয়োজনের চেয়ে শখটাই বোধহয় তাঁর কাছে বড় ছিল। জহরবাবুর ব্যাপক পরিচিতি সিনেমার মাধ্যমেই। কিন্তু শিল্পচর্চা তাঁর কাছে টবের শৌখীন ফুল ছিলো না। জীবনের মাটির সঙ্গে যোগ ছিল বলেই তাঁর সকল অভিনয়ই মনকে এমন করে স্পর্শ করে। জহরবাবুকে দেখে বার বার একথা মনে হয়েছে।

তিনি সুন্দর ছিলেন কি ছিলেন না, এ প্রশ্ন কখনও মনে জাগেনি। এখনকার মত তখন ত এত শুক্রবারের পাত্রা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ফিল্ম-জার্ণাল ছিলো না। আজ শিল্পের ব্যাপক প্রচারের যুগ। এখন সকল রকম প্রতিভাকে নানা ভাবে ও বিন্যাসে ফুলের তোড়ার মত সাজিয়ে সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। ছোট-বড় সকল শিল্পীকেই সকলের লক্ষ্যগোচর করাই এঁদের কাজ। করেনও। কিন্তু তখন যে গাছের ফুল সেই গাছেই ফুটত, শুকোতো, ঝরত। এমন যুগের শিল্পী হয়েও জহরবাবু আপন ব্যক্তিত্বে, সরলতায়, সংবেদনশীল অন্তরের দাক্ষিণ্যে সবলকে কাছে টানতে পেরেছেন, জীবনবোধের সহজ আলোয় অভিনীত চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন, তাঁর সম্বন্ধে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

শিল্পীজীবনের সুদীর্ঘ তিনটি যুগের অজস্র দানে জহরবাবু চিত্রজগতকে ভরে দিয়েছেন। প্রথম যুগের মঞ্চঘেঁষা সিনেমা, দ্বিতীয় যুগে সিনেমার আরো আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাবার প্রবণতা এবং বর্তমান যুগের প্রগতিশীল ন্যাচারালিটি—এই প্রতিটি অধ্যায়,—পরিবর্তনের তালে তালে তিনি আশ্চর্য সুন্দরভাবে নিজেকে শুধু খাপ খাইয়েই নেননি—কাহিনী ও চরিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছেন তাঁর খেলোয়াড়সুলভ গ্রহণশীল মনের শক্তিতে এবং সেটা জোর করে মানিয়ে নেওয়া নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে জীবনে জীবনযোগ করা। একথা ভুললে চলবে না।

জহরবাবুর অন্তর্ধান নিঃসন্দেহে অভিনয় জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু তার চেয়েও ক্ষতিকর সমসাময়িক যুগের মুক্ত প্রাণের এক উদার মানুষের সঙ্গে একটা বিশেষ যুগের অনেকখানি সম্পদ হারানো। শিল্পীর দেখা হয়ত বা মিলবে, কিন্তু জীবনবোধ ও শিল্পবোধ মেশানো দোষ-গুণে ভরা এমন এক নিটোল হৃদয়ের স্পর্শ এই আবেগকৃপণ হিসেবী জগতে কি খুব বেশী পাওয়া যাবে?

এরপর নিউ থিয়েটার্সের নানা-রঙা উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল কি মে মাসে মনে নেই রাধা ফিল্মস ছেড়ে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার সংবাদ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্বেও রাধা ফিল্মস ছেড়ে আসতে দেরি হয়েছিল। মনে পড়ে 'দেবদাস' ছবি শুরু করার আগে প্রমথেশ বড়ুয়া আমায় পার্বতীর রোল দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাধা ফিল্মসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম বলে, সেই দুর্লভ সুযোগ যখন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হোল, নির্মম নিয়তির পায়ে যেন মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছিলো। নিউ থিয়েটার্স তখন সবচেয়ে অভিজাত প্রতিষ্ঠান। আর মিঃ বড়ুয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতে রূপকথার নায়কতুল্য। তাঁর সঙ্গে এবং তাঁরই পরিচালনায় কাজ করাটা যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার সামিল। তার ওপর শরৎবাবুর বই। এমন দুর্লভ যোগাযোগ জীবনে কি আসে? কিন্তু আমি বিনা আয়াসে এমন লোভনীয় আহ্বান পেয়েও সাড়া দিতে পারলাম না,—এর পিছনে কোনো কুটিল গ্রহের চক্রান্ত ছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এ বাধা যে সত্যিকারের বাধা নয়, রাধা ফিল্মসের কর্তৃপক্ষের অছিলা এবং নিজেদের স্বার্থে অভিভাবকহীনা অনভিজ্ঞা অসহায়ার প্রতি উৎপীড়ন একথা জেনেছি অনেক পরে।

গভীর আক্ষেপ ও হতাশায় যখন মন ছেয়ে এল তখন হঠাৎই একদিন মা আমার দীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করলেন। এই প্রসঙ্গেই বলি একটি অনুভূতি যেন গানের কলির মতই বার বার আমার জীবনে ঘুরে ফিরে এসেছিল। মানুষ যখন একেবারেই অবলম্বনহীন, নিঃসহায় হয়ে পড়ে, অন্ধকারে পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয়ী হয়, ঠিক তখনই যেন কোন অপ্রত্যাশিত পথ বেয়ে স্নিগ্ধ আশ্বাস ঝরনার মত নেমে রুক্ষ জীবনকে সরস করে তোলে। আর তখনই উপলব্ধি করি তাঁর বরাভয় 'আমি আছি'।—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় পথ হারানোটা বুঝি পথ খুঁজে পাওয়ারই রূপান্তর।

দীক্ষা নেবার দিনটি আজো মনে পড়ে। কোন বিরাট দর্শন অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধি করবার মত বয়স অথবা মনের পরিণতি কোনোটাতেই তখন পৌঁছইনি। কিন্তু কানেকানে গুরু যখন ইষ্টনামটি বলে দিলেন কেমন এক অপার্থিব আনন্দের শিহরণে সারা দেহমন যেন কেঁপে

উঠল। মনে হোল সারা পৃথিবী যেন আলোয় হেসে উঠেছে। কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই। আমি যেন এতদিনের আমির চেয়ে আলাদা, আমার অসাধ্য কিছু নেই। তখন যাকে দেখছি,—যা দেখছি সবই যেন একটা নিটোল আনন্দের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছে। এরই মধ্যে গুরুদেব ভগবত পাঠ শুরু করলেন। সংস্কৃত শ্লোক পড়ে পড়ে উনি বাংলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সবটা মনে নেই। কিন্তু যে শ্লোক জীবন্ত শক্তির মত মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো সেটি হোল—'পর্যায় যোগাদ্বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ'—যার অর্থ হোল বিধাতা সবই পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে রেখেছেন। যথাসময়ে মানুষ তা পাবে। ঐ একটি কথাই যেন অনেক আশা অনেক সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিতে সকল ক্ষোভ মুছিয়ে দিল।

সেদিন থেকেই এই ধরাবাঁধা জীবনের গতি যেন পাল্টে গেল। মনে হোল এই ধুলোর পৃথিবীতেও এমন রূপ আছে যাকে চিনতে না-চিনতে মন মেনে নেয়, এমন ডাক আছে যা শুনতে না-শুনতে প্রাণ সায় দেয়, এমন আলো আছে যা দেখতে না-দেখতে মন বলে 'পেয়েছি'।

এ মুহূর্ত দুর্লভ। জীবনে এক আধবারই আসে, কিন্তু আসে যখন—জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে গোটা দৃষ্টিভঙ্গিটাকে যেন বদলে দিয়ে যায়। যে অনুভূতির বীজ সেদিন মনে উপ্ত হোলো পরে তাই বনস্পতি হয়ে ওঠে। কিন্তু সেকথা পরে বলব, যথাস্থানে। এখন যা বলছিলাম।

এরপরই হোল নিউ থিয়েটার্সের যুগ। যেদিন প্রথম নিউ থিয়েটার্সের ফ্লোরে যাই সে রোমাঞ্চকর অনুভূতির কাঁপন ভোলার নয়। কতদিনের কতরাতের স্বপ্ন দিয়ে গড়া নিউ থিয়েটার্স হাতীমার্কা ব্যানার। এই রাজকীয় পতাকাবাহীদের মধ্যে স্থান পাওয়া,—এ সৌভাগ্য ভাবা যায়? কিন্তু প্রথম দিন যতখানি উৎসাহ নিয়ে গেলাম, ঠিক ততখানিই নিরানন্দ নিয়ে ফিরে আসতে হোল।

এও এক অভিজ্ঞতা। দুপুর থেকে স্টুডিওতে গিয়ে বসে আছি ত আছিই। কেউ কথাও বলে না, বার্তাও না। আর সকলের সে কি গর্বিত চালচলন। যেন মাটিতে পা-ই পড়ে না। সবসময় যেন গোঁফে তা দেওয়া ভাব। বেয়ারা থেকে শুরু করে হোমরাচোমরা অবধি সকলের। আমরা কি যে সে লোক? এন-টি ব্যানারে কাজ করি। এই ভাবেই

জগমগ। দিন গড়িয়ে বিকেল এল। বিকেলের পর সন্ধ্যা। হঠাৎ যেন 'সাজ সাজ' রব উঠল। 'কি ব্যাপার?' 'না, সাহেব আসছেন।' 'সাহেব?'—অবাক হয়ে তাকাতেই এক বেয়ারা আমার অজ্ঞতা দেখে কৃপা পরবশ হয়ে এগিয়ে এসে চুপিচুপি বলল, 'সাহেব হলেন বি এন সরকার —নিউ থিয়েটার্সের ভগবান, এটা জেনে রাখুন।' বলেই শশব্যস্তে কোমরের বেল্ট, মাথার ক্যাপ ঠিক করে মুখে বৈষ্ণবী বিনয়ের গদগদভাব ফুটিয়ে সাহেবের গাড়ির দিকে ছুটল। অন্যান্য সবাইও সাহেবের সম্মুখীন হবার আগে ঠিক ফার্নিচার ঝাড়ার মতই নিজেদের যথাসম্ভব ঝাড়পোঁছ করে নিলেন। স্যুট পরিহিতরা টাই-এর নটটা একটু টাইট করে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন। কেউ বা সার্টের কলারটা একটু সোজা করে নিলেন। আবার ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিতরা হাতের ভাঁজ টান টান করে কোঁচাটা ধরে ঠিক খেলার মাঠে দৌড়োনোর প্রতিযোগিতায় নামার মত বেগে ধাবিত হলেন বি এন সরকারের গাড়ির দিকে। তারপর প্রতিযোগিতা হোলো কে সবচেয়ে আগে স্যারের চোখে পড়তে পারেন এবং কার অভিবাদনে আনুগত্যের প্রকাশ স্যারের কতটা বেশী প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে? সারাদিন বসে থাকার বিরক্তি ও ক্লান্তির বাধা ঠেলেও মনটা যেন মুহূর্তের জন্য কৌতুকে নেচে উঠল। নিজের অজ্ঞাতে কখন উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করেছি বুঝতেই পারিনি। হঠাতই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠিক তামাশা দেখার মতই উপভোগ করলাম অবস্থা বিশেষে বয়স্ক মানুষও কেমন ছেলেমানুষের মত হয়ে যায়। এন-টির ..স্থ ব্যক্তিরা পরস্পরকে থাক্কা দিয়ে প্রায় পাঁচজনে মিলে স্যারের গাড়ির দরজা খুললেন। স্যার গাড়ি থেকে মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দু-পাশের অনুগতের দল তাঁর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেন। তার আগে অবশ্য দুহাত জোড় করে প্রায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করা হয়ে গেছে। আমি তাঁরই প্রোডাকশনের একজন শিল্পী, সেইদিনই প্রথম কাজে যোগ দিয়েছি, সারাদিন বসে আছি। অথচ আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করানোরও একটা প্রয়োজন আছে একথা কারো চিন্তাতেও স্থান পেয়েছে বলে মনে হোলো না। যে যাঁর নিজের ভাবনাতেই বিভোর। আমার মত সামান্য মানুষের দিকে তাকাবার তাঁদের সময় কই? আমি 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই বুঝতে পারলাম তাঁর সঙ্গে

পরিচিত হবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকাটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়।' গরজ করে একাজ সম্পন্ন করার মত কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তি এতবড় প্রতিষ্ঠানেও নেই, এ অভিজ্ঞতা যেমন বিস্ময়ের তেমনই বেদনার। যাই হোক, দূর থেকে দুহাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে অন্য ঘরে চলে এলাম। সে নমস্কার সহস্র ভক্তের ভীড়ের আড়াল অতিক্রম করে স্যার বি এন সরকারের চোখে পড়েছিলো কিনা জানি না। কিন্তু তাঁরই প্রতিষ্ঠানের শিল্পী হয়ে যখন সেইদিনই প্রথম প্রবেশ করলাম এ কর্তব্য না করলে সে অ-সৌজন্য নিজেকেই পীড়া দিত। যাই হোক, আরো ঘণ্টা-দুয়েক বসে মিঃ পি এন রায়কে 'আমি এখন যেতে পারি ?'—বলতেই খুব অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'সে কি! আপনি এখনও বসে ?'—মনটা খুবই দমে গেল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানানো দরকার। আমার নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার কাহিনীর মধ্যে যেন স্যার বি এন সরকারের প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ বা শ্লেষ আছে ভেবে নিয়ে আমার প্রতি অবিচার না করেন। কারণ এখানে আমার আলোচ্য তাঁর পরিপার্শ্বিক, তিনি নন।

একথাও সবিনয়ে জানাচ্ছি, বি এন সরকার প্রথম দর্শনেই আমার মনে গভীর শ্রদ্ধার ছাপ ফেলেছিলেন। নামে সাহেব, চেহারাতেও সাহেব। স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষটির আভিজাত্য ও সম্ভ্রমবোধ চোখে না পড়ে পারে ? চারপাশের মানুষের এই কৌতুকপ্রদ চাটুকারিতা তাঁর মনকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করতে পেরেছে বলে মনে হোলো না। এক অনায়াসলব্ধ স্বাতন্ত্র্যের রাজ্যেই যেন তিনি রাজকীয় মর্যাদায় আসীন। কাজের অতিরিক্ত একটি অনাবশ্যক কথাও তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত না।

তাঁর সঙ্গে সরাসরি কোনো কথা বলার সুযোগ আমাদের ছিলো না, কারণ আমাদের অভাব-অভিযোগ ও বক্তব্য অন্যের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবারই রেওয়াজ ছিলো। সকল কথা তাঁর কানে পৌঁছত কিনা তাও জানি না। তবে যে প্রার্থনা পৌঁছত তা মঞ্জুর হতে দেরি হোতো না। 'অমৃত' পত্রিকার এক পুজো সংখ্যার এক লেখায় পড়েছি সরকার সাহেব বলেছেন, আমরা তাঁকে কনফিডেন্সে নিতাম না বলেই আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের (বিশেষ করে আমার কথাই বলতে পারি)

ক্ষোভের সীমা নেই এই কারণে যে, তাঁর মত এক মহান ব্যক্তিত্বের আওতায় মধ্যে এসেও তাঁর কাছাকাছি যাবার অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ বিশেষ পাইনি। কাজেই এই আক্ষেপ বা অভিযোগ আমাদের দিক থেকে হওয়াটাই স্বাভাবিক, কেন মিঃ সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের তারই সঙ্গে সোজাসুজি দেখা করবার, আলোচনা করবার অথবা প্রয়োজনের কথা বলবার প্রথা চালু রেখে তাঁর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দেননি? পরে যখন যতবার তাঁর কাছে গিয়ে একটু আধটু কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, ততবারই তাঁর সহানুভূতি-শীল উদার হৃদয়ের স্নেহস্পর্শ–তাঁর প্রতি মনকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে তুলেছে আর অতৃপ্ত ক্ষোভের সঙ্গে বারবারই মনে হয়েছে, এ সুযোগ কেন আগে পেলাম না তাহলে ত কত সহজভাবে, কত স্বাচ্ছন্দ্যে মনের আনন্দে কাজ করতে পারতাম। যে কৃত্রিম আড়ষ্টতার আড়াল আমাদের ও তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল—তার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল কিনা সে প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পাইনি। কিন্তু এই নীরব মানুষটি যে শিল্প ও শিল্পীর অকৃত্রিম পূজারী এবং ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতিকে ইনি একাই একশ বছর এগিয়ে দিয়েছেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, পরিচালকদের তাঁর পতাকাতলে একত্র করে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ অবদানের কাছে বাঙালী মাত্রেই ঋণী। জগতের রসিক দরবারে আজ ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই সম্মান ও স্বীকৃতি হয়ত স্বপ্নই থেকে যেত যদি না বি এন সরকারের মত মানুষ এই কাজে এগিয়ে এসে আনুকূল্যের হাল ধরতেন। যে যুগে সমাজের উঁচুমহল সিনেমা থিয়েটারকে হীন চোখে দেখতেন ঠিক সেই যুগেই এক অভিজাত পরিবারের সন্তানের তাঁর যথানির্দিষ্ট কৃতিত্বের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে তথাকথিত উপহাস্য বাণিজ্যের (চলচ্চিত্র তখনও শিল্পের মর্যাদা পায়নি) উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করাটা কতখানি বুকের পাটা থাকলে তবে সম্ভব হয় সে কথা আজ কল্পনাও করা যায় না। তাই এই সুযোগে প্রণাম জানাই এই দৃঢ়চিত্ত কর্মসফল মানুষটিকে, আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পীদের আজকের দিনের এই সম্মান গৌরব প্রাপ্তির মূলে যাঁর অকৃপণ সহায়তা অন্তঃপ্রবাহী প্রাণরসের মতই প্রবাহিত ছিল।

নিউ থিয়েটার্সে যোগদানের প্রথম দিনের পর বাড়িতে ফিরেই খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। এখানে কাজ করব কি করে? কেউ ত কারো দিকে

তাকায় না। নিজেকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। কোথায় যাব? কিভাবে কাজ করব? যাঁদের নির্দেশে কাজ করব তাঁরাই বা কেমন? এরকম উন্নাসিক আবহাওয়ায় মানুষদের ত উন্নাসিক হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত খুব তাচ্ছিল্য করবেন, প্রতি পদে ত্রুটি ধরবেন। হয়ত বা নিজের আনাড়ীপনার জন্য সকলের চোখে হাসির পাত্রী হয়ে উঠব। নিজের সম্মান নিয়ে কাজ করতে পারব ত? চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম। এ যেন কোনো গাঁয়ের মেয়ের চটক্‌দার নাগরিক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার অবস্থা।

নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে আমার প্রথম ছবি 'বিদ্যাপতি'। (যদিও প্রকাশ্যভাবে সাধারণ চিত্রমঞ্চে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হোলো 'মুক্তি'।) 'বিদ্যাপতি' ছবিতে অনুরাধার ভূমিকা আমার শিল্পীজীবনেরই শুধু নয় সারা-জীবনেরই এক দিকচিহ্ন হয়ে আছে। সারাজীবনের বলছি এইজন্য যে এতদিন অবধি অভিনয় করেছি অনেকটা বাস্তব জীবনের স্থূল তাগিদে। যেখানে বেঁচে থাকার প্রয়োজনটাই বড়, কোনো বড় কিছুর স্বপ্ন দেখাটা ক্ষণিকের বিলাস ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু অনুরাধার হাসি, অশ্রু, বেদনা, প্রেম ও সংযমের মধ্যে আমার এতদিনের রুদ্ধ হৃদয়াবেগ যেন আপনাকে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়ে সার্থক হোলো। এখানে আমার জীবন ও স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, আর নিজের সঙ্গে ঘটল নূতন করে পরিচয়—এ যেন অভাবনীয়ের সঙ্গে মালাবদল। 'বিদ্যাপতি'র হিন্দী চিত্ররূপও হয়, আর এই ছবির মাধ্যমেই সারা ভারতের রসিকসমাজের স্নেহ ও অভিনন্দন পাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। 'মানময়ী গার্লস স্কুল' আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, 'বিদ্যাপতি' এনেছে ভারতজোড়া মর্যাদা। 'বিদ্যাপতি'র অনুরাধা হওয়া আমার জীবনে এক বিস্ময়কর পালাবদলের যুগ।

এ ছবিতে আমার সফলতার মূলে যে দুটি ব্যক্তিত্বের কাছে আমি ঋণী তাঁরা হলেন, দেবকী বসু (পরিচালক) ও রাইচাঁদ বড়াল (সঙ্গীত পরিচালক)। শিল্পীর যথার্থ শিল্পী হয়ে ওঠার মূলে জন্মগত প্রতিভা ছাড়াও যে বস্তুর প্রয়োজন সেটি হোলো প্রকৃত শিক্ষাগুরুর শিক্ষাপদ্ধতি এবং এদিক দিয়ে দেবকীবাবুর সমতুল্য পরিচালক বিরল। কখনও আদর করে, কখনও শাসন করে, কখনও প্রশংসায়, কখনও তিরস্কার দিয়ে শিল্পীর কাছ থেকে কেমন করে কাজ আদায় করে নিতে হয় এবং শিল্পীকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করতে হয় সে বিদ্যায় তিনি যেন সিদ্ধ সাধক ছিলেন। অনুরাধার-

সীমাহীন প্রেমের উচ্ছল জোয়ারের মধ্যে কোথায় সংযমের বাঁধন প্রয়োজন, তার প্রসন্ন রূপদীপ্তিকে কখন কেমন করে বেদনার স্নিগ্ধ ছায়ায় ললিত মধুর করে তুলতে হবে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবকে ও নিগূঢ় অনুভূতিকে তিনি যেন নিপুণ চিত্রকরের মত শিল্পীদের সামনে তুলে ধরতেন—আর তা কত না বর্ণবিন্যাসে। তাঁর মত শিক্ষাদাতা পেয়েছি বলেই এত সহজে এত কঠিন কাজ করতে পেরেছি একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই।

অভিনয় ও গানের তুলনামূলক বিচারে গানই অনুরাধার প্রাণ হয়ে উঠেছিলো। মৈথিলী ও বাংলা ভাষার মিলনে পদাবলীর গীতিকাব্যিক রস হাসি ও অশ্রুতে মিলে যেন সাতরঙা রামধনুকের রং ফুটিয়েছে। প্রতিটি গানের সুর ও কথার অপরূপ সুষমা আমায় আবিষ্ট করে তুলত। গান গাইতে গাইতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম বলেই বোধহয় এই সঙ্গীত-প্রধান চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পেরেছি। 'বিদ্যাপতি'র সব গানগুলিই সুন্দর,—তবে 'অঙ্গনে আওব জব রসিয়া' গানটি আমায় যেন খ্যাতির শীর্ষে তুলে দিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত আমার হিন্দী হিট্ সং-এর লং প্লেয়িং-এ এই গানটি যুক্ত করে গ্রামোফোন কোম্পানী আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গানের এই সাফল্যের জন্যে আমার কৃতিত্বের একটা বড় অংশ প্রাপ্য রাইচাঁদবাবুর। তাঁর প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলি এ ছবির ঠিক হিরো না হলেও হিরোরই মত প্রধান চরিত্রাভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি 'বিদ্যাপতি' নাটকে অনুরাধার চরিত্র কল্পনা কাজী সাহেবেরই অবদান।

দুর্গাবাবু ছিলেন যাকে বলা যায় একেবারে মহাকাব্যের নায়ক। 'বিশাল কপাট বক্ষ, শালপ্রাংশু ভুজ, প্রশস্ত ললাট, আয়তলোচন, তপ্ত কাঞ্চনাভ বর্ণ' ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে একেবারে যেন হুবহু মিলে যায় তাঁর রূপ। সত্যি, এমন রূপবান পুরুষ ক্বচিত চোখে পড়ে। যেমন পুরুষোচিত চেহারা, তেমনই বিরাট অন্তঃকরণ—আনন্দোচ্ছল ব্যক্তিত্ব। দুর্গাবাবুর কথা মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ওর প্রাণখোলা উদার উচ্চকিত হাসি। সে হাসি দিয়ে যেন মানুষ চেনা যায়। অতবড় শক্তিমান অভিনেতার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে প্রথমটায় খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।

আমার চেয়ে উনি শুধু বয়সেই অনেক বড় ছিলেন না। আমি সবে

প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছি আর উনি খ্যাতির মধ্যগগনে। মনে মনে সবসময়ে একটা ভয় ছিল ওঁর সম্বন্ধে।

মনে আছে অভিনয়ের আগের মানসিক দ্বন্দ্ব। গান না হয় গেয়ে গেলাম। কিন্তু রহস্যভরে ওঁর দিকে তাকিয়ে পরিহাসে উচ্ছল হয়ে কথা বলা? না অসম্ভব। তাকাতে গিয়ে চোখই তুলতে পারি না। দুর্গাবাবু হঠাৎ ছুটে এসে দুহাতে আমার দু কাঁধ ধরে বললেন, 'জোয়ারের জল—তাকাও ত একবার' (ও ছবিতে উনি আমায় আদর করে 'জোয়ারের জল' বলেই ডাকবেন—এটা ছিল অভিনয়ের একটা অঙ্গ)। আমি লজ্জায় জড়সড় হয়ে তাকাতেই উনি ওঁর স্বভাব-জাত প্রাণখোলা উদার হাসিতে সারা স্টুডিও সচকিত করে তুললেন। আমিও হেসে ফেললাম। সকল সঙ্কোচ যেন সেই হাসির ঝড়ে উড়ে গেল। দু দণ্ডেই মনে হোলো মানুষটা যেন কত আপনার। আগেই বলেছি সে যুগে চলাফেরা, আসা-যাওয়া কঠিন নিয়মে বাঁধা ছিল। কিন্তু একদিন কাজ করার পর দেখা হতেই এত সহজে 'এই যে এস ভাই' বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন যে অজ্ঞাতেই চোখে জল এসে গেল। স্টুডিওর ছোটবড় প্রতিটি শিল্পী, কর্মী সবার প্রতি তাঁর দরদের সীমা ছিল না। দিলখোলা, উদার-প্রকৃতির দুর্গাবাবু মস্তবড় শিল্পী, ঠিক ততখানিই খামখেয়ালী ছিলেন।

মনে আছে একদিন কি একটা কারণে যেন শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছিলো। কিন্তু দুর্গাবাবুর রোখ চেপেছে শুটিং করতেই হবে। কেন হবে না? কেউ ওকে বোঝাতে পারে না। কি মনে হোলো, আমি গিয়ে 'দাদা, আজ সত্যিই শুটিং সম্ভব নয়,' বলতেই যেন গলে জল হয়ে গেলেন। 'আমার দিদি যখন বলেছে সম্ভব নয়'—বলেই পিঠের ওপর খুব জোরে এক কিল মেরে সেই ঘর কাঁপানো হাসি হেসে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুর্গাবাবুর কথাবার্তা, হাঁটাচলা সবই হয়ত একটু স্টেজঘেঁষা ছিল, কিন্তু ওঁর চেহারার সঙ্গে সেটা বেশ মানিয়ে যেত। 'ম্যাজেস্টিক' কথাটার মানে বোঝা যেত ওঁকে দেখলে। শুনেছিলাম তিনি নাকি কোন্ স্টেশনে একবার বার্থ না সীট রিজার্ভেশন না করেও দখলের তর্কপ্রসঙ্গে মন্ত্রী ফজলুল হককে বলেছিলেন, 'ফজলুল হক মরলে দ্বিতীয় ফজলুল হক আসবে, কিন্তু এই দুর্গা বাঁড়ুয্যে গেলে আর দ্বিতীয় দুর্গা বাঁড়ুয্যে হবে না।' কথাটার মধ্যে হয়ত কিছুটা নাটকীয়তা, কিছু অহঙ্কার থাকলেও পারে,

তবে এ অহঙ্কার নায়ক দুর্গাদাসকে মানাত। সত্যিই দুর্গা বাঁড়ুয্যে আর শক্ত হোলো না।

'বিদ্যাপতি'র গানে রাতারাতি গায়িকারূপে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁদের অবদানের কাছে আমি ঋণী তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে সঙ্গীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়ালের নাম। দেবকীবাবুর কথা ত আগেই বলছি। কাজী সাহেবের কথায় পরে আসছি

দেবকীবাবু পদাবলী থেকে 'বিদ্যাপতি' চিত্রের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর গান সংগ্রহ করেছিলেন। সেই গানগুলিতে যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে রাইবাবু সুর দিয়েছিলেন, এবং সেগুলি শিখিয়োছলেন এবং নাট্যরস জমিয়ে তোলবার উপযোগী করেছিলেন সে কথা জানি শুধু আমরা, যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। রাইবাবু সব সময় মন্ত্রের মত আমাদের কানের কাছে জপ করতেন, ফিল্মে গাইবার সময় গানটাকে শুধু গান বলে ভাবলেই চলবে না। প্রতি মুহূর্তেই মনে রাখতে হবে, গানটাও একটা সংলাপ; গল্পের অংশবিশেষ। অতএব গানটা যেখানে গাইতে হবে, সেই সিচুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তার মুড স্টাডি করে নিয়ে সেই মুড-এর উপযোগী সুর ও অলংকরণের কাজ চলত। মনে পড়ে একটা মীড়কেই উনি কতরকমভাবে কতবার পাল্টাতেন। যতক্ষণ না ওঁর মনে হোতো চরিত্রের বক্তব্যের সঙ্গে সুরের ছন্দ ঠিক মিলছে ততক্ষণ উনি কাউকেই রেহাই দিতেন না, এবং এ বিষয়ে নিজের ওপরেও ওঁর কঠোরতার সীমা ছিলো না। 'বিদ্যাপতি'র গানের কথার উচ্চারণে রাইবাবু মৈথিলী উচ্চারণ পদ্ধতির ওপরই জোর দিয়েছিলেন এবং গান শেখাবার আগে কড়া পরীক্ষকের মত গানটি আবৃত্তি করিয়ে নিয়ে, প্রতিটি কথার উচ্চারণ চেক করে নিতেন। কথা ও সুরের ওপর যাতে সমান ওজন দেওয়া হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর মতে গতানুগতিকভাবে অস্থায়ী, অন্তরা ইত্যাদি ক্রমপর্যায়ে ফিল্ম-সং-এ চলতে পারে না। নাটকের গতির সঙ্গে তাল রেখে গান আরম্ভ না হলে ছবিতে গান দেওয়ার কোনোই মানে হয় না। ড্রামা যদি ক্লাইম্যাকস্ পিচ-এ থাকে তবে টপ পিচ থেকেই গান শুরু করতে হবে। যদি কোনো আত্মলীন ভাবনার মুহূর্তে গান দিতে হয় তবে প্রয়োজন হলে চুপি চুপি কোনো বাজনার সঙ্গত ছাড়াই গান শুরু করতে হবে। দেবকী-বাবুর নির্দেশে ভাষা, ভাব, সুর সবই বৈষ্ণব রসানুসারী হয়েছিলো।

উদাহরণ স্বরূপ 'অঙ্গনে আওব জব রসিয়া' কৌতুক ও মধুর রসাশ্রিত, গানটি অমর মল্লিকের সঙ্গে ডায়লগরূপে ব্যবহৃত হয়েছিলো। ঠিক নাটকের সংলাপের মতই কখনও ঠাট্টা কখনও কৃত্রিম দুঃখে নায়িকার হাসি ও রঙ্গ গানের মধ্যে ফোটাতে হবে। এখানে নাটকীয়তাই প্রধান, তাই কখনও ঢিমা লয়ে, কখনও বা দ্রুত লয়ে পরিহাসমুখরতাকে উচ্ছল করে তোলা হয়েছিলো। একেবারে শেষের চরণে খুব ওপরের দিকে সুর তুলে দিয়েই, একটু থেমে আস্তে আস্তে নীচের পর্দায় নেমে আসতে হবে। কত যত্ন করেই না এসব রাইবাবু শিখিয়েছেন। টেক হবার সময় দু' হাত তুলে রাইবাবু দাঁড়িয়ে থাকতেন। ওঁর হাত নাড়া ও চোখের ভাষা দেখে বুঝে নিতে হোতো গাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা। প্রতি মুহূর্তে সে কি উৎকণ্ঠা! ওঁর চোখে প্রসন্ন আলো জ্বলে উঠলেই বুঝতাম পরীক্ষায় পাশ। তখন যে কি আনন্দ! আজ মনে হয় কাজ করার মধ্যে যে কত আনন্দ, কত রোমাঞ্চকর উত্তেজনা থাকতে পারে, সে উপলব্ধি আমাদের যুগের শিল্পীদের যেমন হয়েছে, এখনকার যুগের শিল্পীরা কি তার ধারকাছ দিয়েও গেছেন? এখন বকস্-অফিসের গায়িকা দিয়ে 'মিউজিক টেক' হচ্ছে এক জায়গায়, সুটিং চলছে অন্য জায়গায়। টেকনিকের কত অভাবনীয় অগ্রগতি। সবার কাজকর্ম কত সহজ হয়ে গেছে, ভুলচুকের সম্ভাবনাও কম। এখান থেকে, ওখান থেকে টুকরো টুকরো ফিনিশড প্রোডাকট্ জোড়া দিয়ে এক নিমেষে মেশিনের মত নিখুঁতভাবে কাজ হয়ে যায়। কিন্তু আজকের কোনো সৃষ্টি পরিচালক থেকে টেকনিশিয়ান থেকে শিল্পী এবং মেক-আপম্যান অবধি সবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিন্তাভাবনা, শিক্ষা, উৎকণ্ঠা, নিষ্ঠা এবং সবার ওপর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের এক সু-সম্পূর্ণ মালা হয়ে দোলে না ত? আগেকার ছবিতে হয়ত ত্রুটি ছিল অসংখ্য। কিছুটা আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবজনিত, কিছু বা প্রথম যুগের কর্মীদের অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে। কিন্তু সকল অপূর্ণতা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠত যার প্রসাদে সে হোলো প্রতিটি কর্মীর প্রাণপ্রাচুর্যের ঐশ্বর্য। এই প্রাণবন্তুতার ফলেই হয়ত সেদিনের ছবি আজকের দর্শকদেরও আনন্দ দিতে পারে। মনে আছে, বিদ্যাপতির ক্রেডিট টাইটেল থেকে শুরু করে প্রথম দৃশ্য অবধি একই সঙ্গীতের ধারা চলেছে কখনও বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করে, কখনও বসন্তোৎসব বর্ণনা করে। আর কত না সুরের বৈচিত্র্য! রাইবাবুর অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল বলেই এতরকম

সুরের আনাগোনার এমন হার্মোনাইজেশন সম্ভব হয়েছিল। মনে আছে টেকিং-এ মাত্র বারো মিনিট সময় লেগেছিলো। টেকিং-এর আগে রাইবাবু শাসিয়েছিলেন 'চারটে চান্স দেব। তার বেশী নয়।' কিন্তু তার দরকার হয়নি। দুটো শটেই হয়ে গিয়েছিলো। তার আগে অবশ্য রিহার্সাল চলেছিলো অন্ততপক্ষে দুশো বার। খোলা জায়গায় (স্টুডিওর ঘরে না) টেকিং-এর দৃশ্যটি এখনও চোখের সামনে ভাসে। চারদিকে মিঃ বি এন সরকার, মিঃ বড়ুয়া, পি এন রায় ইত্যাদি নিউ থিয়েটার্সের সব হোমরা-চোমরারা সবাই সাগ্রহে বসে। বাইরে প্রচণ্ড ভীড়। সবার সামনে যেন এক মহাপরীক্ষা, আবার মহাউৎসবও। এই উৎসবের আবহাওয়ার সপ্রাণতা আত্মপ্রকাশের প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত করেছিল বলেই কি 'বিদ্যাপতি'র অনুরাধাকে সকলে এত ভালবেসেছিলেন ?

একটা কথা আগেই বলেছি 'বিদ্যাপতি' ছবি 'মুক্তি'র আগে হলেও নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে আমার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল 'মুক্তি' (১৯৩৭-সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর)। 'বিদ্যাপতি' রিলিজড্ হয়েছিল তারও অনেক পরে '৯৩৮-সালের ২২শে এপ্রিল। আর কোলকাতার বাইরে বোম্বে ও করাচীতে ১৯৩৮-সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 'বিদ্যাপতি' দেখান হয়, সেও কিন্তু হিন্দি 'মুক্তি' পর্দার বুকে মুক্ত হওয়ার তিন মাস বাদে।

এবার 'মুক্তি'র অধ্যায়।

'মুক্তি' ও প্রমথেশ বড়ুয়া প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটু বেশী ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসতে ইচ্ছে করছে। এ হোলো একান্তই আমার অন্তরের অন্দর মহলের কথা।

আজ আমার অভিনেত্রী পরিচয়টাই সকলের কাছে বড়। কিন্তু আমার নিজের কাছে সবচেয়ে বেশী দামী আমার গানের মহল। ফিল্মের প্রয়োজনে যেটুকু গান গেয়েছি, আমার গানের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় ঠিক ততটুকুই। কিন্তু আমার নিজের সঙ্গে গানের পরিচয়ের নিবিড় মুহূর্তটির যে মাধুর্য জীবনের অনেক তিক্ততাকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল সেই অনামা অনুভূতির কাছেও ত আমার ঋণ কম নয়। তার মধ্যেই যে আমার জীবনবিধাতার স্নেহস্পর্শের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঘটেছে। নানা কাজে ছড়িয়ে পড়া জীবনটা যেন বাঁচার তাগিদেই সঙ্কুচিত হয়ে গানের অতল রহস্যের মধ্যে আশ্রয় চাইত। ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই গানকে ভালবেসেছি, সে কথা আগেই বলেছি। যেখানেই গান হোতো মন্ত্রমুগ্ধের মত অজান্তেই

কখন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনতে শুরু করেছি হুঁশই থাকত না। হুঁশ ফিরত যখন দিদি গিয়ে স্নান করা বা খাবার জন্ত ধরে আনত। এই প্রসঙ্গে ভোলাদার কথা আগেই বলেছি। ভোলাদা আদর করে যে কয়েকটি গান শিখিয়েছিলেন—সেই কয়েকটি গান মাত্রই আমার সম্বল ছিল। সময় পেলেই একান্তে বসে সেই গানগুলিই আপনমনে গাইতাম। দীন-দরিদ্র মানুষ সময় পেলেই লুকিয়ে রাখা সামান্য সম্পত্তি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে গোপনে নাড়াচাড়া করে যে ধরনের তৃপ্তি পায় অশিক্ষিত পটুত্ব নিয়ে গানগুলি গাওয়ার সময় ঠিক সেই ধরনেরই একটা আনন্দে যেন মেতে উঠতাম।

ম্যাডান থিয়েটার্সে কাজ করার সময়ই অর্থকষ্ট একটু লাঘব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলারাককা নামে এক ওস্তাদের কাছে গান শিখতে শুরু করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে ইনি লক্ষ্ণৌ-এর এক ওস্তাদ। আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কত যত্ন করে যে নানারকম পাল্টা সার্গম শেখাতেন। রোজ ভোরে উঠে গলায় পাতলা চাদর জড়িয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে প্রথমে পনের মিঃ, তারপর আধ ঘণ্টা, পরে দু ঘণ্টা অবধি গলা সাধতে বলতেন। কত উৎসাহ দিতেন, 'বেটি, আচ্ছাসে রেওয়াজ কর। দেখবে সারা হিন্দুস্থানে তোমার কত ইজ্জৎ হবে, নাম হবে। রাজা উজীর তোমায় সেলাম করবে।' কল্পিত সেই যশোগৌরবের ছবি দেখে খুশীতে মন ভরে উঠত। এক-একটি রাগ শিখতাম আর মনে হোতো যেন স্বপ্ন-দিয়ে-ঘেরা ঘুমন্ত রাজপুরীর এক-একটি ঘরের দুয়ার খুলে যাচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলা গাইবার জন্য ইমন রাগের একটি গান শিখিয়েছিলেন— 'সব গুণীজন ইমন গাওত'—এই ধরনের বোল ছিল। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই 'ইমন' রাগটা তখন একেবারেই ভাল লাগেনি। 'ইমন'কে ভাল লেগেছে অনেক পরে। পরিণত বয়সে যখন সঙ্গীত-জীবনের সঙ্গে দেনাপাওনা একরকম চুকে আসছে তখন ইমন রাগটা শুনলেই যেন আবছা একটা মন-কেমন-করার ভাব জেগে উঠত। কিন্তু সে অনেক পরে। প্রথম শিখতে শুরু করার সময় কিন্তু অত্যন্ত নীরস লেগেছিল এ রাগ। ওস্তাদ সেকথা বুঝতে পেরে 'ইমন' পাল্টে 'পূর্বী' রাগ দিলেন। 'পূর্বী'র উদাস করা সুর শুনতে না-শুনতে মন লুফে নিল। 'পূর্বী' গাইবার সময় মনের মধ্যে একটা ছবি ভেসে উঠত। পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে

আসছে। দিনের আলোর বিদায়ী বিষণ্ণতা যেন আকাশের বুকের অন্ত আভায় স্থির হয়ে আছে। আর সেই আলোতেই যেন কোন্ ঘরছাড়া বৈরাগী আপনমনে গান গাইতে গাইতে চলেছে। সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার সুরই কি পূর্বী? সকালের দিকে 'ভৈরব' রাগ শোনামাত্রই যেন ভৈরবের চরণে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেম। ভৈঁরো'-র মধ্যেও উদাসী ভাব আছে। কিন্তু এ উদাসীনতার জাত আলাদা। পূরবীর মত নিজেকে গুটিয়ে নেবার বিষণ্ণতা এতে নেই। এ যেন জীবনকে ফুলের কুঁড়ির মত দল মেলে জেগে ওঠবার প্রেরণা দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় মনকে মুক্ত রাখতে না পারলেই মরণ। 'ভৈঁরো' শেখাবার সময় ওস্তাদ বারবার এইসব কথা শোনাতেন বলেই হয়ত গাইবার সময় চেনা-মহলের অতি-পরিচিত জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হোতো। আর এ মনে হওয়ার মধ্যে এমন এক আনন্দের স্বাদ পেতাম যা আগে কখনও পাইনি।

রাত্রের খুব বেশী রাগ শিখিনি। কিন্তু যে কটি রাগ শিখেছিলাম তার মধ্যে 'বেহাগ' রাগটিই আমার মনের মত। এ রাগের অন্তরে বিরহিণীর দুঃসহ বেদনা গুমরে মরছে। কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করতে নিজের সম্ভ্রমে বাধছে। তাই বাইরের গাম্ভীর্য দিয়ে রুদ্ধ বেদনার বাঁধ বেঁধে রাখা হয়েছে এমনই একটা অনুভব হোতো। ওস্তাদ হেসে বলতেন, 'বেটি, ভাল করে সাধলে এ রাগে তুমি সিদ্ধ হতে পারবে। কারণ তোমার স্বভাবের সঙ্গে এ রাগের বিলকুল মিল।' কিন্তু সিদ্ধ হওয়ারও ভাগ্য থাকা চাই ত; হয়ত সে ভাগ্য করে আসিনি বলেই সিদ্ধ হওয়া আর হোলো না।

ওস্তাদ যেভাবে চাইতেন ঠিক সেভাবে রেওয়াজ করার ইচ্ছে থাকলেও স্টুডিওর কাজের চাপে ঠিক সময় পেতাম না। তাই ক্ষুণ্ণ হয়ে উনি একদিন বিদায় নিলেন। যাবার আগে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আজ যশ ও অর্থের মোহে তুমি কতবড় জিনিস হারালে সেকথা একদিন বুঝবে। খোদাতালা তোমাকে যে কণ্ঠ দিয়েছিলেন মানুষ বহু সাধনা করেও তা পায় না। তাকে বে-খাতির ক'রে শুধু সস্তা নাম ও অর্থ উপার্জনের কাজে বাজে খরচ করলে। একদিন দেখবে নিজের বলতে তোমার কিছুই থাকবে না, সেদিন কিন্তু আফসোশ করতে হবে।'

আজ আমার কর্মজীবনের মুখরতা হয়ত অনেক কমে গেছে। কিন্তু বাইরের জগৎ থেকে অনেকখানিই গুটিয়ে নেওয়া জীবনেই বা চুপ করে

বসে ভাববার অবকাশ কতটুকু পাওয়া যায়? তবু ওরই ফাঁকে ঘুম-না-হওয়া কোনো রাতে যখন বাগানের মধ্যে পায়চারী করি, ফুটন্ত পরিপূর্ণতায় উপচে-পড়া ডালিয়া ফুলগুলো দেখে মনে হয় জীবনে এমন অনেক কিছুই পেয়েছি যা পাবার কল্পনাও কোনোদিন করিনি অথবা পাবার যোগ্যতা আছে বলে ভাবিনি।

নানা দিক দিয়ে আমার ওপর বিধাতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের অন্ত নেই। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক থেকে গেছে যা কোনোদিন পূর্ণ হবার নয়।

সারাদিনে জীবন যেন বড় বেশী ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যা তাকে গুছিয়ে আনে। অজানা রহস্যের তৃষ্ণায় যেন সে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। রাত্রির জমাট অন্ধকারই যেন জীবনরহস্যকে ঘন করে তোলে। তখন সৃষ্টির প্রতি কোণ থেকে বিষণ্ণ উদাস জিজ্ঞাসা জীবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত চায়। তাদের বোবা ভাষা শুনতে পাই, কিন্তু জবাব দিতে পারি না। কারণ এ জবাব নিজেই যে খুঁজে পাইনি।

কাজী সাহেবের উল্লেখ না করলে 'বিদ্যাপতি'-র অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আগেই বলেছি 'বিদ্যাপতি' চিত্রে অনুরাধা চরিত্র-যোজনা কাজী সাহেবেরই পরিকল্পনা।

বোধহয় 'বিদ্যাপতি'তে কাজ করারও অনেক আগে মেগাফোনের রিহার্স্যাল-রুমে জে এন ঘোষ আমার সঙ্গে নজরুলের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। এর আগে তাঁর খ্যাতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু মানুষটির সঙ্গে পরিচয় সেইদিনই। প্রথমটায় তাকাতেই ভয় করছিলো। উনি কত বড় কবি, আর আমি সামান্য একটি মেয়ে। কিন্তু ভয়ের যে সত্যিকার কোনো কারণ ছিলো না, সে-কথা বুঝতে পারলাম কয়েক মুহূর্তেই। চেয়ে দেখি পাঞ্জাবি পরা বাবরী-চুল এক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে হার্মোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গুন-গুন করে সুর ভাঁজছেন চোখদুটি বুঁজে। মাঝে মাঝে চোখ খুলে এদিক-ওদিক অন্যমনস্কভাবে তাকাচ্ছেন, কিন্তু মনটা যে অন্য জগতে, চাউনি দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এক সময় হার্মোনিয়ম থামিয়ে আমাদের দিকে যখন তাকালেন, বিরাট দুটি চোখের উজ্জ্বলতা যেন তার অন্তরটি মেলে ধরল। আমায় সঙ্কুচিত দেখে পরিবেশ সহজ করে তোলবার জন্যই বোধহয় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার গান গলা ও

চেহারার প্রশংসা শুরু করে হাসির হুল্লোড়ে সারা ঘর মাতিয়ে দিলেন। অপরিচয়ের কুণ্ঠা মুহূর্তেই যেন উড়ে গেল। তারপর জে এন ঘোষের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ত খিদে পেয়েইছে—মুখ দেখে মনে হচ্ছে কাননেরও খিদে পেয়েছে। দাদা, এ-বিষয়ে একটু তৎপর হন।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই হাসি। জে এন ঘোষ ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে গিয়ে মস্তবড় থালাভর্তি খাবার, মিষ্টি, আর একটা বড় প্লেটে পান জর্দার স্তুপ এনে হাজির করতেই 'খাও' বলে আমার হাতে গোটা দশ-বা[illegible] তুলে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সব খাবার নিঃশেষ করে শুধু থালাটিই বাকী রাখলেন আনন্দময় মানুষটি হৈ-চৈ করে যেমন বিস্ময়কর পরিমাণ খেতে পারতেন ঠিক তেমনই বিস্ময়করভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাওয়া-খাওয়া ভুলে শুধুমাত্র গান রচনা নিয়েই মেতে থাকতে পারতেন। আর সে কি আশ্চর্যভাবে মেতে থাকা! কখনও যদি কোনো সুর মনে এল সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে কথা বসানো, আবার কখনও বা কথার তাগিদে সুর। রাগরাগিণীর সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান হয়ত আমার ছিল না, কিন্তু লক্ষ্য না করে উপায় ছিলো না, কি ব্যাকুল আবেগে তিনি কথার ভাবের সঙ্গে মেলাবার জন্য হার্মোনিয়ম তোলপাড় করে সুর খুঁজে বেড়াতেন। এ যেন ঠিক রাগের মর্ম থেকে কথার উপযুক্ত দোসর অন্বেষণ।

আমায় অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে বলতেন, 'ডাগর চোখে দেখছ কি? আমি হলাম ঘটক, তা জানো? এক দেশে থাকে সুর, অন্য দেশে কথা। এই দুই দেশের বর-কনেকে এক করতে হবে। কিন্তু দুটির জাত আলা . হলেই বে-বন্তি। বুঝলে কিছু?' বলে হাসিমুখে আমার দিকে তাকাতেন। আমি মাথা নেড়ে স্পষ্টই বলতাম, 'না বুঝিনি।' বলতেন, 'পরে বুঝবে।' পরে ঠিক বুঝেছি কিনা জানি না, তবে বারবার একটা অচেনা অনুভূতির ঝাপসা আলোয় এইটুকু উপলব্ধিই ঘটেছে যে কথার মত অতি-বাস্তব বস্তুর বুকেও অসীমে ব্যাপ্ত হবার দুরাশা জাগানো এবং সুরের মত অ-ধরাকেও কথার মাধুর্যে বন্দী করার মিলন উৎসবে যিনি আত্মহারা তাঁর কবিকৃতিকে উপভোগ করা যতখানি সহজ, ব্যক্তিত্বকে বোঝাটা ঠিক ততখানি সহজ নয়।

'বিদ্যাপতি' প্রসঙ্গে আর একটি সাথী-শিল্পীর কথা মনে পড়ে যায়—পাহাড়ী সান্যাল, আজকের জনপ্রিয় পাহাড়ীদা। এই একটি মানুষকে দেখলাম

বরাবরই একরকম রয়ে গেলেন। সপ্রতিভ প্রাণচঞ্চল খুশীতে যেন টগবগ করে সব সময় ফুটছেন। সব সময় সকলকে উৎসাহ এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রীতে কম্‌প্লিমেণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে পাহাড়ীবাবুর জোড়া নেই। সুদর্শন, উদারহৃদয়, কল্পনাপ্রবণ নায়কের ভূমিকায় ওঁকে ভারী সুন্দর মানাত। 'বিদ্যাপতি'র নাম ভূমিকায় পাহাড়ীবাবু অভিনয় করেছিলেন। তাঁর সেই সুললিত মধুর হাসির তারুণ্য আজও যেন ঠিক তেমনই রয়ে গেল।

'বিদ্যাপতি'র পরই 'মুক্তি' কথাচিত্রে অভিনয় করার পালা। সে রোমাঞ্চকর অনুভূতি কি ভোলার? একদিন যাঁর ছবিতে 'পার্বতী'র ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েও ফস্কে গিয়েছিলো, অবশেষে তাঁরই সঙ্গে কাজ করবার স্বর্ণমুহূর্তটিতে বিনা আয়াসে পৌঁছলাম। মনে পড়ে গেল আমার গুরুদেবের গমগমে কণ্ঠের ভাগবৎ পাঠ 'পর্যায় যোগবিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ'—বিধাতা মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমে সব সাজিয়ে রেখেছেন। মানুষ যথাসময়েই তা পাবে। অকারণ অস্থির হয়ে লাভ নেই। যে বস্তুর জন্য এত আক্ষেপ, মনস্তাপ, তা-ত অলভ্য রইল না? হঠাৎ যেন অনুভব করলাম ব্রহ্মরন্ধ্রে শীতল ধারামতন নামতে লাগল, সকল জ্বালা জুড়িয়ে। কৃতজ্ঞতার আলো যেন উপ্‌চে পড়ল মনের, প্রাণের দুকূল ছাপিয়ে। মনে হোলো ঈশ্বর যার চিরসহায়, ঈশ্বরদ্বেষ ত তাকে সাজে না।

'দেবদাস' ছবি করার সময় মিঃ বড়ুয়া আমার কাছে যখন পার্বতীর রোলের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে-সুযোগ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ রাধা ফিল্মের সঙ্গে তখনও আমার কণ্ট্রাক্ট ছিল। ঠিক কণ্ট্রাক্ট ছিল বললে ভুল হবে, কণ্ট্রাক্ট একরকম শেষ হয়েই গিয়েছিলো। কিন্তু ওঁরা ছাড়তে চাননি। আইনের বেড়াজালে আমায় আটকাতে চেয়েছিলেন। জোর করে আসা হয়ত যেত। কিন্তু ওঁদের কাছে সব সময়ই আমি একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা অনুভব করতাম। শ্রীগৌরাঙ্গের 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'মানময়ী গার্লস্‌ স্কুল'-এর নীহারিকার ভূমিকায় অভিনয় করেই আমার নাম, যশ, খ্যাতির শুরু। তাই ওঁদের সঙ্গে কোনোরকম মনোমালিন্য না ঘটে এবং একটা সৌহার্দ্য-সম্পর্ক থাকে, এইটেই চেয়েছিলাম। তার জন্য যদি কিছু ক্ষতির মূল্যে

দিতে হয় হোক। যাই হোক, সেই উপলক্ষেই মিঃ বড়ুয়াকে প্রথম দেখি। ওঁর সে-সময় খুব নাম ডাক, সম্মান। প্রতিভার অনন্যতায় ত বটেই। তাছাড়াও রাজকুমার, হুজুর ইত্যাদির সম্মানও এ-লাইনে প্রায় উপকথার মতই ছিল। কিন্তু মনে মনে তাঁর যে জমকালো, স্বপ্ন-রঙিন রূপ কল্পনা করে রেখেছিলাম, তার সঙ্গে বাস্তবের বড়ুয়ার যেন মিল পেলাম না। ক্ষীণকায়, ছোটখাটো মানুষটি, অসাধারণ শুধু দুই চোখের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আলো। তাও ভাল করে লক্ষ্য করলে তবে চোখে পড়ে।

যাই হোক, পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিতে হয়েছিলো বলে মনে খুবই কষ্ট ছিলো। কারণ নিউ থিয়েটার্স তখন সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান, যেমন 'হাতী মার্কা' ব্যানার, তেমনি আভিজাত্য। ওখানে কাজ করা তখন যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই অত্যন্ত সম্মানের। তার ওপর শরৎচন্দ্রের বই এবং প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনা। এমন দুর্লভ যোগাযোগ কবারই বা আসে? মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মিঃ বড়ুয়াকে খুলে বলতেই উনি ব্যাপারটা বুঝলেন। স্বল্পভাষী মানুষটি সঙ্গে সঙ্গেই, 'ঠিক আছে। দুঃখ করার কিছু নেই। ভবিষ্যতে আশা করি এরকম যোগাযোগ আবার ঘটবে।' বলেই চলে গেলেন। যোগাযোগ সত্যিই ঘটল। মুক্তি' কথাচিত্রের সময়। সেই প্রথম ওঁকে কর্মক্ষেত্রে দেখলাম।

যে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় কাজ করবার জন্য এত ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে কাজ শুরু করবার অভিজ্ঞতা কিন্তু ততখানি চমকপ্রদ নয়। প্রথম দিন গিয়ে দেখাই হোলো না।

পরদিন যে টাইম দেওয়া ছিল, ঘড়ি দেখে ঠিক তার দশ মিনিট আগে স্টুডিওতে পৌছলাম। সেদিন মিঃ বড়ুয়ার দেখা অবশ্য মিলেছিলো, কিন্তু ওঁর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মনে মনে যে উজ্জ্বল ছবি এঁকেছিলাম তা মিলল না। উনি অল্প দু-চার কথায় চিত্রা-র চরিত্রটি বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তবু ভরিল না চিত্ত। দ্বিতীয়বার হোঁচট খেলাম।

কথাটা বোধহয় আর একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। উনি সে-যুগের একজন প্রগতিশীল পরিচালক। কিভাবে অভিনয় করলে আমাদের মধ্যের সত্যিকারের শিল্পী-সত্তাটি পথ খুঁজে পাবে, কোথায় কিভাবে টেনশান আনতে হবে এসব উনি নিজস্ব টেকনিকে রিহার্স্যাল দিয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন

এইটেই আশা করেছিলাম। কিন্তু সে সৌভাগ্য হোলো না। পরের দিন মিঃ বড়ুয়াই এক অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে বললেন, স্টোরিটা ওঁকে শুনিয়ে দিন, তাহলে ওঁর পক্ষে কাজ করা সুবিধা হবে।' তখন উনি সংক্ষেপে 'মুক্তির' কাহিনী বর্ণনা করলেন। মনে মনে বড় অসহায় বোধ করলাম। এর আগে যাঁদের কাছেই কাজ করেছি, সবাই খুব বিশদভাবে অভিনয়ের ধারা, ভাবভঙ্গী, অ্যাকশন, রি-অ্যাকশন সব বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু মিঃ বড়ুয়া সবই যেন আমার ওপর ছেড়ে দিলেন। শুধু ইঙ্গিত দিলেন, 'চিত্রার মধ্যে একটা দারুণ দ্বন্দ্ব চলছিল। একদিকে সমাজ, বাইরের শো, অন্যের চোখে নিজের সুখ-সৌভাগ্যকে তুলে ধরার গৌরব,—অন্যদিকে প্রশান্তর প্রকাশহীন ভালবাসার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ।' সবই বুঝতাম। তবু কোথায় যেন একটা দ্বিধা ছিল। তখন অল্প বয়স। সবে নাম হচ্ছে। আর প্রমথেশ বড়ুয়ার মত অতবড় একজন নামী লোকের বিপরীতে অভিনয় করা। খুবই আড়ষ্ট বোধ করতাম। তার ওপর আমার অভিনয়, ভাবপ্রকাশ ইত্যাদি ব্যাপারে ওঁর স্তব্ধতাকে একটু ঔদাসীন্য বলেই মনে হোতো। এক এক জায়গায় এসে মনে হোতো একটুর জন্য যেন ঠেকে যাচ্ছি। সামান্য সাজেশন পেলেই হয়ে যায়। কিন্তু তা পেতাম না। তখন অল্পবয়সের অভিমান বা যে কোনো কারণেই হোক মনে হোতো আমার যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ বোধহয় উনি চান না। মনের অতলে অভিযোগের ক্ষোভ সঞ্চিত হলেও মুখে কিছু বলতে না পারার কারণ ছিল অনেক। প্রথমত সে-যুগ এখনকার মত নায়িকাপ্রধান যুগ ছিল না। হিরোইন ইচ্ছে করলেই নিজের পছন্দ অথবা অপছন্দমত কোনো রোল সিলেক্ট অথবা রিজেক্ট করতে পারত না। ডিরেক্টারের আজ্ঞাই ছিল বেদবাক্যের সামিল। তখন এত স্ক্রিপ্ট পড়ানোর রেওয়াজ ছিল না। অভিনয়ের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী কিছু শোনানই হোতো না। তাছাড়া মিঃ বড়ুয়ার তখন অসাধারণ নামডাক, দাপট। ওঁর একটি কথা ফিল্ম-লাইনের যে-কোনো লোকের কাছেই ঈশ্বরের আদেশেরই মত। অন্য সবাইকে 'অমুকবাবু' 'তমুকবাবু' বলা হোতো। কিন্তু রাজকুমার হওয়ার দরুন অথবা যে-কোনো কারণেই হোক বড়ুয়াকে প্রমথেশবাবু কেউ বলত না। বলা হোতো 'বড়ুয়া সাহেব'। বাবুদের কাছে যদি বা অভিযোগ করা যেত, সাহেবের কাছে অভিযোগের কল্পনাই করা যেত না।

যাই হোক, এর ফলে একটা কিন্তু মস্তবড় লাভ হয়েছিলো। এর আগে সম্পূর্ণভাবে ডিরেক্টরের ওপরই নির্ভরশীল ছিলাম। এই প্রথম নিজের মত চলে আপন শক্তির ওপর একটা আস্থা এল। এ-আত্মবিশ্বাস পরোক্ষভাবে মিঃ বড়ুয়ারই দান। তাই এদিক দিয়ে আমি নিজেকে তাঁর কাছে ঋণীই মনে করি। 'মুক্তি' বই বিপুল সমাদর লাভ করেছিল (এবং 'মুক্তি' শীগ্‌গির আবার রিলিজ হবে শুনছি। এটা নিশ্চয় এ-চিত্রের কালজয়ী জনপ্রিয়তার নিদর্শন)। কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো এ-চিত্রে আমার অভিনয় তেমন ক্লি হয়নি। বোধহয় গানের জন্যই অত নাম হয়েছিলো। অবশ্য এটা আমার ধারণা। এ-ধারণা নির্ভুল নাও হতে পারে।

এর অনেক পরে 'শেষ উত্তর'-এ মিঃ বড়ুয়ার সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু 'মুক্তি'-র বড়ুয়ার সঙ্গে 'শেষ উত্তর'-এর বড়ুয়ার ফারাক অনেক। 'মুক্তি'র বড়ুয়া খুব কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মানুষ—যাঁর সময়ের একচুল এদিক-ওদিক হোতো না। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মত কড়া নিয়মের বন্ধনে সকলের আসা-যাওয়া, চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত ছিল। 'শেষ উত্তর'-এ সেই দৃঢ়নিবদ্ধ নিয়মকানুন যেন অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে গেছে। কাজের উৎসাহও অনেক কম। আর একটা কথা। 'মুক্তি'-র সময় যে অভিযোগ মনের অতলে অস্ফুট ছিল, এখন যেন তা দৃঢ়বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হোলো। সেটা হোলো এই যে ডিরেক্টর বড়ুয়া যতখানি বড়, শিল্পী বড়ুয়া ঠিক তত বড় নন। কথাটা অন্য ভাবেও বলা যায় শিল্পী বড়ুয়া কোনোদিন ডিরেকটর বড়ুয়াকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। কথাটা একটু হেঁয়ালী হয়ে যাচ্ছে কি? বিশ্লেষণ করলে কথাটা দাঁড়ায় এই, ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ বড়ুয়া সে-যুগেই অনেক কিছুরই প্রবর্তক, যে ধারায় আজকের যুগের চিত্রজগৎ চলছে। যেমন স্টেজ-ঘেঁষা কথা বলার ধরনকে পরিহার করে ন্যাচারাল-ভাবে কথা বলা, চালচলনকে দৈনন্দিন জীবনাভ্যস্ত চলাফেরার ঢঙে নিয়ে আসা, যার জন্য আজকের যুগেও বড়ুয়ার কোনো ছবিতে ওঁর কথাবার্তার স্টাইল এতটুকুও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তারপর ক্যামেরার কাজ এবং অন্যান্য টেকনিকে ওঁর একটা অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গী ত ছিলই। বাংলা ফিল্মের মোড় উনিই অনেকটা ঘুরিয়েছেন বলা চলে। কিন্তু শিল্পী হিসেবে ওঁর চিন্তা-ভাবনা আর পাঁচজন শিল্পীর মতই ছিল—তার চেয়ে বেশী কিছু অসাধারণও নয় বা সাধারণ নয়। ধরা যাক, কোনো একটি

শট্ নেওয়া হচ্ছে। সেখানে হয়ত ঐ দৃশ্যের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্ম অন্ত কোনো সহশিল্পীর ওপর ক্যামেরার ফোকাসটা বেশী হওয়া প্রয়োজন বা সেটা হলেই শোভন হোতো।

কিন্তু মিঃ বড়ুয়ার প্রবণতা ছিল ক্যামেরার প্রধান অংশটা নিজেই অধিকার করবার। যে-দৃশ্যে উনি আছেন, সে-দৃশ্যে উনিই একক এবং অদ্বিতীয়। ওঁকে ছাপিয়ে আর কেউ যেন বড় হয়ে না ওঠে এইদিকেই যেন লক্ষ্য থাকত। এই দুর্বলতা বা অসংযম শুধুমাত্র শিল্পী পদবাচ্য অন্য শিল্পীকে হয়ত বা সাজত, কিন্তু ডিরেক্টর বড়ুয়াকে সাজে না। ডিরেক্টর হিসাবে ওঁর আর একটু আত্মত্যাগের ঝোঁক থাকা উচিত ছিল। অন্তত আমার মতে। কারণ ডিরেক্টর চাইবেন সকল শিল্পীর অভিনয় সমান ভাল হয়ে একটা সুন্দর টিম-ওয়ার্ক গড়ে উঠুক। কিন্তু শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা থাকেই এবং সেইটেই স্বাভাবিক। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই। এক্ষেত্রে মিঃ বড়ুয়া শিল্পী হবার দরুন অন্যান্য শিল্পীদের মত এই আকাঙ্খার তাড়না থেকে রেহাই পাননি। হয়ত সেইজন্যই অন্যান্য ডিরেক্টরদের মত শিল্পীদের অভিনয়কে আরো ব্রাশ আপ করে দেওয়া ওঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বলছিলাম, শুধুমাত্র ডিরেক্টর হলে যা সহজেই করা যেত, ডিরেক্টর-কাম-শিল্পী প্লাস হিরো হওয়ার দরুন নিরপেক্ষ বিচার হত না।

'শেষ উত্তর'-এ আমার অনেক ছবি এমন অ্যাঙ্গেল থেকে এসেছে যা না আসাই বাঞ্ছনীয়। ওঁকে আমি বলেওছিলাম। কিন্তু সে-ত্রুটি যে শোধরানো হয়নি তার মূলেও ছিল ঐ একই কারণ।

আবার ডিরেক্টর হিসাবে এমন কতকগুলি ফাইন টাচ ওঁর কাজে দেখেছিলাম যা শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। উনি গানকে খুব বড় স্থান দিতেন। নিজে গান ভাল জানতেন কিনা জানি না। মাঝে মাঝে গুনগুন করতে শুনতাম। কিন্তু গান সম্বন্ধে খুব ভাল আইডিয়া ছিল এবং কোন গানের সুর কোথায় কিভাবে দিলে ড্রামাটিক টেনশন ঘনীভূত হবে সে সম্বন্ধে ওঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল বললেও এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয় না। 'শেষ উত্তর'-এর দুই নায়িকা, রেবা ও মীনা। একজন উগ্র আধুনিকা, অপরজন ঘরোয়া মিষ্টি মেয়ে। একটা সিনে এক রেডিও-টকে না সভায় ঠিক মনে নেই, বক্তৃতা দেবার সময় রেবা বলছে, 'বনানীর গাঢ় অন্ধকারে আমরা

বনফুল হয়ে থাকতে চাই না'—ঠিক তার পরবর্তী দিনে মীনা গাইছে 'আমি বনফুল গো'। এখানে একটা গানের কলি দিয়ে উনি দুটি চরিত্রের কনট্রাস্ট যেভাবে দেখিয়েছেন, একরাশ ডায়ালগ দিয়েও তা সম্ভব হোতো না।

'মুক্তি' ছবিতে কাজ করার সময়ই পঙ্কজ মল্লিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। পঙ্কজবাবু তখন সঙ্গীত-জগতের একজন হিরোবিশেষ। আমি নিজেও ওঁর অনুরাগী শ্রোতা ছিলাম। কিন্তু গান শিখতে গিয়ে রীতিমত ভক্ত হয়ে উঠলাম। শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ইনি শুধু শক্তিমান কণ্ঠেরই অধিকারী নন, সঙ্গীতশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করেছেন, তার গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং এ নিয়ে চিন্তাও করেছেন প্রচুর। তাই একাধারে বৈদগ্ধ্যের পরিশীলিত প্রকাশ ও অনুভবের সরসতায় তাঁর গান এমন করে মনকে দুলিয়ে দিতে পারত।

'মুক্তি'র গান শেখানোর জন্য অমর মল্লিক একদিন পঙ্কজবাবুর ঘরে নিয়ে গেলেন। সেইদিনই প্রথম দেখলাম ওঁকে। একটা ফরাশের ওপর হার্মোনিয়মের সামনে বসা মানুষটি। পাশেই একরাশ বই এবং নানান রঙ ও সাইজের খাতা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। আমায় দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে এমন একখানি গান শেখাবো যা তোমার সারাজীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে।'

পঙ্কজবাবুর গান শেখানোর ভঙ্গীটি ছিল বড় আকর্ষণীয়। সুর ও কথার ব্যঞ্জনা এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন যে মনের প্রতি পরতে যেন গাঁথা হয়ে থাকত। ওঁর কাছে আমার প্রথম শেখা গান ছিল 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।' শেখাবার আগে কি দরদ দিয়েই না উনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের দর্শন বুঝিয়ে দিতেন। সেদিনের প্রত্যেকটি কথা আজও কানে বাজে। উনি বলেছিলেন গাইবার সময় একটা কথা সবসময় মনে রেখ 'সবার-রঙ'-এ গানটি হোলির গান নয়—পুজোর গান। এখানে এ-গান দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এইটেই বোঝানো যে প্রশান্ত তোমার স্বামী, তার আনন্দেই তোমার আনন্দ, তার কৃতিত্বেই তোমার গৌরব। "সেই রাতের স্বপন ভাঙা, আমার হৃদয় হোক না রাঙা', কেন রাঙা হবে? না, তোমার রঙেরই গৌরবে। এ রঙ ত খেলার রঙ নয়, এ হোলো প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার রঙ। সাতটি রঙের কোন রঙটি

গানকে রঞ্জিত করেছে, কোন রস গানটিতে প্রধান হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে ভাবতে হবে।

এমনি করে নানাদিক থেকে নানা অনুভবের ছবি মেলে ধরে পঙ্কজবাবু মনকে যেন সুরে বেঁধে দিতেন। সেই মন নিয়ে যা গাইতাম তাই উতরে যেত। এ ছাড়াও উনি সব সময়ে কানের কাছে মন্ত্রপাঠ করার মতই যেন বলতেন 'মুক্তি' বইতে তোমার মুখেই প্রথম সবাই রবীন্দ্রসংগীত শুনবেন। দেখো কবির গানের মর্যাদা যেন এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না হয়। দেবতার চরণে অঞ্জলি দেবার সময় যেমন একাগ্রচিত্ত হয়ে, বিনত হয়ে মন্ত্রপাঠ করতে হয় ঠিক তেমনি করেই এ গান গাইতে হবে। রবীন্দ্রসংগীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলাম বোধহয় পঙ্কজবাবুর বারংবার উচ্চারিত সাবধানবাণীর দরুনই। আর এই জন্যই এ গান সবাই এমন করে নিতে পেরেছিলেন। নিখুঁত উচ্চারণ, সুরের প্রতিটি শ্রুতির স্পষ্টতা ছাড়াও গলার স্বরের বিভঙ্গ, কোন পর্দার কি সেন্টিমেন্ট, এসব দিকেও ওঁর সদা-সজাগ দৃষ্টি থাকত। পঙ্কজবাবুর শেখানোর পদ্ধতিটাই ছিল খুব গুছানো, নিয়মবদ্ধ। যে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষেই ওঁর শিক্ষামতো গেয়ে সাফল্যলাভ করাটা সহজসাধ্য ছিল। পঙ্কজবাবু সত্যিকারের শিল্পী ছিলেন। কিন্তু শিল্পবোধ ছাড়াও শিল্পবোধ সম্বন্ধে যে বাস্তববোধ থাকলে একাধারে গান গাওয়া ও শিক্ষাদানেব নিশ্চিত সার্থকতায় পৌছানো যায় সেই বাস্তববোধ ছিল বলেই পঙ্কজবাবুর গাওয়া এবং শেখানো প্রতিটি গানের আবেদন যুগের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। ওঁর শেখানোর আন্তরিকতা যেমন গভীর ছিল প্রাণ খুলে শিক্ষার্থীকে প্রশংসার পুরস্কার-দানও ছিল তেমনই অকৃপণ। শুনেছি উনি নাকি আমাকে 'ফার্স্ট সিঙ্গিং স্টার অব নিউ থিয়েটার্স' বলেছেন। ওঁর মত গুণীর কাছে এতবড় সম্মান পাবার সৌভাগ্য কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। তবু এ প্রসঙ্গে একটা কথা জানানো কর্তব্য বলেই মনে করি।

রাইবাবু বা পঙ্কজবাবু যখন যাঁর কাছেই শিখেছি, নিমেষের মধ্যে সুর তুলে নিয়ে ওঁদের যে খুশী করতে পেরেছি তার কারণ আমার নিজের কোনো অসাধারণ প্রতিভা বা কৃতিত্ব নয়। এ ছিলো ওস্তাদ আলারাকার কাছে শেখা ও দু-তিন বছর ধরে নিয়মিত রেওয়াজ করা পাল্টা ও সরগমের ফলশ্রুতি। মূল কাঠামো গড়ে দিয়েছিলেন তিনিই। আর সেই কাঠামোর

ওপর মাটি ধরিয়ে, রঙ ফলিয়ে সুসম্পূর্ণ প্রতিমা গড়ে তুলেছিলেন এঁরা।

'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানটি 'মুক্তি' ছবি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সারা দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে পড়েছিলো। কিন্তু জনপ্রিয়তার বিচারে এ গান শ্রেষ্ঠ হলেও আমার মনের মত গান হয়েছিলো 'তার বিদায় বেলার মালাখানি'। ও গানটা যেন আমায় সব সময় 'হন্ট' করত। আর গাইবার সময় পঙ্কজবাবুর গাইবার ভঙ্গিটি অজ্ঞাতেই অনুসরণ করেছিলাম বলেই হয়ত এ গানের অভিব্যক্তি রসিক শ্রোতার এমন বিপুল অভিনন্দন পেয়েছিলো। এই সময়েই এ সত্যও অনুভব করতে পেরেছিলাম যে রাগ সঙ্গীতের ভিত্তিতে গলাসাধা থাকলে যে কোনোরকম গানকেই সুরের সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়। অশিক্ষিত গলায় গাইতে গেলে অন্ধকারে হাতড়ে কোনো জিনিস খোঁজার মতই লক্ষ্যহীন পরিশ্রমে বহু সময়ের অপচয় ঘটে। ওস্তাদজীর বিদায়বাণী মাঝে মাঝে মনে বাজতো 'বেটী কী জিনিস হারালে একদিন বুঝবে'— কিন্তু ও-কথা মনে হলেই কোন এক অনামা ভয়ে বুক যেন কেঁপে উঠত। তাই ও চিন্তাটা সব সময় এড়িয়েই চলতে চাইতাম। 'মুক্তি'র পর মিঃ বড়ুয়ারই এক অ্যাসিস্টেন্ট ফণী মজুমদারের পরিচালনায় 'সাথী'-র নায়িকার রোলে অভিনয় করবার জন্য আমন্ত্রিত হলাম। এ ছবিতে আমার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন স্বর্গত কে এল সায়গাল। 'সাথী'-ছবিতে কাজ করার দিনগুলি সবদিক থেকেই খুব আনন্দের হয়েছিল।

'সাথী'র প্রথম অধ্যায়ে বন্যাবিধ্বস্ত গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা দুটি নিরাশ্রয় ছেলেমেয়ের একেবারে শৈশবের কলহ ও প্রীতি মেশানো বন্ধুত্ব— তারপর কৈশোরের মুকুলিত প্রেম এবং কৈশোর ও যৌবনের সন্ধি-লগ্নে অবুঝ মান-অভিমান, ভুল বোঝাবুঝির দ্বন্দ্বভরা অধ্যায় পেরিয়ে মিলনের আনন্দে মধুর পরিসমাপ্তি। নায়ক ভুলুয়ার ভূমিকায় ছিলেন সায়গল, নায়িকা মঞ্জুর ভূমিকায় আমি। কাহিনী, গান সবদিক থেকেই এ ছবির অভিনবত্ব মন টেনেছিল। অভিনয়ের ক্ষেত্রে ফণী মজুমদার মঞ্জুর চরিত্রটি আমায় খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সবকিছুই পুরোপুরি আমারই ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আনন্দ যে কি জিনিস সেই কথাটাই যেন উপলব্ধি করেছিলাম 'সাথী' ছবিতে কাজ করবার সময়। এতদিনের শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতাকে মনের মত করে ফেলে ছড়িয়ে কাজে লাগাতে পেরে

কত যে স্বস্তি পেয়েছিলাম বলতে পারি না। সমালোচকবৃন্দ থেকে শুরু করে চেনা অচেনা সকলে ব'লেছিলেন আমার 'সাথী'র অভিনয় খুব প্রাণবন্ত হয়েছিল। আর এর জন্য ফণীবাবুর কাছেই আমি সর্বতোভাবে ঋণী। অন্যের ওপর ক্ষমতা খাটাবার পুরোপুরি অধিকার পেয়েও কর্তৃত্ব ফলাবার লোভ সংবরণ করাটা যে কত বড় মহত্বের পরিচয়—আর এ মহত্ব শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কতখানি সহায়ক হতে পারে সে কথা এ ছবিতে কাজ করবার সময় প্রতি পদে পদেই অনুভব করেছি। পরিচালকের বিধি-নিষেধের চাপে সঙ্কুচিত হয়ে থাকাটাই তখনকার দিনের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। 'সাথী'-তে যেন এ শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। এই বাঁচার আনন্দটাই সারা ছবিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফণীবাবুর বন্ধুর মত সহযোগিতা, তাঁর ভেতরের সহজ সরল নিরহঙ্কার মানুষটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

গানের ক্ষেত্রে 'সাথী' একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এ ছবিরও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। 'সাথী'—ছবির গানের সুর রচনা নিয়ে রাইবাবু এক নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন। প্রথমত সায়গল ও আমার কণ্ঠে সুবিখ্যাত 'বাবুল মোরা' গানটি দিয়ে রসিক সমাজকে এই সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন যে, প্রয়োগকৌশলের যাদুতে উচ্চাঙ্গ সংগীতও জনপ্রিয় হতে পারে।

তাছাড়া কয়েকটি গানে অর্কেস্ট্রার ছন্দে ফার্স্ট মুভমেণ্ট, সেকেণ্ড মুভ-মেণ্টের ধাঁচে সুর রচনা করেছেন। অথচ সুর লাগানোর কায়দায় বাঙালীয়ানাকেই এমন পুরোপুরি ভাবে বজায় রেখেছিলেন যে—এ গানে অর্কেস্ট্রার ছোঁওয়া আছে বলে কারো মনেই হয়নি। শ্রোতারা শুধু মুগ্ধ হয়ে গেছেন সুর-বৈচিত্র্য দেখে। সুররচনার সময় আমরা যে কজন রিহার্স্যাল রুমে থাকতাম তারাই ফণীবাবুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা থেকে এ খবর জেনেছিলাম।

একটি গান ছিল 'তোমার হারাতে পারি না'। ঐ গানটির সুর লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় সুরের গতি, তালফেরতা, অবশেষে উঁচু সুরের পর্দায় গানটি শেষ করে সুরের মধ্যে একটি অস্থিরতা ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতকে কিভাবে জীবন্ত করে তোলা হয়েছিল। সায়গলের কণ্ঠের প্রতিটি গান ত অবাক হয়ে শোনবার মত হয়েছিল। আজও স্পষ্টই মনে

পড়ে সায়গলের গান 'টেক' করবার সময় আমি 'মেক-আপ' রুমে থাকলেও ছুটে গিয়ে সব কাজ ফেলে মুগ্ধ হয়ে ওঁর গান শুনতাম। মিষ্টি গলা বলতে যা বোঝায় সায়গলের গলা কিন্তু ঠিক তা ছিল না। ভরাট গলা, দরদভরা মীড়, অতুলনীয় গাইবার ভঙ্গী যেন চুম্বকের মতই মনকে টানত। মানুষটিও ছিলেন ভারী চমৎকার। অবসর সময়ে বসে, দাঁড়িয়ে থাকলেই এই আত্মভোলা মানুষটিকে গুনগুন করে সব সময়ে সুর ভাঁজতে দেখা যেত।

সায়গল যেন নিরেট সিমেণ্ট-বাঁধানো কঠিন প্রাচীরের বুকে কোথায় কোন ফাঁকে গজিয়ে-ওঠা একগুচ্ছো দুর্বাঘাস। প্রাণপ্রাচুর্যের সরসতায় ভরপুর, নম্র সরলতার প্রতিমাতুলা, এমন মধুর মানুষ বড় দুর্লভ।

ওঁর মধ্যেকার যে বস্তুটি ওঁর সংস্পর্শে-আসা যে কোনো মানুষকে একনিমেষেই মুগ্ধ করতে সে হচ্ছে বড় থেকে ছোট অবধি সবার ওপরই সমান দাক্ষিণ্যে ব্যাপ্ত ওঁর আপন-ভোলা অমায়িক উদারতা। স্টুডিওর দরোয়ান, বাগানের মালিকে পর্যন্ত দেখলেই একমুখ হেসে জিজ্ঞেস করতেন, "কেয়া খবর? তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায়?' এতবড় শিল্পী, অত নাম, কিন্তু তার জন্য অহমিকা দূরে থাক, সচেতনতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। উনি যে অত বিখ্যাত, দেখলে কে বলবে? এলোমেলো চুল, একমুখ পান, আধ ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অতি সাধারণ মানুষটির সঙ্গে যখন মিঃ পি এন রায় আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন. অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ইনিই কে এল সায়গল? যাঁর গান শুনে কত তন্ময় মুহূর্ত বিস্ময় বিগলিত হয়েছি? চমক ভাঙে যখন সেই অতি-সাধারণ কিন্তু অসাধারণ মানুষটি শরীরটি সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে একগাল হেসে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। আমার গান ও অভিনয়ের তারিফ করলেন এমনভাবে যেন আমি কত বড় শিল্পী। এত লজ্জা পেয়েছিলাম যে প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারিনি।

সায়গলের সঙ্গে কাজ করার সময়ে লক্ষ্য করেছি, কত সহজে, কেমন হাসিমুখে নিজেকে ব্যাকগ্রাউণ্ডে রেখে উনি অন্যকে প্রধান হয়ে ওঠবার সুযোগ দিতেন। আর নিজের গুণাবলী সম্বন্ধে কি এতটুকুও জাহিরীপনা ছিল?

অন্য সবার সঙ্গে অভিনয় করবার সময় আমার মনের অতলে প্রচ্ছন্ন

অহংকার হয়ত বা থাকত যে অভিনয়ে আমার চেয়ে বড়ও যদি কেউ থাকে গানে আমি সে শ্রেষ্ঠত্বকে ছাপিয়ে যাব। কিন্তু সায়গলের কাছে ত' আর সে গর্ব চলত না। গানের জন্য ওঁর ভারতজোড়া খ্যাতি। ওস্তাদমহলও গজল গায়ক সায়গলকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। তাই বড় নার্ভাস লেগেছিল 'সাথী'-তে গানের ঝোলে ওঁর সঙ্গে অভিনয় করবার সময়। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার মতই এক ঝাপ্টায় যেন সকল সঙ্কোচকে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'আরে দূর, ছেড়ে দিন ওসব ঝুটঝামেলার বাত। আপনি গান ত।'

গান শুরু হতে না হতেই 'বাহবা, কেয়া বাত'—বলে মাথা নেড়ে যেন উৎসাহের প্লাবন বইয়ে সব ভয়কে ভাসিয়ে দিতেন। নিমেষের মধ্যে যেন প্রেরণার চকিত বিদ্যুতে সারা মন ঝলকে উঠত। হঠাৎ অনুভব করতাম গান গাইতে শুধু ভালই লাগছে না, মন চাইছে আরো ভালো, অনেক ভালো করে গাইতে। এ প্রেরণার দাম কি কম? যে যুগে কঠিন শাসন ও নিয়মের শ্বাসরোধী বন্ধনে শঙ্কিত, ভীরু মন আত্মপ্রকাশে সংকুচিত, সে যুগে ভরসার আলোয় সকল বাধাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য এই স্নেহমধুর মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় সারা মন নুয়ে থাকত। এ ঋণ কি কোনোদিন শোধ হবার?

তখনকার দিনে গান রেকর্ডিংয়ের সময় একটাই মাইক্রোফোন থাকত। সে কোরাসই হোক আর ডুয়েটই হোক। যাঁরা গাইতেন তাঁদের প্রত্যেকেই মাইকের প্রধান অংশটাই অধিকার করবার চেষ্টা করতেন। আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ও সায়গলের ডুয়েট গান টেকের সময় উনি চট্ করে সরে গিয়ে মাইক্রোফোনের দিকে আমাকেই ঠেলে দিতেন। আমি লজ্জিত হয়ে আপত্তি করলেই পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন, 'কোই বাত নেহি, আপনি গান ত।' ক্যামেরার বেলাতেও তাই। কোনো শট্ নেবার সময় হয়ত এমনভাবেই দাঁড়াতেন যে কারো নজরেই এলেন না। এ নিয়ে আমি কিছু বলতে গেলেই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে 'আরে দূর! দেখার মত জিনিসকে লোকে দেখতে পেলেই হোলো।' বলেই সারা স্টুডিও চমকানো ওঁর সেই উচ্চহাসির গমক কি ভোলার? এমন আত্মভোলা মহত্ব আর কারো মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আবার দুরন্ত শিশুর মতন বেপরোয়া সায়গল সত্যিকারের অন্যায়

করলেও কেউ ওঁর ওপর রাগ করতে পারত না। হয়ত সেট রেডি, প্রধান শট্ তাঁকে নিয়েই, কিন্তু হিরোর দেখা নেই। অপেক্ষা ও ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন প্যাক-আপ করার কথা ভাবা হচ্ছে, কে একজন হঠাৎ আবিষ্কার করল একদম শেষের ছোট্ট ঘরটায় একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম নিয়ে সায়গল সাহেব বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ভুলে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন। সেখানে ধাওয়া করে ওকে ধরে আনতেই 'ওঃহো এখখুনি আসছি'—বলেই এক ছুটে গিয়ে আধা-মেকআপ সেরে এসে 'রাগ করিস কেন ভাই, এই ত হয়ে গেল'—বলেই এর গালে একটা পান গুঁজে দিয়ে, ওর চিবুক ধরে গজল শুরু করে দিলেন 'মেরে দিলমে দিলকে পেয়ারা'—। তারপর আর এক ছুটে মেকআপ শেষ করে পাগড়ি পরতে পরতে প্রবেশ। সেট শুদ্ধু লোক হেসেই অস্থির। রাগ করবে কার ওপর?

'সাথী'-তে কাজ করবার সময়ই অনেক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আগেই বলেছি বন্যার জলে ভেসে আসা দুটি ছোটো ছেলে-মেয়ের কাহিনী নিয়ে 'সাথী' চিত্রের শুরু। জলের ওপর দাঁড়িয়ে স্যুটিং হচ্ছে। হঠাৎ বান এলো। কে কোথায় স্রোতের তোড়ে ছিটকে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে হয়ত কোনো হদিশই মিলল না। তারপর সাঁতারপটু কেউ জলে নেমে ভিজে সপসপে মানুষটাকে তুলে আনল। এভাবে কাজ করার মধ্যে বিপদ ছিল, কিন্তু আনন্দও কিছু কম ছিল না। ঐ 'সাথী'তেই ঝড়ের একটা সিনে প্রপেলার এনে কৃত্রিম ঝোড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করা হোলো। সেই হাওয়ায় সায়গলের পরচুল কোথায় উড়ে গেল! যখন নজরে পড়ল, সবার সে কি হাসি। এমনই আনন্দের হাটে কাজ চলেছিল বলেই হয়ত 'সাথী' এত স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর ছবি হতে পেরেছে।

'সাথী' রিলিজড হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে খুব সাড়া পড়ে গেল। সায়গল ও আমার কম্বিনেশন লোকে খুব নিয়েছিল। ১৯৩৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর 'চিত্রা' ও 'নিউ সিনেমা'য় 'সাথী' শুরু হোলো। 'সাথী'রই হিন্দী সংস্করণ 'স্ট্রীট সিঙ্গার'ও সবাই সমান আগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু যে আনন্দ ও নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের পাল তুলে 'সাথী'র কাজ চলেছিল ঠিক তারই বিপরীত এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল 'সাপুড়ে' ছবিতে। 'সাপুড়ে' হোলো সাপুড়ের দলে পুরুষবেশী একটি কিশোরীর ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাজাত বিচিত্র

অনুভূতির কাহিনী। ছবিটা অবশ্য আগের ছবিগুলির আশ্চর্য সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই উতরে গিয়েছিল অসম্ভব ভাবে। কিন্তু তার অন্তরালের সংঘাতের কাহিনীর ভয়াবহতা আজো ভুলতে পারিনি।

সাপুড়ে হচ্ছে সাপ-খোপের ব্যাপার। সাপের ওপর ছোটোবেলা থেকেই আমার এমন একটা ঘৃণা, ভয় (এখনকার ভাষায় এলার্জি) ছিল যে সাপ দেখলেই মূর্ছা যাবার উপক্রম হোতো, মরা সাপও সহ্য করতে পারতাম না চোখের সামনে। আমি প্রথম থেকেই আপত্তি করেছিলাম। এ-রোল অন্য কাউকে দিয়ে করানো হোক। কিন্তু দেবকীবাবুর প্রচণ্ড জেদ আমাকেই এ-রোল করতে হবে। নিউ থিয়েটার্সে তখন আমি মাস-মাইনের শিল্পী। কর্তৃপক্ষকে অমান্য করবার জো-টি নেই। অতএব বিতৃষ্ণা ও তিক্ততার রণক্ষেত্রে নামতেই হোলো। 'সাপুড়ে'-র বিশেষ করে হিন্দী ভার্সান যতদিন চলেছিল শরীর ও মনের ওপর দিয়ে যে কি অমানুষিক ধকল গেছে ভাবা যায় না।

আমার সাপের ভয় ভাঙ্গাবার জন্য দেবকীবাবু কাঠের, রবারের, কাগজের ইত্যাদি অনেক রকমের সাপ তৈরী করে আমার সামনে ধরতেন। কখনও বা গায়ের ওপর ছুঁড়ে দেবারও ভঙ্গি করতেন। কিন্তু সাপের কল্পনাও যে সহ্য করতে পারে না তার কাছে রবার অথবা কাগজে কিছুই সুবিধা হোতো না। সাপের আকৃতি দেখলেই আমি সারা স্টুডিওময় ভয়ে ছুটে বেড়াতাম, আর আমার পিছু পিছু ঐ ধরনের সাপ হাতে ছুটতেন দেবকীবাবু। কতবার আছাড় খেয়ে পড়ে যেতাম। হাত-পা কেটে যেত, পা মচকে ফুলে যেত। তবু ছাড়ান নেই। আজো বেদনা বাজে এই ভেবে যে একটা অল্পবয়সী, নিরীহ মেয়ের ওপর এটা ত এক ধরনের অত্যাচারই। কিন্তু সারা স্টুডিওতে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার অথবা আমাকে বদলে অন্য কাউকে এ ভূমিকায় নামাবার জন্য প্রস্তাব অথবা অনুরোধ করার মতও কেউ ছিল না। এমনই অসহায় ছিলাম আমরা সে যুগের নায়িকারা।

হিন্দী সংস্করণের সময় বাংলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর ভূমিকায় ছিলেন এক অবাঙ্গালী শিল্পী। যেমন তার দৈত্যের মত বিরাট চেহারা, তেমনই কদর্য অভ্যাস। আমার দুকাঁধ ধরে ঝাঁকুনী দিয়ে সাপের মন্ত্র পড়া তার অভিনয়েরই অঙ্গ ছিল। অতবড় মানুষটার এই ঝাঁকুনী সহ্য করাটা এক ক্ষীণকায়া কিশোরীর পক্ষে কতটা যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা, তা ভুক্তভোগী

ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আর কাঁধ বা বাহু যেখানেই তাঁর শ্রীহস্তের স্পর্শ পড়ত সেখানেই কালসিটে হয়ে যেত। এতেও কি নিস্তার আছে? হিরোইনের কাছে এসে কথা বলার সময় তার মুখ থেকে কমপক্ষে সেরখানেক থুথু ছিটকে এসে আমার মুখে পড়ত। টেকের পর বমি করে ফেলতাম। সারাদিন ধরে গা ঘিনঘিন করত। খেতে পারতাম না। এইরকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে করতে 'সাপুড়ে'র কাজ করতে হয়েছে।

আমি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের উদ্দেশ্যে এই ঘটনার অবতারণা করছি না। আগেকার দিনের শিল্পীদের কত অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হোতো, সেই কথাটা জানাবার জন্যই অতীতের পর্দাটা তুলে ধরলাম। আজকের চিত্রশিল্পীদের সম্মানে আমি আনন্দিত এই কারণে যে বাংলা সিনেমার প্রথম অধ্যায়ে আমাদের যে দুঃখ ও অসম্মানের মূল্য দিতে হয়েছে তা ব্যর্থ হয়নি। এবং এ সার্থকতা আমাদের জীবনেই দেখে যেতে পারলাম। আরো খুশী হব শিল্পীরা যদি নিজেদের জীবন, কাজ, চিন্তা ও আচরণে শিল্পরসিকদের দেওয়া এই সম্মানের মর্যাদা রাখতে পারেন। আমি আশা করব তাঁরা তা রাখবেন।

'সাপুড়ে'তে কাজ করার দুঃখবহ অভিজ্ঞতার কথা আগের অধ্যায়ে বলেছি। কর্মক্ষেত্রে ত এই বিপত্তি। আবার কাজের অবসরে আমার বয়সী অন্যান্য সাথী-শিল্পীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে হাসি গল্প করে যে মনটাকে একটু তাজা করে নেব তারও কোন উপায় ছিল না। নিউ থিয়েটার্সে আমার আগমন এবং এত শীঘ্র হিট্‌ পিকচার্সের নায়িকা হওয়াটা অনেকেই তেমন প্রীতির চোখে দেখেননি। হয়ত-বা সেই জন্যেই তাদের সখীত্বের অন্দর-মহল আমার জন্যে বন্ধ। সকলের হাসি, বিদ্রূপের আঘাতে একাকীত্বের দ্বীপান্তরেই নিষ্ঠুরভাবে আমায় ঠেলে দেওয়াটাই হয়ত আমার প্রতি তাঁরা যোগ্য ব্যবহার হবে বলে মনে করেছিলেন। আমারও জেদ চেপে গিয়ে-ছিল নিজে থেকে না ডাকলে আমিও কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাব না। মনে আছে, ফিরপো হোটেলে সতীর্থ এক শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করলাম। কিন্তু আমার সে নমস্কারকে উপেক্ষা করে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। কারণ? তিনি অভিজাত-বংশীয়া। তাই আমার মত সাধারণ এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সাধারণ সৌজন্য

মেনে চলাটাও তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়েছিল। চার দিক থেকে এই রকম ঘা খেতে খেতে মনটাকে বাইরে থেকে একেবারেই গুটিয়ে নিয়েছিলাম। নিজের ভাবকল্পনা ও উচ্চাশার ভাবরাজ্যেই যেন বাইরের ব্যথাদগ্ধ, স্পর্শকাতর মনটা আশ্রয় পেতে চাইত। সব সময় ভয় ছিল বাইরের কারো সংস্পর্শে এলেই দুঃখ পেতে হবে। বন্ধু, স্নেহ, ভালবাসা এসব ত আমার জন্য নয়।

এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও যার সহজ সখিত্ব ভারাক্রান্ত মনকে স্নেহের আশ্বাস দিয়েছিল সে হল মলিনা। তখনকার দিনে মলিনাও যথেষ্ট নাম-করা নায়িকা। কমিক, সিরিয়াস সব রকম চরিত্রেই ও সমান দক্ষতায় অভিনয় করে গেছে। কিন্তু ওর মধ্যে কখনও যাকে বলে 'দেমাক' তা দেখিনি। হাসি, হুল্লোড়, হৈ-চৈ-এও মলিনার জোড়া ছিল না।

আমার ও মলিনার একটা জয়েণ্ট স্যুটকেস ছিল। তার মধ্যে মুড়ি, চিড়ে-ভাজা, ছোট বঁটি, স্টোভ, পাউরুটি, মাখন এই সব নানান টুকিটাকি খাবার ও রাঁধবার জিনিস থাকত।

নিউ থিয়েটার্সের বিরাট চত্বরের পুকুর পাড়ে কখনও-বা আমগাছতলায় বসে মুড়ি বাদাম খেতে খেতে আমরা কত গল্প করতাম। মনের কথা বলাবলি করতাম।

তখনকার দিনের মস্ত বড় অভিনেত্রী ছিলেন উমাশশী, চন্দ্রাবতী। নায়িকার খ্যাতিতে পুরোভাগেই এঁদের নাম ছিল। আমি যখন এন-টিতে যোগ দিই, ঠিক তখনই উমাশশী চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। 'চণ্ডীদাস' কথাচিত্রে ওঁর রামীর ভূমিকার খ্যাতি প্রায় উপকথারই সামিল হয়ে উঠেছিল। 'দিদি' ছবিতে চন্দ্রার প্রেসিডেণ্টের অভিনয় এখনও যেন চোখের সামনে ভাসে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং ডিগনিফায়েড রোল ওকে দারুণ মানাত। আর, সব মিলিয়ে ওর জোড়া রূপসীও এ লাইনে খুব কমই ছিল।

বন্ধু বা শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা বিরল হওয়ার দরুন অথবা যে কোন কারণেই হোক মনটা ছোটবেলা থেকেই খুব অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিল। গুরুবলও এর অন্যতম কারণ হ'তে পারে। অবসর সময়ে গান ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত আর বলতে লজ্জা নেই ঠাকুরমার ঝুলিও পড়তাম। আমার একটা প্রিয় বই ছিল—নানান জাপানী উপকথার সঙ্কলন।

সব সময় স্বপ্ন দেখতাম ধূলিমলিন জীবন ও জগতের থেকে অনেক

অনেক দূরে ছবির মত এক সুন্দর বাড়িতে আমি থাকব। চারিদিকে থাকবে শুধু ফুল কিংবা ফুলের মত সুন্দর ছবি ও আসবাব। যদি সামান্য এতটুকু জিনিসও থাকে, বাড়ির সামগ্রিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে তাও ছবি হয়ে উঠবে। যেখানে আমি থাকব, চলব, ফিরব, কথা বলব, ভাবব; তার প্রতিটি আনাচে-কানাচে থাকবে মধ্যযুগীয় জমকালো পরিবেশ। শুধু কি তাই? চলার মাটি, দরজা-জানালা সবই তাদের বাস্তবতা হারিয়ে স্বপ্নচ্ছায়া হয়ে উঠবে।

ছোটবেলা থেকেই বাস্তবের এত নির্লজ্জ নীচ রূপ দেখেছি যে 'বাস্তবতা' নামটা শুনলেই যেন গা শিউরে উঠত। সব সময় বাস্তব জীবন ও জগৎ থেকে মনটা ছুটে পালাতে চাইত। নানা রকম বিদেশী ম্যাগাজিন কিনে ঘর সাজানোর নানান আর্ট, কতরকমভাবে কত সুন্দর করে ফুল সাজান যায় তারই মধ্যে ডুবে যেতাম। ইংরাজী সিনেমা দেখবার সময় অভিনয় ছাড়াও ওদেশের সিঁড়ির নানান প্যাটার্ন, ঘরের আসবাবপত্র রাখার ঢং, মন দিয়ে লক্ষ্য করতাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ছক কাটতাম, আমার যখন বাড়ি হবে, সেই কল্পিত বাড়ির গেট থেকে শুরু করে বেডরুম অবধি কেমন করে সাজাব। কারুকার্যকরা বিরাট বিরাট দরজার কোন দিকে কি ধরনের ফুলদানী রাখার স্ট্যাণ্ড থাকবে, আলমারী খোলার হোল্ডারকে রামায়ণ মহাভারতের যুগের নূপুর ছাদে গড়ব, দেহাতী বালার মত না রূপোলী পদ্মফুলের গড়নে? একটা ঘরের দেওয়াল হবে গোলাপ ফুলের মত। সেখানের আলো শেড—সবেরই হবে গোলাপ-ঘেঁষা রঙ। অন্য ঘরটি হবে চোখ-জুড়ানো হাল্কা সবুজ রংয়ের আর সেই রংয়ের সঙ্গেই ছন্দমেলানো অন্য সব কিছু। শোবার ঘরটি কিন্তু হবে নীলঘেঁষা, মাথার কাছে থাকবেন আমার গোপাল। মন্দিরে রাখলে উনি আচার-অনুষ্ঠানের আড়ালে চলে যাবেন। বড্ড দূর হয়ে যাবে। অতদূরে গোপালকে রাখলে সকাল-সন্ধ্যা চলতে-ফিরতে দুষ্টু দুষ্টু মুখখানি দেখতে পাব না ত। এই রকম নানান আজগুবী কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতাম; শুধু কি বাড়িরই কল্পনা? আরও নানা রকম চিন্তা।

এবার নিউ থিয়েটার্সের প্রসঙ্গে আসি। অন্য কোম্পানীতে কাজ করার পর নিউ থিয়েটার্সে এসে এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অন্যান্য জায়গায় স্যুটিং, টেক ও রিহার্স্যাল

সবই একটা পরিমিত সময় এবং অর্থব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে এসে দেখি সারাদিন ধরে স্যুটিং চলছে ত চলছেই। টেক হচ্ছে ত হচ্ছে। রিহার্স্যালের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এককথায় অকারণ অর্থব্যয় ও অপব্যয়ের চূড়ান্ত। ওখানে কারো কাছে এ নিয়ে কোনো বিস্ময় প্রকাশ করলেই মুচকি হেসে যা বলত তার মানে হোলো এই—এ হচ্ছে হাতী-মার্কা নিউ থিয়েটার্সের ব্যাপার। এখানেও যদি অত হিসেব-নিকেশ করেই খরচপত্র হবে তাহলে আর অন্য কোম্পানীর সঙ্গে এন-টির তফাতটা কি হোলো? এইটেই ত এন-টির আভিজাত্য।

এন-টির কর্মীরা যাই বলুন, আমি কিন্তু বেদনার্তচিত্তে লক্ষ্য করতাম, অত বিরাট প্রতিষ্ঠানও যেন অপব্যয়ের চাপে ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসছে। বিরাট গ্ল্যামারের বাইরের জৌলুষ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বলেই এ দিকটা কারো চোখে পড়েনি। অথবা এ নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করেননি। কিন্তু জীবনে দুঃখ ও দুর্দশার দিকটির সঙ্গে ছোটো-বেলা থেকেই বড্ড বেশীরকমের পরিচয় হয়ে গিয়েছিলো বলেই কিনা জানি না, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম বাংলাদেশের অতবড় ঐশ্বর্যভাণ্ডারের কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে এবং তার বিপুল সম্পদও নিঃশেষ হওয়ার পথে। আর সকলের সব ধারণা ও কল্পনাকে ছাপিয়ে ঐ হাতীমার্কা ব্যানারের এন-টি-ও হঠাৎই একদিন ধ্বসে পড়বে। সেদিন যে বাংলা-দেশের কত অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা ভাবা যায় না।

নিউ থিয়েটার্সে মাঝে মাঝে প্যাণ্ডেল বেঁধে গানবাজনার আসর বসত, অভিনয়ও হোতো। মনে আছে, একবার 'আলিবাবা' নৃত্যাভিনয়ে আমি ও লীলা দেশাই মর্জিনা আবদাল্লা হয়েছিলাম। এইসব উৎসবে তখনকার 'ছোটলাট', আরও কত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসতেন। আমিও অনেকবার গান গেয়েছি। মাঝে মাঝে রেডিওতে রিলেও হোতো। তখন ঘরে ঘরে এত রেডিও ছিল না। যাঁদের বাড়ি রেডিও থাকত লোকে তাঁদের রীতিমত সম্ভ্রমের চোখে দেখত। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে রেডিও-থাকা বাড়ির চারপাশে বহুলোকের ভীড় জমে যেত। অতএব রেডিওতে রিলে-হওয়া-উৎসবের শিল্পীদের যে বিশেষ সম্মান ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

একবার বন্যার জন্য একটা চ্যারিটি শো হয়েছিল। এই উপলক্ষে

নানান ঘটনার মধ্যে পঙ্কজবাবুর একটি কথা আজও আমার মনের অতলে মূল্যবান রত্নের মতই সঞ্চিত আছে। অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য পঙ্কজবাবু সবাইকে গান শেখাচ্ছিলেন। আমায় বললেন, 'তোমার পছন্দমত কয়েকটা গান ঠিক করে নাও।' আমি ত ভয়ে সঙ্কোচে দিশেহারা। বললাম, 'সে, কি? এখানে আমি কি গাইব? এসব আসরে গাইবার মত গান ত আমি জানি না।' পঙ্কজবাবু উঠে দাঁড়িয়ে 'সাবাস' বলে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। তারপর উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার ঐ একটি কথাতেই যথার্থ শিল্পী মনটি প্রকাশ পেয়েছে।' আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। এতবড় আসরে এবং এই উপলক্ষে গাইবার উপযুক্ত গান আমি জানি না এইটুকুই ছিল আমার বক্তব্য। এর মধ্যে এতবড় সম্মানের কথা আসে কি করে? আমার মতই অন্য সবাইও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। উনি বললেন, 'বুঝতে পারলে না?' তারপর অন্য সবাই-এর দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ, ফিল্মের এমন নাম-করা গাইয়ে মেয়ে, এ ত অনায়াসেই কোনো হিট্ পিকচারের পপুলার গান গেয়ে হাততালি নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু ওর চিন্তা সেদিক দিয়ে গেলই না। ওর ভাবনা হোলো এই সময়ের উপযুক্ত গান ও জানে না। এই একটি কথার মধ্যেই ওর শিল্পী সত্তাটি উঁকি দিয়েছে। তাই বলছি, কানন আমাদের সত্যিকারের শিল্পী হয়ে উঠেছে। ওর সাধনা সার্থক।' এতবড় গুণীর মুখে এই প্রশংসা শুনে সেদিন চোখের জলকে আর রুখতে পারিনি। সবার সামনেই এই প্রথম অঝোর ধারায় আমার চোখের ধারা গড়িয়ে পড়েছিল।

আজ বুঝতে পারি সেদিন কেন এত সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই চারিদিক থেকে দুর্দশার পীড়নে মনটা বড় স্পর্শকাতর আর ভীতু হয়ে পড়েছিল। কারো সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে এমন কি নিজের কোনো মতামত প্রকাশ করতেও ভয় পেতাম। কাজে নামতে না নামতে আশাতীত নাম, যশ পেয়েছি। আবার এরই কারণে অপযশও কম পাইনি।

আমার ব্যথাদগ্ধ অন্তরের এই নীরবতাকে সবাই অহঙ্কার বলেই ভাবত। আর তাদের কল্পিত এ অহঙ্কারকে আঘাত করবার জন্যই আমার ত্রুটি-খোঁজা ও বিরুদ্ধ সমালোচনায় মেতে ওঠাতেই তারা যেন নিষ্ঠুর আনন্দ পেত।

নিজের সম্বন্ধে সেইসব অপবাদ ও নিন্দায় অভ্যস্ত অন্তরই বোধহয় পঙ্কজবাবুর এতবড় অপ্রত্যাশিত কমপ্লিমেণ্টে এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ অবধি আমার কর্মজীবনের এক অবিচ্ছিন্ন গৌরবোজ্জল যুগ। 'সাপুড়ে'র পরই হিন্দী চিত্র 'জওয়ানী কি রাত' সারা ভারতে আমার শিল্পখ্যাতিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছবিতে আমার বিপরীতে ছিলেন নাজাম—যাঁর অসামান্য সৌন্দর্য-খ্যাতিও ছিল ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

এ ছবিরই বাংলা সংস্করণ 'পরাজয়'। নামে 'পরাজয়' হলেও এ ছবির স্থান কিন্তু আমার জয়ের তালিকার প্রথম সারিতেই। তার প্রথম ও প্রধান কারণ অভিনীত চরিত্রটি আমার খুব পছন্দসই ছিল। একদিকে যৌবন-দৃপ্ত রমণীর চিত্তবিভ্রান্তকারী সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের আত্মহারা আবেদন-নিবেদনের এক কৌতুকী প্রকাশ, অন্যদিকে প্রতি পুরুষের কামনার মুকুরে প্রতিফলিত আপনার রমণীলাবণ্যের নানারঙা সুষমা ও মাদকতাকে প্রত্যক্ষ করার রোমাঞ্চে নায়িকাচিত্তের বিস্মিত জাগরণ। জয়ের নেশায় মাতোয়ারা নারীর নিত্যনূতন সজ্জা ও নিত্যনূতন প্রেমিকের সঙ্গে পথচলার উন্মাদনা এ ছবির একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে! হেমচন্দ্র পরিচালিত 'পরাজয়' ছবির হিন্দী সংস্করণ দিল্লীতে মুক্তিলাভ করে ১৯৩৯ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর। কোলকাতায় হিন্দী-বাংলা দুটি সংস্করণই মুক্তি পায় মার্চ মাসে।

শুধু যদি পুরুষচিত্তে রূপজাল বিস্তারের সর্বনাশা মোহই এ ছবির শেষ কথা হোতো, তাহলে হয়ত অনীতা চরিত্রটি আমায় এমন করে টানত না। কিন্তু বাইরের চটুলতার উদ্দাম কল্লোল শান্ত হয়ে এলে ক্লান্ত রমণীচিত্তে প্রণয়তৃষ্ণার উন্মেষে যে বিষাদ-গভীর আলো জ্বলে ওঠে, তারই মধ্যে শুধু নায়িকার নয় নিজেরই অন্তরতম সত্ত্বারই এক অজানা স্পন্দনকে যেন অনুভব করলাম। কৌতুকের সঙ্গে অশ্রু না মিশলে বুঝি মনের আকাশে নানান অনুভবের এমন রামধনুর রঙ ফোটে না। আমার অনুভবের এই রঙিন আলো যে দর্শকচিত্তকে অনুরঞ্জিত করতে পেরেছিল, প্রতিদিন অসংখ্য টেলিফোন ও চিঠির স্তূপই তার প্রমাণ। সকলের অভিনন্দই আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপেই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে স্মরণীয় হয়েছিল ইউরোপ থেকে এ দেশে সাংস্কৃতিক সফরে আসা অকসফোর্ডের এক ছাত্রের মুগ্ধচিত্তের সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমজ্ঞাপন। মনে আছে নিউ থিয়েটার্সে একদিন পি এন রায় আমায় গোলঘরের কাছে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন এক

বিদেশী তরুণের সঙ্গে। দীর্ঘদেহী, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি স্বপ্নময় ঘন নীল চোখ, একমাথা সোনালী কোঁকড়া চুল। খুব মিষ্টি হেসে করমর্দন করে আমায় বললেন, "I have never experienced before such enthralling voice and alluring beauty".

আমার হাতে দিলেন ওদেশেরই এক কবির বাণী লেখা একটি সুন্দর রঙিন কার্ড। বিদেশী বন্ধুর নামটি মনে নেই। কারণ কার্ডটি হারিয়ে গেছে। কিন্তু লেখাটি ভুলিনি—

"Charm is a sort of bloom on a woman. If you have it you do not need to have anything else—and if you do not have it, it does not matter what else you have".

কথাগুলি ভাল লাগার কারণ আত্মস্তুতির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগই শুধু নয়। এর আগেও অভিনয়, রূপ অথবা গানের জন্যও স্তুতিবাদ কিছু কম পাইনি। কিন্তু সেসব স্তুতির মধ্যে থাকত কেমন যেন একটা স্থূলতার স্পর্শ যাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে মনের কোথায় যেন একটা দ্বিধা জাগত। কিন্তু এই বিদেশীর মুগ্ধদৃষ্টির মধ্যে একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল, আর লিখে-দেওয়া ঐ কথাটির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার মধ্যে ছিল বিদগ্ধ শিল্প-রসিকের মার্জিত রুচির স্বাক্ষর। বোধহয় সেইজন্যই মনে এমন গভীর দাগ কেটেছিল।

'পরাজয়ে'র গানগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, বিশেষ করে 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গানটি।

'পরাজয়' আমার জয় ঘোষণা করলেও অমর মল্লিক পরিচালিত 'অভিনেত্রী' আমার অভিনেত্রী জীবনের পরাজয় হয়ে দাঁড়ালো। 'অভিনেত্রী' হোলো ভাগ্যলাঞ্ছিত হৃতগৌরব অসহায়া রমণীর, প্রেমিকের কাছে আশ্রয়-প্রাপ্তি। রোগের আক্রমণে কণ্ঠলাবণ্যহারা নায়িকা ও গায়িকার নায়কের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া বাঁচার উপায় ছিল না। দর্পিতা রমণীর এ হেন আত্মসমর্পণকে পরাজয় না বলে পতনই বলা যায়। এ চরিত্রে অভিনয় করবার আমার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেই এক সমস্যা। আমি তখন নিউ থিয়েটার্সের মাসমাইনের শিল্পী। সুতরাং নিজের স্বাধীন মতামতের কোনোই দাম নেই। অতএব অভিনয় করতেই হোলো এবং অনিচ্ছাকৃত কাজে স্বাভাবিক ত্রুটির কারণেই এ অভিনয় আগের ছবিগুলির

উজ্জ্বল দীপ্তির কাছে যেন ম্লান হয়ে গেল। আমার বিপরীতে ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। এন-টির প্রথম ছবি 'বিদ্যাপতি'র পর এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ ছবি। ছবিটি ফ্লপ করলেও গানগুলি কিন্তু ভাল হয়েছিল। বিশেষ করে একটি গানের কথা ও মাধুর্যে মন আবিষ্ট না হয়ে পারেনি। গানটি হোলো 'প্রিয় তোমার তুলনা নাই'। ঐ গানেরই একটি চরণ ছিল 'তুমি অসীম আকাশ আমি চিরনদী' কথাগুলি প্রায়ই মনে এক বিচিত্র অনুরণন তুলত। সত্যিকারের পুরুষ যিনি তার ত আকাশের মতই উদার হওয়া চাই। আর সেই আকাশ তার নিজের রূপ দেখবে নদীর স্বচ্ছ বুকে। এইরকম নানা কল্পনায় মনটা উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত।

১৯৪০ সালের ২০শে নভেম্বর কোলকাতায় এ ছবি মুক্ত হোলো। আগেই বলেছি এ ছবি আমার কর্মজীবনে কোনো আশ্রাপ্রদ অধ্যায় রচনা করতে পারেনি বলেই মনস্তাপের কারণ ঘটেছিল। 'অভিনেত্রী'র হিন্দী ভার্সন 'হারজিৎ'।

তবে এ ক্ষতিপূরণ ঘটেছিল নিউ থিয়েটার্সের সর্বশেষ ছবি 'পরিচয়'এ। একটি নায়িকা ও তার দুই প্রণয়ীর সেই চিরন্তন ট্র্যাজিডী। একদিকে স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, অন্যদিকে প্রণয়ীর প্রত্যাশা-উদ্বেল প্রেম। এই দুইএর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয়ের রক্তাক্ত অন্তর্জ্বালার এক করুণ কাহিনী হোলো 'পরিচয়'। ঐশ্বর্যের মধ্যেও রিক্ততা, প্রাচুর্যের মধ্যেও নিঃসঙ্গতার সীমাহীন অন্ধকার। প্রতিকূল পরিবেশের নির্মম কাঠিন্যে হৃদয়াবেগের আছড়ে পড়ার কাহিনীকে জীবন্ত করে তোলার মত কঠিন কাজেও অতি সহজে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলাম শুধুমাত্র অভিনয়দক্ষতার কারণেই নয়। জটিল অন্তঃর্দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র চিরদিনই আমায় টানে। তাই এইসব চরিত্র রূপায়ণে কখনও মনে হয়নি আমি অভিনয় করছি। সবসময় এই অনুভবই হয়েছে. যেন অন্তরের সযত্নরুদ্ধ বেদনাই উপযুক্ত প্রকাশ মাধ্যম পেয়ে আপনাকে মেলে ধরেছে।

যত কঠিন চরিত্র পেতাম আমার কাজের উৎসাহও ঠিক ততখানিই বেড়ে যেত। এ ছবিতেও আমার বিপরীতে ছিলেন সায়গল। আর আমাদের দুজনের গান 'পরিচয়'এর এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে' এইসব রবীন্দ্রসঙ্গীত 'পরিচয়' ছবির পরই খুব জনপ্রিয় হয়ে

ওঠে, আর ঐ দুটি গান আমিই সর্বপ্রথম রেকর্ড করি। একই সঙ্গে 'পরিচয়'-এর হিন্দী সংস্করণ হয় 'লগন'। ১৯৪০ সালেই এ ছবির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের এপ্রিলের আগে রিলিজড হতে পারেনি। 'পরিচয়'-এর পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু, সঙ্গীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। নীতিন বসুর পরিচালনায় এই আমার প্রথম ছবি। নীতীনবাবু অভিনয়, চলাফেরার ব্যাপার আমাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন। ওঁর সমস্ত লক্ষ্যটাই ছিল ফোটোগ্রাফির দিকে। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কোন বিশেষ ভঙ্গিতে ছবি নিলে অভিনীত চরিত্রগুলির বক্তব্য সেই কম্পোজিশানের মধ্য দিয়ে প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে তাই ছিল যেন ওঁর বিশেষ অভিনিবেশের বিষয়। ক্যামেরা দিয়েই উনি চরিত্রকে কথা বলাবার প্রয়াসী ছিলেন। 'অন্যমনস্ক মুডের কোনো একটি ভঙ্গীতে মানুষ যেভাবে ধরা পড়ে কথাবার্তায় অতটা নয়। কারণ অসতর্ক মুহূর্তে নিজেদের ভাব ও ভাবনাকে সাজাবার অবকাশ থাকে না।' এটা ছিল ওঁর প্রয়োক্তি। Art is never an exhibition but revelation. এই নীতিতেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

এ ছবিতে অভিনয় করেই আমি ১৯৪১ অব্দে বি. এফ. জে. এ-র শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পাই।

১৯৪০-৪১ সালে একাধারে আমার জীবনের উজ্জ্বলতম সাফল্য ও সীমাহীন বেদনা-চিহ্নিত অধ্যায়। এই সময়েই কবীর রোডে আমার বহুদিনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া নিজস্ব বাসগৃহ সমাপ্ত হয়। তবে বাড়ি সম্বন্ধে যে রঙিন কল্পনা মনের মধ্যে ছিল তার সবটাই পুরোপুরি সফল হয়নি। আত্মীয়, বন্ধু সব্বাই বাড়ি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি খুশী হতে পারিনি। আমার মনের মত বাড়ি হোলো আমার এখনকার রিজেণ্ট গ্রোভের বাড়ি। নানান বিপত্তি সত্ত্বেও এ বাড়ি আমি ছাড়তে পারিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি জীবনের শেষ দিন অবধি যেন এই বাড়িতেই থাকতে পাই।

থাক যা বলছিলাম। কবীর রোডের বাড়ি তৈরীর অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক দিক সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি শুধু খুলে দেয়নি, জীবনের নানান ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা আমার কাজে লেগেছে।

একটি ঘটনার কথাই বলি। বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে যাঁদের ওপর নির্ভর করেছিলাম, আমার নিঃসহায় অবস্থা ও অল্পবয়সের অনভিজ্ঞতার সুযোগ

নিয়ে নাজেহাল করতে তাঁরা কেউ-ই ছাড়েননি। কর্তাব্যক্তিরাও গম্ভীর চালে নানান ফিরিস্তি দিতেন, এ কাজ করায় অসংখ্য অসুবিধার কথা সবিস্তারে জানাতেন, এবং মোটা দক্ষিণায় আমার কাজ করেও এই ভাবই প্রকাশ করতেন যে আমার প্রতি তাঁরা বিশেষ অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন।

আর মিস্ত্রীরা? এ-বেলা আসে ত ও-বেলা অনুপস্থিত। উদ্দেশ্য সাধু— দিনের সংখ্যা বাড়িয়ে মজুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা।

একদিন আমি সমস্ত কাজ বাতিল করে দিয়ে মিস্ত্রীদের দিয়ে কাজ করাবার জন্যে বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে গেল, তবু মিস্ত্রীদের দেখা নেই। নিজের ওপর সেদিন ধিক্কার এসে গেল। সেইদিনই প্রথম অনুভব করলাম, মানুষের ওপর নির্ভর করলেই নিজেকে অসহায় হয়ে পড়তে হয়। আর অসহায় মানুষকে খাতির করবার মত উদার হৃদয় পৃথিবীতে খুব বেশী নেই। তবু মানুষকে মানুষেরই ওপর নির্ভর করতে হয়। তখনই প্রশ্ন জাগল, এসব নিজে শিখে নিলে কেমন হয়? অন্ততঃ নির্ভরশীল হবার অভ্যাসটা ত কমানো যায়। তখন বসে বসে সিমেণ্টের সঙ্গে নানারকম মশলা মিশিয়ে নিজেই মোজাইকের কাজ করবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালাম। আমার একটা অভ্যাস আছে। অবসর থাকলে সবরকম কাজই বসে বসে দেখি। সব কাজেরই একটা আনন্দ আছে। দেখলে তার আস্বাদ খানিকটা পাওয়া যায়। যাই হোক মনে পড়ল ওরা যেন বলত এত ভাগ সিমেণ্ট এত ভাগ মশলা। মনের কোন কোণে কথাগুলো যেন সঞ্চিত ছিল। স্মৃতিশক্তি আমার বরাবরই প্রখর। সেটা কাজে লাগল। অমুক ভাগ এতো, অমুক ভাগ তত মনে করে করে মেশালাম। কিছুক্ষণ চেষ্টা করবার পর দেখলাম মিস্ত্রীদের চেয়ে আমার কাজ কিছু খারাপ নয় বরং কোন কোন অংশে আরো ভালই। নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করায় একটা আনন্দের আলো যেন মনের মধ্যে জ্বলে উঠল। অনুভব করলাম, শেখবার আগ্রহে যদি আন্তরিকতার অভাব না থাকে তবে মানুষের অসাধ্য কোনো কাজই নেই। খোঁজার ঐকান্তিকতা থাকলে দুয়ার খুলতে দেরি হয় না।

আর একটি কথা। সামান্য প্রাপ্তির জন্যও মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা নিশ্চয় উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও সমান সত্যি, যে কোনো মানুষকে (জীবনে সে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন), কখনও একথা বুঝতে দেওয়া উচিত নয় যে তাকে নইলে আমার চলবে না। মানুষমাত্রেরই

সবসময় এইটুকু আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত যে কোনো ব্যাপারেই সে পরমুখা-পেক্ষী নয়। এই নীতি অনুসরণ করার পর থেকে আমার জীবনের অনেক সমস্যাই সহজ হয়ে গেছে।

তবে ব্যতিক্রমও নেই কি ? আমার এক মালী চল্লিশ বছর আমার বাড়িতে কাজ করেছে। একমাত্র তার কাছেই আমি নির্বাধে স্বীকার করি যে, সে ছাড়া আমার চলবে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কবীর রোডের বাড়ির পুরো তিনতলার মোজাইকের টালি সম্পূর্ণই আমার হাতে তৈরী। ভাবতে ভাল লাগে না ?

জীবনের যে পরমলগ্নের আভাস বেশ কিছুদিন আগেই পেয়েছিলাম এই সময়েই এল তার পূর্ণতা। যৌবনের উচ্ছল আবেগের জোয়ার আমার বাইরের কাঠিন্যের বাঁধ ভেঙে অন্তরের অতলে যে মাতন তুলেছিল, তার দুর্নিবার আকর্ষণ আমিও এড়াতে পারিনি। এড়াতে চাইওনি। মন বাঁধা পড়েছিল একটি জায়গায়। এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না, সেদিন মনে হয়েছিল যৌবনের রাজটীকা ললাটে পরে ঠিক যেন রাজার মতই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন যৌবনের দেবতা। দুচোখ ভরে দেখতাম তার রূপ। দেখে দেখে যেন আশা মিটত না।

সে যেন হৃদয়ের এক নূতন জাগরণ। রবীন্দ্রনাথের দুটি গানের কলিতে প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমার এই সময়ের অনুভূতির প্রতিধ্বনি—

মনে হোলো আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে
মনে হোলো সকল দেহ
পূর্ণ হোলো গানে গানে

সে সময় মনে হোতো এই ধূলিধূসরিত বাস্তব জীবনের সকল মালিন্যকে অতিক্রম করে এমন একটা রাজ্যে পৌঁছে গেছি যেখানে অন্তহীন রঙের অফুরান উৎসব বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে, গন্ধে যেন হিল্লোলিত। সে-মুহূর্তের অন্তহীন সৌন্দর্য সা: মনকে আবিষ্ট করে তুলল। নিজেকে দেওয়ার আনন্দ, অপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা, শিহরণের নানান আবেগ মেশানো চাঞ্চল্য দেখে বিস্মিত হতাম। হৃদয় যখন ঘুমিয়ে থাকে সেখানে ভালবাসার কিরণেও তার নানা পাপড়ি চোখ বুজেও থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে

সে প্রেমের পূর্ণতা স্পর্শে জাগ্রত, সেখানে প্রতিটি ছোটো স্পন্দনেও বুকের তার নানান ব্যঞ্জনায় যেন বেজে ওঠে। এই বিস্ময়লোকে আপনাকে হারিয়ে ফেলার একটা তীব্র আনন্দ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে, বিপরীতমুখী শঙ্কার আঘাতে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মনে হোলো এ-আনন্দ বোধহয় আমার জন্য নয়। কেন মনে হোলো ?

এর জন্য দায়ী হয়ত আমার প্রথমের দিকের সংঘাতমুখর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। আগেই বলেছি ছোটোবেলা থেকে ক্রমাগত আঘাত পেয়ে সযত্নলালিত বহু সুকুমার কল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার দরুণ বা যে-কোনো কারণেই হোক পূর্বরাগের চড়ারঙের আবেশলাগানো উন্মাদনার মুহূর্তেও মনের অতলে যেন থেকে থেকে অন্তরদেবতার সবধানবাণী বেজে উঠত—পারিপার্শ্বিকের চাপে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক মানুষ ছোটো হতেও পারে, কিন্তু তার নিভৃত অন্তরের প্রেম 'বিকশিত হেম'-এর মতই পবিত্র। সেই প্রেমকে পাঁকে নামানোর অধিকার আমার নেই।

সময়ের ব্যবধানের থিতিয়ে-যাওয়া আলোতেই আজ যেন স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, প্রেমের বিকাশ যেখানে যত বেশী সূক্ষ্ম, তার সমস্যা দায়িত্ব-জ্ঞানও সেখানে তত বেশী। আর তার ছোটোবড় তৃষ্ণা না মেটার বেদনাও ততই দুঃসহ। তাই হয়ত সব-দেওয়ার কূলে দাঁড়িয়েও মনে হয়েছিল মায়া-সরসীর মতই ছুঁতে না ছুঁতে সে-প্রেম যাবে মিলিয়ে যদি তাকে সমাজে স্বীকৃতির সম্মানে প্রতিষ্ঠিত না করা যায়। সবসময় সজাগ থাকতাম—আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না। জীবনের এতবড় সম্পদ, ঈশ্বরের এতবড় দান এ যেন তামাশা হয়ে না দাঁড়ায়। সেইখান থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু। তবে কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্তেও আপন সিদ্ধান্তে ছিলাম দৃঢ়। অবেলায় হাট যদি ভাঙে ভাঙুক, কিন্তু হৃদয়ের এই স্বতোৎসারিত প্রেমের আঘাটায় ভরাডুবি হতে দেবে না। লক্ষ্যহীন গতির দৃশ্য আমায় কি জানি কেন, বড় ত্রাস্ত করে তোলে। কেমন যেন একটা অনির্ণেয় বিষাদে ভরে দেয়। জীবনের কাছে আমি যে চেয়েছি শান্তি, কল্যাণময় অজস্র কর্মের মাঝে মাঝে বিরামনিলয়।

যাই হোক, সামাজিক মর্যাদাদানে অপর পক্ষেরও আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু বহুদিনের আকাঙ্খা, রাতের স্বপ্ন-তৃষিতের সামনে জলটলমলে সরোবরের মতই যখন বাস্তবরূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়ালো, সেই পরম লগ্নটাই বা আনন্দে গৌরবে বরণ করে নিতে পারলাম কই ?

দোলায়িত দ্বিধান্বিত চিত্তে সংশয় জেগেছিল, এতবড় দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে পারব ত? সমাজ-স্বীকৃতির দলিল ছাড়া নরনারীর প্রেম মঙ্গলময় পরিণতিতে পৌঁছতে পারে না—কিন্তু যে মূল্য দিয়ে এ-স্বীকৃতি আজ সে দিতে প্রস্তুত, পরে যদি সেটা তারই কাছে নিরানন্দ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়? সে-গ্লানি তখন কেমন করে সহ্য করব?

এইরকম নানান বিপরীত চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে মনটা যত বেশী ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত, তত প্রাণপণ শক্তিতে যেন কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইতাম। নিউ থিয়েটার্সের প্রতিটি ছবি সার্থক হয়ে ওঠার কারণ বোধহয় এটাই। বেদনার পথ বেয়েই বুঝি সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাই জীবনের বড় সার্থকতার সোপান আনন্দ নয়, বেদনাই। অন্তত আমার জীবনে তাই হয়েছে।

গভীর দুঃখলগ্নে যখন চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তখন বিধাতার অস্তিত্বেও সন্দেহ জাগে। আবার যখন অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোভরা সকাল ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন ভেবে দেখলে একটি সত্যই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—নানান আঘাত ও বেদনার মাঝ দিয়েই বিধাতা জীবনকে তার আকাঙ্খিত পরিণতির মধ্যে নিয়ে যান। নানা বিরুদ্ধ উপাদানকে আত্মসাৎ করেই না হৃদয়ের মন্থনদণ্ডে ওঠে অমৃত; আমাদের দুঃখটা হয়ত দুঃখ বলে মনেই হয় না যদি তখন ধৈর্য ধরে তার ওপর বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একথাও মানি, সীমাহীন যন্ত্রণার মুহূর্তে এসব ফিলসফি শুকই মনে হয়। কারণ, মনটা তখন এসব কোনো কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। দুঃখের ফিলসফিটা মধুর লাগে দুঃখনিশার শেষেই। তবু বলব বড় ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে না গেলে জীবন কখনও কোনো বড় কিছু লাভ করতে পারে না।

কিন্তু যাক। এসব অবান্তর জীবনদর্শন ছেড়ে এবার আসি সেই প্রসঙ্গে যাকে অবলম্বন করে এই জীবনদর্শনের অবতারণা। সমাজ-স্বীকৃতির সম্মানে আমার প্রেমকে অভিষিক্ত করতে চেয়েছি এবং আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা হোলো যে, তা পেয়েছি। যা অসম্ভব, অকল্পিত, আমার জীবনের দুর্বার আকাঙ্খা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় তাও ত সম্ভব হোলো? কিন্তু এতবড় পাওয়ার আনন্দসুধা কি মুহূর্তের জন্যও অঞ্জলি ভরে পান করতে পেরেছি?

জীবনের পরম গৌরবের মুহূর্তেই উঠল অশান্তির ঝড়। সন্দেহের আঁধিতে আত্মপ্রত্যয়ও যেন কেঁপে ওঠে। তবে কি আমি ভুল করলাম?

মানুষের সত্যিকারের বড় চাওয়াকে মানুষই কত ছোটো করতে পারে, হৃদয়ের মহৎ আকুতিকে কতবড় অপমান করতে পারে, গভীর মর্যাদাবোধকে কি নির্মম উপহাসে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারে তারই রক্তরাঙা অধ্যায় ১৯৩৯ সালের জীবন।

জীবনকে শুদ্ধ, সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ-পথেও পেয়েছি কি প্রচণ্ড আঘাত। রক্তচক্ষু প্রতিবাদের ঝড় উঠল সমাজের ওপরমহল থেকে নীচেরমহল অবধি। সমাজ আমাদের মিলনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সম্ভ্রমের বরণডালা দিয়ে বরণ করেনি। গ্রহণের দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছে, কিন্তু অভ্যর্থনার মঙ্গলশঙ্খ বাজায়নি, আমাদের দুঃসাহসের সাক্ষী হয়েছে, কিন্তু উৎসবের আলো জ্বালিয়ে একে অভিনন্দিত করতে নারাজ। কি হীন সমালোচনা সকলের মুখে। কি নির্দয় লাঞ্ছনার মাঝ দিয়ে ব্যথামৌন দিনগুলি কেটেছে তা বোঝানোর ভাষা নেই। আজও মনে পড়ে বারান্দায় দাঁড়াতে সাহস করতাম না, পাছে কারো কোনো বিরূপ মন্তব্য কানে আসে। নানান কুরুচিপূর্ণ কদর্য ভাষার প্যামফ্লেট ছাপিয়ে উঁচু স্বরে হেঁকে বিক্রী হোতো আমারই বাড়ির সামনে। বাইরের আঘাত, অন্তরের দ্বন্দ্ব মিলে প্রতি মুহূর্তের সে দুর্বিসহ যন্ত্রণার জ্বালাময় অনুভূতি আজ এত বছর বাদেও ভুলতে পারিনি। নিঃসম্বল অসহায় একটি মেয়ে। কত ঝড় তুফান পেরিয়ে ছুটেছে আর ছুটেছে। পাথরের ঘায়ে পা কেটে রক্ত ঝরেছে, বাধার প্রাচীরে মাথা ঠুকেছে—তবু থামেনি। কিন্তু তার সেই বিরামহীন চলা, গ্রন্থিহীন তপস্যার এতটুকু মূল্য কেউ কোনোদিন দেয়নি। চেয়েছে তাকে ব্যর্থতার সমাধিতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। একটা মহৎ স্বপ্নকে চুরমার করে দেবার নির্লজ্জ উত্তেজনার মধ্যেই পেয়েছে নিষ্ঠুর আনন্দ।

সেদিন মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করেছিলাম সংসারের যেখানে যা-কিছু অত্যাচার বা উৎপীড়ন হয়, স্বীকার করি বা নাই করি আমরা প্রত্যেকেই তার জন্য দায়ী।

আজ যখন নানান পত্র ও পত্রিকা থেকে আমার ইণ্টারভ্যু দেবার তাগিদ আসে, অজান্তে 'করুণ হাসি' কথাটাই বারবার মনে হয়। আজ, এতদিন বাদে, জীবনের গোধূলি লগ্নে, তাঁদের দেওয়া সম্মানের জন্য আমি

নিশ্চয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেদিন যদি এর শতাংশের একাংশও পেতাম, আমার প্রতি শত ধিক্কার ও অপমানের বিরুদ্ধে যদি কোনো কাগজে ধ্বনিত হোতো, তবে সেই মৃদু আশ্বাসেই আমার জ্বালাভরা মুহূর্তগুলি কত স্নিগ্ধ, সজল—কত সহনীয় হয়ে উঠতে পারত। একাকীত্বের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সহানুভূতির বাষ্পটুকুরও যেন প্রবেশ নিষেধ ছিল।

মনে পড়ে বিবাহলগ্নের সেই বিশেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের নাম সই-করা একখানি ছবি উপহার পেয়েছিলাম কোনো এক শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে। এ-সংবাদই কেমন করে যেন পৌঁছেছিল কোলকাতায় উচুমহলের কানে। ব্যাস, আর রক্ষে আছে? এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ও অসন্তোষের কোনো সীমা-পরিসীমা রইল না। শুনেছিলাম, এখান থেকে কতবার ট্রাঙ্ক-কল করে, চিঠি লিখে, টেলিগ্রাম করে কবিকে উদ্ব্যস্ত করে তোলা হয়েছিল—কেন এ-ছবি আমায় দেওয়া হয়েছিল? অভিনেত্রীর ত কবির নাম-স্বাক্ষরিত ছবি রাখার অধিকার নেই।

মাঝে মাঝে ভাবি, এই মানুষই মানুষকে কত আনন্দ দিতে পারে, আবার এই মানুষই তাকে কত আঘাত করতে পারে! কিন্তু আনন্দের স্বর্গলোক রচনা করবার ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও নিরানন্দের মরুভূমি সৃষ্টি করার দিকেই আমাদের মনের প্রবণতা বেশী।

গুরুদেবের কাছে শুনেছিলাম 'অমৃতের চেয়ে বিষের দিকেই আমাদের মনের সহজ টান বেশী।' কিন্তু এই কঠিন বাস্তবকে মানব না। মাথা নত করব না ঈর্ষার গ্লানি, নীচতার বিদ্রোহ আর মিথ্যার দাপটের কাছে। এই ছিল আমার পণ। আমার এই স্বপ্নকে আকাশকুসুম বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন অতি আপনজন। কিন্তু শুধু আপনার জনকেই বা দুষি কেন? কত বিরাটপ্রাণ, আদর্শবান মানুষ—যাঁদের ওপর আমার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না, তাঁরাও কি অকল্পনীয়—কি হিমশীতল কাঠিন্যে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। একটি আশীর্বাদ অথবা অভিনন্দনের বাণী মুখ দিয়ে বার করতে এত কষ্ট? বিস্মিত বেদনায় বারবার শুধু এই কথাই ভেবেছিলাম। সমাজের গ্রহণ করাটা যে কতবড় শক্তি সে-কথা সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছি। তবু বলব এ আমার পরাজয় নয়। বহুদিনের অন্যায় সংস্কারের বিরুদ্ধে আমিই প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছি বলেই এ-অধিকার সম্বন্ধে সবাই সচেতন

হয়েছেন। আমিই প্রথম দরজা ভেঙেছি বলেই সেই খোলা দরজা দিয়ে সুন্দর জীবনের পথপ্রবেশ অন্য সকলের কাছে সহজ হয়েছে।

জীবন পদে পদে বাস্তবের দাবীতে দেউলে হয়ে যায় বলেই না যুগে যুগে কল্পনাকে ভার নিতে হয়েছে তাকে উর্ধ্বে তোলবার? ইতরতার ধুলোবালি থেকে মুক্ত রাখার? পাঁকের মধ্যে জন্মায় বলেই কি পদ্মের পুষ্পগৌরব? না, পাঁককে অস্বীকার করে উর্ধ্বের ডাকে সে তার আলোর দল মেলতে জানে বলেই? হৃদয়ের এইসব গভীর দরদের রাজ্য, স্বপ্নের আকাশ মানুষের বড় আদরের। ধুলোবালির রাজ্যে গরমিল সয়, কিন্তু হৃদয়-সম্বন্ধের এই উর্ধ্ব আকৃতি যে পাখা মেলতে পায় এই কল্পনার আকাশেই।

কিন্তু এমন আকুল চাওয়া বলিষ্ঠ বিদ্রোহের এই পাওয়ার জয়ই বা চিরস্থায়ী হয়ে রইল কই? অমন নি-খাদ ভালবাসার বন্ধনও যে অটুট রইল না। এর জন্য দায়ী কে? সমাজ? সংসার? না, উভয়ের বোঝা-পড়া? এর জবাব আজও পাইনি। গভীর বেদনায় এই কথাটিই সেদিন মনে হয়েছিল, প্রেমের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অঙ্গীকার, শপথ প্রভৃতি একে-বারেই না-মঞ্জুর। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাক্ষর পড়ে কালিতে। সে শুকোলেই হয় পাকা, কিন্তু প্রেমের স্বাক্ষর যে রক্তের। সে পাকা থাকে যতক্ষণ থাকে কাঁচা। শুকোলেই সে সই-এর মূল্য যায় উবে।

আজ থেকে থেকে আমার মনে একটা প্রশ্নই উদয় হয়, প্রেমের দলিলের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, মানুষ তাকে আজ অবধি ছাপিয়ে উঠতে পারল না কেন? কেন এমন কালি উদ্ভাবন করতে পারল না যা সবরকম আবেশের দলিলেই নিজের ছাপ রেখে যেতে পারে? নিরাশার দুঃসহ অন্ধকারে ঈশ্বরের সুবিচারের ওপরেও সন্দেহ জেগেছে। মনে হয়েছিল মানুষের কাছে কোনোকিছু 'নেসেসিটি' হওয়া মাত্রই সে যেন তা থেকে বঞ্চিত হয়। বিধাতা যদি থাকেনই তবে তাঁর দানের মধ্যেও এমনই একটা বিদ্রূপী ভঙ্গী আছে যেন! যে যা চাইবে তা ততক্ষণই পাবে যতক্ষন অবধি পাওয়ার কামনা দুর্বার হয়ে ওঠেনি। যেই উঠবে, অমনই আয়ত্ত যাবে ফসকে, মুঠোর মধ্যেকার জলের মতই। এমনই নানান চিন্তায় বিক্ষিপ্ত চিত্তের যন্ত্রণা যেন বেড়ে যেত। তখন মনে হোতো দিতে ত চাই, কিন্তু নেবার পাত্র কই? —সবই সয়, সয় না শুধু আত্মাবমাননা, আর নিজের সততায় সন্দেহ।

আজ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যখন জীবনের অনেক মুখরতা মৌন হয়ে আসছে, সেই শান্তলগ্নে জ্বলে উঠছে এক নূতন অনুভবের আলো। যে অধ্যায় পিছনে ফেলে এসেছি তার পাওয়া না-পাওয়া, লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশের মধ্যে গিয়ে মনকে সঙ্কুচিত নাই করলাম। এতে জীবনের একটা গভীর লগ্নের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না কি? ঠিক যে ধরনের উন্মুখতা প্রেমের স্বর্ণপীঠ, দাম্পত্য-প্রত্যাশা বুঝি তার অন্তরায়।

আজ সকৃতজ্ঞচিত্তে শুধু এই কথাই স্বীকার করব, জীবনে প্রথম প্রতিষ্ঠার সম্মান তাঁরই দেওয়া। মরীচিকালুব্ধ ভ্রান্ত হতে পারে, জল ভেবে ছায়ার পিছনে ছুটতেও পারে! কিন্তু চায় সে জলই। ছায়া নয়। কাজেই মরীচিকা ছায়া হলেও যার ভরসা ও দেয় তাকে ছায়া ভাবাটা ভুল।

ভালবাসার জন্য দুঃখবরণেও যে কত আনন্দ সে অভিজ্ঞতার স্বাদও যে তাঁরই কাছে পাওয়া। এ-ভালবাসায় আলোর চেয়ে দাহই বেশী তা মানি, হৃদয়ের অশান্ত ঢেউ ভাঙারও বিরাম নেই। কিন্তু সাগরের যদি অশান্ত কল্লোলই না রইল, তাহলে আর তাকে সাগর নামে অভিহিত করা কেন?

তাই ত দুঃখের জন্য দায়ী তাঁকে করি না। আর একটা কথা। যাদের অনুভবের জগৎ বেশী সুকুমার, তাদের সুখ বেশী, না দুঃখ? হয়ত দুঃখই বেশী। কিন্তু অপরদিকে মিলনের যে তীব্র শিহরণ, সার্থকতার যে দীপ্ত উল্লাস নানান অনুভবের স্নিগ্ধ পলাতক হিল্লোল, তার কোনো তুলনা আছে? একটু স্পর্শ একটি কটাক্ষেও ইন্দ্রধনুর বর্ণবিন্যাস ছড়িয়ে পড়ে মনে, হাসিতে জাগে বসন্তোৎসব। অশ্রুতেও তেমনি জাগে গ্রীষ্মশেষে বর্ষার স্নিগ্ধতা। সর্বোপরি, প্রতি পদক্ষেপে প্রেমাস্পদের হৃদয়মুকুরে নিজের নানা রূপসুষমায় যে উপভোগ, তার ভার হয় দুঃখের স্থূলতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। কিন্তু সুষমায়? স্নিগ্ধতায়? ফুলের বুকে জগদ্দল পাথরের চাপে দুঃখ বাজে সত্যি। দু-দণ্ডের শিশিরে তার পাপড়ি আধোমুখী হয়, এ-ও সত্য। কিন্তু এর অনুপলেও সে যে আকাশকে টেনে নেয় বুকে। এ-কাজ কি পাথরে পারে। ক্ষণিকতার জন্যে বিদ্যুৎকে অভিসম্পাত দেবে কে? ক্ষণিক বলেই না সে চোখ-ধাঁধানো?

আরও একটি সত্য আজ ধ্রুবতারার মত মনের আকাশে ফুটে উঠেছে, সেটি হচ্ছে এই যে, ভালবাসার দান মরে না। শুধু স্মৃতিতেই না, জীবনেও। তার রূপ বদল হয়, পাপড়ি ঝরে—কিন্তু পরাগ থাকে। এক আধার থেকে

আর এক আধারে বোনা হলে সে পরাগে নূতন গন্ধ জেগে ওঠে, নূতন রঙ ওঠে জলে, নূতন সুষমা ওঠে ভেসে। কিন্তু তার অন্তরতম নির্যাসের নির্বাণ নেই। এই নির্যাসই বোধহয় বিধাতার শ্রেষ্ঠ বর।

'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' হোল আমার নিউ থিয়েটার্সের দিনগুলি। কিন্তু অত সাধের নিউ থিয়েটার্সও একদিন ছাড়তে হোল। আর এ সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, আমায় ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। ছেড়েছি স্বেচ্ছায় এবং আমার স্থিরচিত্তের অবধারিত সঙ্কল্পে।

তখন অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জেগেছিল, আমি নিউ থিয়েটার্স কেন ছাড়লাম? যে এন-টি আমায় যশগৌরবের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, তার কাছ থেকে সরে আসাটা সকলের কাছেই একটা প্রচণ্ড কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার বস্তু হয়ে উঠেছিল। আর সকলের চেয়ে বড় বিস্ময় ছিল আমার নিজেরই কাছে। আজও আমার আশ্চর্য লাগে ভাবতে কি করে পেরেছিলাম অমন সাফল্যের তীর্থক্ষেত্র থেকে অত সহজে আপনাকে গুটিয়ে নিতে?

এ ঘটনার বহুদিন বাদে শ্রদ্ধেয় তুষারবাবুর সঙ্গে ঘটনাচক্রে একই ট্রেনে ভ্রমণকালে উনিও আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, কেন ছাড়লাম নিউ থিয়েটার্স?

কোন ঘটনার তিক্ততা অথবা পরিস্থিতির বাধ্যতার কারণে নয়, এর মূলে আমার প্রতি অবিবেচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীমনের তীব্র প্রতিবাদ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তারচেয়েও বড় ছিল তীব্র আত্মসম্মানবোধ, স্পর্শকাতর চিত্তের অভিমানী বেদনা। মনের দুর্জয় শক্তির বলেই ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে পেরেছিলাম।

কবীর রোডে বাড়ি তোলার কথা আগেই বলেছি। এই বাড়ির জমি কেনবার সময় নিউ থিয়েটার্সের কাছে পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছিলাম। তাছাড়া বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার কারণেই আমার এতদিনের অর্জিত অর্থের প্রায় সমস্তটাই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এই বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে। নিউ থিয়েটার্সের টাকা শোধ হয়ে গেলেও বাড়ি তোলার সময় নানা কারণে অপব্যয় এবং অপচয়ও যথেষ্ট হয়েছিল। এছাড়াও নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে আমার চুক্তিও শেষ হয়ে যায়।

কনট্রাক্ট রিনিউ করবার সময় আমি তাই কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব করলাম আমার মাস মাইনে হাজার থেকে ১৪০০৲ টাকা অন্ততঃ করা হোক যাতে এই অর্থসঙ্কট থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পেতে পারি।

আমার এ প্রার্থনা অন্যায্য অথবা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ বলে সেদিনও যেমন মনে করিনি আজও করি না। বরং আজকের বক্তব্যে আমি আরো নিঃসংশয়। তখন এত সিনেমা পত্রিকা অথবা খবরের কাগজের নিয়মিত সিনেমা বিভাগের মাধ্যমে দর্শকের অভিমতের সঙ্গে শিল্পীদের এমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন পাবলিক ফাংশনে চিত্র-জগতের নায়ক-নায়িকাদের প্রধান অথবা বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত করে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে অবহিত করবার অবকাশও ছিলো না। কোনো সভায় শিল্পী সংবর্ধনারও এমন ঘনঘটা ছিল না। এখনকার দিনের মত এতসব উর্বশী পুরস্কার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, পদ্মশ্রী-পদ্মভূষণের ঘটা কিংবা বিদেশের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি পাঠাবার প্রথাও চালু হয় নি।

তবু বাইরের জগতের বিপুল জনপ্রিয়তার খবরের ছিটেফোঁটাও কি কানে এসে পৌছত না? রেকর্ড কোম্পানীর রয়ালটি, ভক্তদেব অজস্র চিঠি আর স্টুডিওর হঠাৎ-কানে-আসা গালগল্প থেকেই জেনেছিলাম জন-প্রিয়তায় আমি কারো নীচে ছিলাম না। বরং যাকে বলে 'টপমোস্ট' সেই পোজিশনেই ছিলাম। (আমার একান্ত অনুরোধ সহৃদয় পাঠক আমার এ উক্তিকে যেন অহংকার ভেবে ভুল না বোঝেন। প্রকৃত সত্য প্রকাশের দায়িত্বেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।)

তারপর যা বলছিলাম। ওঁরা ১২০০্ টাকা অবধি উঠলেন। তবু মাত্র ২০০্ টাকা বাড়িয়ে কোম্পানীর এতদিনের শিল্পীর আবেদনের মর্যাদা রাখলেন না, সেই নিউ থিয়েটার্স যে নিউ থিয়েটার্সকে আমি একান্ত আপনার করে দেখেছি, আর আমার শিল্পীসত্তার সমস্ত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা দিয়ে যাঁদের প্রয়োজনকে শ্রেষ্ঠ করে তোলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

তবু হয়ত এঁদের সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতাম যদি না দেখতাম আমারই সমান অথবা আমার চেয়েও কম জনপ্রিয় শিল্পীকে সেই মাইনেই দেওয়া হচ্ছে যা আমাকে দিতে এঁরা কুণ্ঠিত।

তখন বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে নিউ থিয়েটার্স ছাড়া অবসর সময়ে অন্য একটি কোম্পানীর ব্যানারে একখানা মাত্র ছবিতে কাজ করবার অনুমতি চাইলাম। তাতে আমিও সাত হাজার টাকা পেতাম। কোম্পানীরও মাইনে বাড়াবার দরকার হোতো না, আমার অর্থাভাবেরও খানিকটা সুরাহা হোতো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতেও আপত্তি জানালেন।

যখন দেখলাম যে দুটি সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করা হচ্ছে তার প্রত্যেকটিই অন্যান্য শিল্পীরা পাচ্ছেন—নিজেকে অত্যন্ত হীন ও অপমানিত মনে হোল। মনে হোল আত্মমর্যাদাই যদি না থাকল তবে এ শিল্পীখ্যাতির মূল্য কতটুকু? আর এতবড় অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার করে নিজের মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দেবার সময় কি আর আছে? জীবনের প্রারম্ভে নিঃসম্বল অবস্থায় যে বিরূদ্ধতা, যে অন্যায় সহ্য করেছি তার ওপর আমার নিজের কোনো হাত ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর যখন আজ দাঁড়াবার মাটি দিয়েছেন, তখন হয়ত বা তাঁর প্রতি বিশ্বাস অথবা আমার ন্যায়নিষ্ঠতা পরীক্ষা করবার জন্যই আমায় এতবড় সমস্যার সম্মুখীন করলেন। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভেতর আশ্চর্য জোর পেলাম আর দুম্ করে রেজিগ্‌নেশন দিয়ে বসলাম এন-টির চাকরিতে। হাতী মার্কা ব্যানারের অমন নিশ্চিত আশ্রয়কে ত্যাগ করতে মনে এতটুকুও দ্বিধা জাগল না। মনের এই দৃঢ়তাই আমার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আর এই দৃঢ়চিত্ততা আজ অবধি কখনও আমায় ঠকায়নি।

এই প্রসঙ্গে বলি আমার প্রতি কোম্পানীর এই অবিচারের জন্য আমি কিন্তু ভুলেও কোনোদিন মিঃ বি. এন. সরকারকে দায়ী করিনি। কারণ এসব ব্যাপারে তাঁর কতটা সায় ছিল অথবা আদৌ সায় ছিল কিনা, কিংবা এসব কথা তাঁকে জানানো হোত কিনা সে বিষয়ে আজও আমি নিঃসন্দেহ নই। তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। আমাদের অভাব-অভিযোগের কাহিনী তাঁকে ভায়া-মিডিয়া জানানো হোত। তাই এ বিষয়ে আমি সোজাসুজিভাবে তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি। মিঃ সরকারের সহকারীরা জানিয়েছিলেন তাঁরা যা জানিয়েছেন—তাছাড়া নূতন কিছু জানবার বা জানাবার নেই। এ বিষয়ে তাঁদের কথাই চূড়ান্ত এবং তাঁদের মতামতই আমি মিঃ সরকারের মতামতরূপে মানতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'—অথবা 'রাজার' মতই মিঃ সরকারের উপস্থিতি এবং অভিমত আমাদের দেখা ও জানার অগোচরেই থাকত।

এত কথার অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই কারণে যে এত অন্যায় ও অবিচারের আঘাত পেয়েও মিঃ সরকারের ওপর শ্রদ্ধা কোনোদিন এতটুকুও শিথিল হয়নি, বরং তাঁর এই নির্বিকার নীরবতাকে একটা [illegible]

ঔদাসীন্য ভেবেই আহত হয়েছি। এন-টিতে কি আমি কমদিন কাজ করলাম? এই প্রতিষ্ঠানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, সুনাম ও প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য কৃতী শিল্পী, পরিচালক অথবা কর্মীদের সঙ্গে আমারও কি কোনোই অবদান ছিল না? আমার সর্তাবলীর কথা যে কোন কারণেই হোক, তিনি হয়ত সঠিকভাবে অবগত নন; কিন্তু আমি যে এন-টি ছেড়ে দিচ্ছি এ খবরটুকু ত জানতেন নিশ্চয়? একথা জেনেও কি আমায় তাঁর কিছু বলার অথবা আমার কাছে কিছু জানার ছিল না? তিনি বিরাট, মহৎ, কিন্তু আমি কি তাঁর এতটুকু মনযোগ পাবারও অযোগ্য? তিনি আমায় এতখানি তুচ্ছজ্ঞান করেন? মনে ঘনিয়ে উঠত অভিমানের মেঘ, চোখে জল আসত। কিন্তু এ-সবকেও ছাপিয়ে গর্জে উঠেছিল বিদ্রোহী মন, আত্মাবমাননাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, হৃদয়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে এ অবিচারের প্রতিবাদ করতে হবে, তারপর দেখা যাবে ভাগ্যে কি আছে।

নিউ থিয়েটার্সের ছোটবড় সবার সম্পর্কেই মনের মধ্যে নিজের অজানতেই একটা আত্মীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল। আমি সবার সঙ্গেই একটা সৌহার্দ্যসম্পর্ক রাখতেই চেয়েছিলাম। সবাই যে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতেন তা নয়, তবু একান্নবর্তী পরিবারের মতই সকল অসামঞ্জস্য ও তিক্ততা ছাপিয়েও কেমন একটা অনির্দেশ্য স্নেহের বাদীসুরে যেন সকলের সঙ্গে মনটা বাঁধা থাকত অনেকটা অর্কেস্ট্রার কনকর্ড ডিসকর্ডের হার্মোনাইজেশনের মতই। আজ সবার কাছেই আমার ঋণ স্বীকারের পুণ্যলগ্ন। তবু থেকে থেকে মনটা বিষণ্ন হয়ে যায় যখন ভাবি এতবড় শিল্পে বরণীয়, পূজনীয় পথিকৃৎ যাঁরা তাঁরা কেন স্টুডিও ফ্লোরকে গ্লানির পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে সাধনার পীঠক্ষেত্র করে তোলায় ব্রতী হলেন না? কেন নিষ্পাপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে নির্লজ্জ বাসনার শ্রীহীন উদ্দামতাকে বড় হয়ে উঠতে দিতেন? বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্য আর একটু বিশদ ভাবে বলা দরকার। গুরুর মত শ্রদ্ধা করতে চেয়েছি এমন কেউ নির্জনে পেয়ে নিস্পৃহ দার্শনিকের ভঙ্গীতে নারীদেহের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে চাইবেন একথা কি কোনোদিন কল্পনায় আনতে পেরেছি? এখানে প্রতিবাদ অথবা প্রত্যাখ্যান করা মানেই দুর্বাসার কোপে পড়া এবং অমোঘ নিয়তির মতই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হোল ভাল রোল থেকে চিরদিনের জন্য বাদ।

এখানেই দেখেছি কত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের অসুন্দর কামনার বিকৃত রূপ। সেটা কেমন? ধরুন কাজের ফাঁকে ভাবছি একটু জিরিয়ে নিয়ে পরের পর্বের জন্য প্রস্তুত হব। হঠাৎ ডাক পড়ল পরিচালকের ঘরে। (শুধু পরিচালকই নয়, রীতিমত নামকরা পরিচালক) 'কথা আছে, বোস', বলে গম্ভীরভাবে বসতে বললেন। তারপরই সকল গাম্ভীর্য পরিণত হোল লোলুপ কৌতূহলে—স্বামীর সঙ্গে গত রাত্রিযাপনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানতে চাওয়া। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমায় বিব্রত, বিরক্ত ও তিক্ত করে সহিষ্ণুতার শেষপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে হয়ত বা এক সময় থামত তাঁর সীমাহীন জিজ্ঞাসা। কিন্তু মুখে চোখে ফেটে পড়া সেই অভিব্যক্তি সহজে মিলতো যা চোখের সামনে চর্ব্যচোষ্য ভোজনরত কাউকে দেখলে ক্ষুধার্তের চোখেমুখে যেদৃষ্টি ফুটে ওঠে। ঘৃণ্য পিচ্ছিল এই প্রবৃত্তি যেন তার নির্লজ্জ স্থূলরূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াত। সে ভয়াবহ মুহূর্তের অসহ্যতা আজ দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয়।

আবার পুরুষমানুষকেই দেখেছি শ্রীহীন জ্বালায় শুচিবায়ুগ্রস্ত সঙ্কীর্ণমনা জটিলা-কুটিলা হয়ে উঠতে। একটু রুচিসম্মত সাজে (শিল্পীর পক্ষে সেইটেই কি স্বাভাবিক নয়?) স্টুডিওতে গেলেই চোখরাঙানীর শাসন 'এতবড় টিপ পরে আস কেন? শাড়ি ব্লাউজ আর একটু সিম্পল পরতে পার না? এত সেজে আসা স্টুডিও মালিক পছন্দ করেন না।' বলা বাহুল্য স্টুডিও মালিকের জবানীতে এটা বক্তারই মনের কথা।

আবার এঁদেরই কাউকে (তিনি হয়ত কোম্পানীর ব্যবস্থাপকদেরই অন্যতম কর্ণধার) দেখেছি তাঁরই বিশেষভাবে পছন্দ-করা কোন হিরোইনের ওপর কাণ্ডজ্ঞানহীন পক্ষপাতিত্ব দেখাতে। আমার জন্য হয়ত থাকত নিউ থিয়েটার্সে'র বরাদ্দমাফিক সজ্জা, শাড়ি, ব্লাউজ মেক-আপ। বেশীর ভাগ সময়ই আমার নিজের খরচেই ভূমিকার উপযোগী পোশাক করিয়ে নিতে হোত। কিন্তু ঐ বিশেষ নায়িকার জন্য ঐ বিশেষ কর্তাব্যক্তির আদেশে কোম্পানীর খরচেই আসত বাহারী পোশাক, নতুন ডিজাইনের শাড়ি। নির্বাক হয়ে দেখে যাওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে কিই বা করার ছিল?

অত্যন্ত বেদনা জেগেছে যখন দেখেছি আমার তখনকার খ্যাতিকে শুধু মেয়েরাই নন, পুরুষের দলও যেন প্রীতির চোখে দেখতে পারতেন না। একটা অযোগ্য, অপদার্থ মানুষ হঠাৎ যেন মাথা ছাপিয়ে বড্ড বেশী

উঠে যাচ্ছে। এ অসহ্য। এইরকমই একটা ভাব দেখেছি সবারই মধ্যে।

কোনো কোনো পরিচালকের পিঠচাপড়ানো ভাব দেখে রাগও হোতো আবার হাসিও পেত। কথায়বার্তায়, হাসিতে ইঙ্গিতে এমনই একটা ভাব-প্রকাশ করতেন যেন আমায় তিনিই তৈরী করে দিয়েছেন।

এসবের গ্লানিতে মন বিদ্রোহ করেছে, জীবনে ধিক্কার এসেছে অসংখ্যবার। কিন্তু কোন গ্লানিই চিত্তকে বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন রাখতে পারেনি। থেকে থেকে কেবল এই প্রশ্নই জেগেছে মানুষের মধ্যে কেন পশুত্বের উপাদানই বড় হয়ে ওঠে, তার মানবত্ব এমন কি দেবত্বকেও ছাপিয়ে? যে শিল্পজগৎ সাধনার তীর্থভূমি হয়ে উঠতে পারত কেন বাঁধভাঙা বাসনার নির্লজ্জ লোলুপতায় তা হয়ে ওঠে পঙ্কিল নরক!

কারো যদি উচ্চাশা থাকে, থাকে ইতরতার ধূলোবালি থেকে জীবনকে মুক্ত রাখবার স্বপ্ন, ফুলের মত এক একটি পাপড়ি মেলে ফোটবার আকাঙ্খা, কেন তাকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেবার অসুন্দর অক্লান্ত মাতামাতি যে স্থূল লালসা, ধূলি-কাঁকরের বিরোধিতাই সত্য আর মিথ্যা হোল কল্পনার আকুতি? কেন কেউ বোঝেনি হৃদয়ের এইসব গভীর দরদের রাজ্য, স্বপ্নের আকাশ ছিল আমার কত আদরের?

ধূলোবালির জগতে গরমিল, বিরুদ্ধতা সয়, কিন্তু ঊর্ধ্ব অকুতি যে পাখা মেলতে চায় কল্পনারই আকাশে? সেখানে এতটুকু বাধা হয়ে ওঠে পর্বতপ্রমাণ।

তাই চোখ বুঁজে কেবল সেই বাস্তবকেই অস্বীকার করতে চাইতাম যে বাস্তব নারীদেহকে নিয়ে শকুনের মত কাড়াকাড়ি করাটাকেই জীবনের চরম সত্য বলে জানে।

এই সঙ্গে আর একটা কথাও ভুলতে পারি না। সে যুগে অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমাদের ওপর যে পীড়ন চলত সেই দানবশক্তির কাছে আমরা অনেক সময়ই ছিলাম নিরুপায়। কিন্তু এখন ত সেই অমানিশার রাত কেটেছে। শিল্পীরা এখন ইচ্ছে করলেই শিল্পসাধনার নিষ্কলুষ জীবনকে বরণ করে চিত্রজীবন ও জগৎকে সুন্দর করে তুললে পারেন। কিন্তু আজও কেন দেখলাম না চিত্রজগতের সেই মহৎ রূপান্তর—সারাজীবন ধরে, হৃদয়ভরা সাধ নিয়ে যা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছি?

বেদনার্তচিত্তে লক্ষ্য করেছি অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা আর বাঁধনহারা

অসংযমকেই বুঝি এখনকার যুগ অগ্রগতি ও সাহসের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করে। অবাক হয়েছি দেখে সিনেমা পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় একই রাত্রে নায়কের মশারিতে সমাগতা অভিসারিণীদের সংখ্যাধিক্যের কাহিনী বর্ণনা ক'রে নায়কের আকর্ষণী শক্তির গৌরবময়তা ঘোষণা করা হয়, অথবা গৌরবের সঙ্গে জানানো হয় কোন্ নায়িকার কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন কতজন পুরুষ ?

এগুলোকে সম্ভবত যোগ্যতার সার্টিফিকেট বলেই মনে করা হয় নইলে তা ফলাও করে লেখাই বা হবে কেন, ছাপাই বা হবে কেন, আর সহস্র সহস্র বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকা এত আগ্রহভরে তা পড়বেনই বা কেন ?

এসব দেখি আর ভাবি আজ কোথায় সেই নীতিবাগিশ সমাজ, যে সমাজ তার রক্তচক্ষুর শাসনে আঘাত করেছিল আমার সেই ব্যাকুলতাকে—যে আকুলতা কলুষজীবন থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে চেয়েছে ? সমাজ কি আজ ঘুমিয়ে ? না সমাজ বলে কিছু নেই ?

এই সঙ্গে মনে পড়ে একটি জাপানী উপকথা। মানুষ থাকে আত্মমগ্ন, তুচ্ছ বিষয়ে মেতে আপনার দেবসত্তাকে বিস্মৃত হয়ে। দেবতা চান তার সঙ্গে মিলতে। প্রতি দশকল্প বছর অন্তর আসেন আর বলেন, 'মানুষ' দেবতা হবি ?' মানুষ তাকায় অসহায় দৃষ্টিতে। নিজের রচিত হাজারো বাধার কারাগারে সে যে বন্দী। দেবতার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও সরে আসে। বিষণ্ণ-কণ্ঠে বলে, 'সে কেমন ক'রে হয় ? আমার আবিল বুকে কেমন করে ফুটবে তোমার প্রসন্ন দীপ্তি ?' দেবতা রাগ করে চলে যান।

দশকল্প বছর পরে সৃষ্টির নতুন আবর্তন। দেবতা আবার আসেন। বলেন, 'মানুষ, দেবতা হবি ?' দেবতা জানেন কি উত্তর আসবে, মানুষও জানে তার সাধ্যের সীমা। তবু দেবতার আসা ও মানুষের পিছিয়ে যাওয়ার পালা সমানে চলে। আজও চলছে ?

হৃদয় চেতনার আলো স্পষ্ট করে ফুটে ওঠবার আগেই অজানতে যেন বিধাতার কাছে চেয়ে বসেছি সৌন্দর্য মাধুর্যের বরভিক্ষা। তাঁর অকৃপণ দানে আজ আমার প্রাপ্তির করপুট পূর্ণ। তবু একটা কথা বারবার মনে হয়। দেবতা তাঁর আলোর বন্যায় আমাদের স্নান করিয়ে দিতে উন্মুখ থাকলেও সদা উদ্যত রাখেন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঘাত-প্রতিঘাতের নির্মম শাসনদণ্ড। যারা যত দুরভিসারী তাদের পরীক্ষাও বুঝি ততই কঠিন।

মূল্য না দিয়ে কোনো কিছুই পাবার উপায় নেই। পাওয়ার আনন্দ তাতে অনেকখানি ম্লান হয়ে যায় বলেই কি?

এই নিবন্ধের প্রথমে যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করে আবার বলছি, আমার জীবনের চলার পথ উঁচু-নীচু, পাহাড়ের মতই এবড়ো-খেবড়ো, অসমতল ছিল। গাঁইতি দিয়ে কেটে কেটে পথ সৃষ্টি করতে করতে আমি আপন লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছি। আর তার জন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতিকেই ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি।

এর জন্য সাধ্যের অতীত মূল্য দিতে হয়েছে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভ্রূকুটিতে চমকে উঠেছি কতবার। কিন্তু থমকে দাঁড়াইনি একবারও। আজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতায় সারা মন নুইয়ে পড়ে, যিনি আমায় দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছিলেন।

মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব দেখিছি। উদারতাও দেখেনি এমন নয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশী দেখেছি সীমাহীন নীচতা, অসহ্য কপটতা আর অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বর্বর রূপ। তাইত আজ হৃদয় অনন্দে ঝলমল করে ওঠে যখন ভাবি মহৎ স্বপ্নকে আমি বাস্তবের কাছে দেউলে হতে দেইনি। কোনো ভয়ই আমাকে সত্যিকারের ভয় দেখাতে পারেনি। আর এইখানেই বোধহয় আমার জিত। কারণ এইখানেই বিধাতার দেওয়া কল্পনার জয়ধ্বজা ওড়াতে পেরেছি।

আজ মনে হয়, তখনকার সাময়িক ব্যর্থতার অসহনীয় অন্ধকার, তিক্ত অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন ছিল পরবর্তী জীবনে প্রাপ্তির গৌরবকে শাণিত করে তোলার জন্য। আরও একটা মধুর অভিজ্ঞতার প্রসাদে সারা চিত্ত যেন পুণ্যস্নান করেছে বারবার। সেটি হচ্ছে এই, অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে ওঠে, তখনই আসে আলোর দূতী। যখন অকূলপাথারে মনে হয় তরী না ডুবেই পারে না, ঠিক তখনই মেলে কূলের দিশা।

তাই ত এই বিরুদ্ধতার জন্য আমার মনে এতটুকুও ক্ষোভ নেই। বরং বাধা ছিল বলেই তাকে অতিক্রম করবার সঙ্কল্প এমন দুর্বার হয়ে উঠেছে। কত উপত্যকা, খাদ, গহ্বর অতিক্রম করে আসতে হয় বলেই না মোহানার কাছে নদীর বেগ এত প্রবল?

আজ ভাবতে ভারী মজা লাগে, এ যেন কোন অদৃশ্য দানবের সঙ্গে আমার শক্তির লড়াই। অনুভব করেছি আমাদের চারপাশেই শুধু নয়,

আমাদের ভেতরেও রয়েছে অনেক বিরোধী শক্তির ছায়াচর, যারা প্রতি মুহূর্তে চাইছে অন্তরের অটল সাধনাকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে। বাইরের চেয়ে অন্তরের এই অদৃশ্য শক্তির জোর অনেক বেশী। বাইরের বাধা যদি বা কাটানো যায়, অন্তরের দুর্বলতাকে জয় করা অনেক সময়ই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সর্বনাশের প্রান্তে দাঁড়িয়েও তার করাল গ্রাসের দৃঢ়মুষ্টি ছাড়িয়ে ছুটে আসা এবং অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবার শঙ্কা থেকে নিজেকে মুক্ত করার রোমাঞ্চের মধ্যে কুলছাপানো আনন্দের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ ঘটত কি যদি না এসব বিপত্তি থাকত?

মানুষের হৃদয়ে কল্পনার ধারা অতি ক্ষীণস্রোতে বয় বলেই না জগতে দুঃখ এত বেশী। কিন্তু কারো অন্তরাত্মা যদি প্রতি রক্তকণা দিয়ে কিছু কামনা করে, মানুষ জোর করে আর কণ্ঠরোধ করে দিতে পারে না। হতাশার চরম মুহূর্তেও হঠাৎ সামান্য ঘটনা প্রতিদিনের বাঁধধরা জীবনের ছকের মধ্যেও যেন হঠাৎই জেলে দেয় ভরসার আলো।

কেমন করে? অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটিই তুলে ধরি।

নিউ থিয়েটার্সে 'বিদ্যাপতি' ছবির কাজ করবার সময়ই স্বর্গত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে। বিস্মিত হয়ে দেখতাম, বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে না পেলেও তাঁর অনুভূতি এমন আশ্চর্য রকমের জাগ্রত যাকে বলা যায়—মানসচক্ষু অথবা তৃতীয় নেত্র। কোন্ দৃশ্যে, কোন্ সময় সাথীশিল্পীর কতটা কাছে, কোন্ দিকে যেতে হবে বা দাঁড়াতে হবে, পরিচালক একবার দেখিয়ে দিলেই তিনি এমন নির্ভুল ভাবে তা পালন করতেন যে, অনেক চক্ষুওয়ালারাও তাঁর কাছে হার মেনে যেত। গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম অন্ধ গায়ক আপন মনে পদক্ষেপ দিয়ে অথবা হাত দিয়ে চলাফেরার পরিধিটুকু মেপে নিতেন। দু-চার মুহূর্ত নীরব থেকে ভেবে নিয়ে আপন ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হতেন। তারপরই ফাইনাল 'টেকে' তাঁকে দেখতাম সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে।

শুধু কি তাই? ঘরের মধ্যে বসে আছেন, হঠাৎ বাইরে কোনো কিছু ঘটলে অথবা পরিচিত কেউ এলে কেমন করে যেন টের পেয়ে যেতেন। অমনই ত্রস্তপদে বাইরে এসে তার সঙ্গে হাসি-তামাশার মজলিশ চলত।

ওঁকে দেখতাম আর ভাবতাম জীবনের এতবড় দুর্ভাগ্যকে বহন করেও যিনি সার্থক হতে পেরেছেন, লক্ষ লক্ষ শ্রোতা ও দর্শককে আনন্দে ভরিয়ে

দিচ্ছেন, তিনি ঈশ্বরের রুদ্ররূপের অন্তরালেব বরাভয়কেও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। নইলে অন্ধের মধ্যে এত আনন্দ এত প্রাণময়তা এলো কেমন করে? আর বিধাতার সবচেয়ে বড় দান দৃষ্টিশক্তি না পেয়েও ইনি আপনাকে অসহায় মনে করেননি ত? তাহলে আমার আর নিজেকে নিঃসহায় মনে করা চলে কি? এঁর তুলনায় আমি ত অনেক সবল। মনের মধ্যে নূতন করে জোর পেতাম যেন।

'বিদ্যাপতি'তে কৃষ্ণচন্দ্র দের মুখে আমার নাম ছিল রাধে। মনে পড়ে, রঙ্গরহস্যের মেজাজে থাকলে সেঠের বাইরেও উনি আমায় ঐ নামেই ডাকতেন। আবার কোনো বিষাদস্তব্ধ মুহূর্তে হঠাৎ যদি তাঁর মুখোমুখি হতাম কেমন করে জানি না আমার মনটা যেন তিনি দেখতে পেতেন বাইরের প্রত্যক্ষ দৃশ্যবস্তুর মতই। বলতেন 'রাধে, হৃদয়-বৃন্দাবন আঁধার রাখলে তিনি এসে বসবেন কোথায়?'

কখনও বলতেন, 'যে কঠিন তপস্যায় তুমি রত তাতে বাধা ত আসবেই। তুমি যে শ্রীরাধা। অশ্রুপাথার পার না হলে কি শ্যামের কাছে পৌঁছানো যায়? তুমি ত এত বেদ-পুরাণের গল্প পড়, তপস্বীদের ধ্যান ভাঙাবার জন্য শোনোনি কি দেবতাদের ছলাকলার খবর? ধ্রুবর পরীক্ষা?—সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতের মতই তাঁর সাধককণ্ঠে অনুরণিত হোতো—'হে ধনী কর অবধান'—

ঐ কথাগুলির মধ্যেই যেন কোন অন্তরালের দেবতার আশ্বাসবাণী শুনতে পেতাম। তখনই মনে হোতো ব্যথামন্থনের মাঝে যে গরল ওঠে বোধহয় কেবল তাই পান করেই মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। বাকী সবই ভাববিলাসীতা। এই বেদনামন্থনের সময় নিরাশা আসে। আসে ক্ষোভও। কিন্তু সে আবিলতা কেটে যেতে না যেতেই আভাষ পাই যে বাইরে থেকে যা দেখতে অভিশাপের মতন, তা হয়ত বরদানেরই রূপান্তর। আর এই বরদানকে চেনা সম্ভব একমাত্র বরদাতার দেওয়া দিব্যদৃষ্টির প্রসাদেই।

কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখলেই চলবে না। জীবনের হাজারো পরীক্ষা, অবিশ্বাসের বাধা ও সন্দেহের আঁধি থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে তার অটল সত্যতায়। ভুলে গেলে চলবে না মানুষ মূলত ধ্যানজগতের জীব, মাংসপেশীর জগতের নয়। যদিও শেষের প্রলোভনই মনকে সহজে টানে—আর তার চেয়েও সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।

তাই ত আজ আমার সারা চেতনা জুড়ে একটা সোনালী প্রত্যয় যেন উঁকি দিয়ে বলে যে, এসব অসঙ্গতি, স্বতোবিরোধ, এতসব গ্লানি আর দুর্বোধ্য থাকবে না যদি অন্তরে সেই আলো একবার নামে। তার একটি স্ফুলিঙ্গ দিয়ে শিল্পী জ্বালায় শিল্পের বাতি, জ্ঞানী জ্বালায় জ্ঞানের দীপ, প্রেমিক প্রেমের তারা। কেবল করতে হবে তারজন্য দুশ্চর তপস্যা। নৈলে সে আলো তার রাঙা পা রাখবে কোথায়? আজকালকার ক্ষুদ্র, বামন, শ্রীহীন মরচেতনার পক্ষপুটে? ছিঃ!

আগে হৃদয়কে হতে হবে শুভ্র সহস্রদল যার পাপড়িতে চাঁদের হাসি, মৃণালে প্রত্যয়ের আগুন, পরিমলে নীলিমার পুণ্য গন্ধ। সবচেয়ে দুঃখ বাজে দেখে গড়পড়তা সাধারণ জীবনের স্বস্তি নিয়ে অধিকাংশ মানুষই সুখে থাকে। কিন্তু যে আলোর কণিকাপ্রসাদে বেঁচে সুখ, ভাবাবেসে আনন্দ, কর্মে তৃপ্তি, তার পূর্ণ দানকে এড়িয়ে চলার জন্য আমরা হয়ে উঠি পাগল। যেন ক্ষুদ্র জানার এতটুকু পরিধির বাইরে আর কিছুই নেই। যেন ঐ বদ্ধচেতনার চতুঃসীমার বাইরের মুক্তরূপ মিথ্যা। তাই বলছিলাম, জীবনকে নির্ভয়ে দেখতে শিখলে তবেই সত্যের দর্শন মেলে। নৈলে নয়।

নিউ থিয়েটার্সের অধ্যায়ে আসবার আগে ম্যাডান কোম্পানী ও রাধা ফিল্মসের ফেলে আসা সেই দিনগুলির দিকে তাকালে দেখি নির্বাক চিত্রের যুগে 'জয়দেব' ছবিতে সেই কুড়ি টাকা লিখে পাঁচ টাকা পাওয়া। তারপর ষাট টাকা, আশী টাকা ইত্যাদি করে ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে একশ-দশ টাকায় যখন দাঁড়ালো সেই টাকাটাই তখন অনেক মনে হয়েছিলো। অনেক অনেক শখ আহ্লাদ, আগে যা স্বপ্ন বলে মনে হতো, এখন তা অনায়াসে নিজের উপার্জ্জনেই মেটাতে পারছি, এ চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা যেন অজানা পথের অন্ধকারে আলোর মতো জ্বলে উঠে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যুগিয়ে-ছিলো। এই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার স্বাদ ও বৈচিত্র্য উপভোগ করবার মতই।

নির্বাক যুগে 'জয়দেবে'র পর 'শঙ্করাচার্য্য' ছবিতে অভিনয় করবার পর বেশ কিছুদিন কাজে ছেদ পড়ল। তারপরই এল টকির যুগ। 'জোর বরাত' আর 'ঋষির প্রেমে' হিরোইনের রোলের পরই 'প্রহ্লাদ' ছবিতে একেবারে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করতে যা মজা লেগেছিলো। নায়িকা থেকে

একেবারে পুরুষের ভূমিকাই শুধু নয়, ঝগড়া বাধানো আর কথায় কথায় গান গেয়ে ওঠা পুরুষ। ঐ একই ধরণের অভিনয় করতে হলো 'কংসবধে'ও। 'বিষ্ণুমায়াতে'ও একধারে নারায়ণ ও কৃষ্ণ। মেকআপ নিতে নিতে আপনমনেই হাসতাম আর ভাবতাম—একেবারে পুরুষের ভূমিকাতেই বাঁধা হয়ে গেলাম নাকি? জ্যোতিষবাবুকে একদিন ঐ প্রশ্ন করতে উনি বললেন, 'সংগীত প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবার মত আর কে আছে বল না? তাছাড়া নারায়ণ, কৃষ্ণের সেই পদ্মপলাশ চোখ আর কিশোর রূপ? পুরুষ-মেয়ে কারো আছে কি?'

'আমি তাহলে পুরুষ মেয়ে, দুজনদের মধ্যেই ফার্স্ট ত?' আহ্লাদে আটাত্তরখানা হয়ে জিজ্ঞেস করতাম।

'তাই যেন চিরদিন থাকতে পার, আর তখন আমার কথাটা মনে কোরো'—আদর করে পিঠ চাপড়ে জ্যোতিষবাবু বলেছিলেন।

চিত্রজীবনের পরের জীবনের নানান কর্মক্ষেত্রে সত্যিকারই পুরুষের করণীয় অনেক কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আজও কেন জানি না জ্যোতিষবাবুর সেই স্নেহভেজা কথাগুলি মনে পড়ে যায়।

যাই হোক, পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করা থেকে ছুটি মিলল রাধা ফিল্মসে যোগদানের পর। এখানে মাইনেও হোলো তিনশো-পঞ্চাশ টাকা, তখনকার দিনে এ অংকটা তুচ্ছ করার মত ছিলো না।

নিউ থিয়েটার্সের কাজ শেষ হওয়ার পর অন্য কোম্পানীতে কাজ করবার সময়ও কেন জানি না মনটা বার বার যেন পিছু ফিরে ঐ যুগটির দিকেই সজল নয়নে তাকিয়ে থাকত। অনেক আনন্দ, বেদনা, স্বপ্ন মাখানো একটা গোটা জীবন ওখানে ফেলে এসেছিলাম বলেই কি? ওখানে অনেক ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু কাজের সেই আনন্দ? সে কি ভোলার? কর্ম জীবনে আলোমাখা দিনের শুরু যে ওখান থেকেই।

যে সব গানের জন্য সারা ভারতে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো সে সব গানও ত ঐ নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারেরই।

গানের কথা মনে হলেই ওস্তাদ আলারাক্কা ছাড়া আরও তিনটি মানুষের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। রাইবাবু, পঙ্কজবাবু ও ভীষ্মবাবু (ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়)।

অনেকবারই মনে হয়েছে নিউ থিয়েটার্সের গানগুলি কেন সে যুগে

এমন আলোড়ন তুলেছিল? আমার গাওয়া? ওদের শিক্ষা? না, সুররচনা?

বিদ্যাপতি, সাথী, অভিনেত্রী, সাপুড়ে, (সাপুড়ের অধিকাংশ গান কাজী সাহেবের হলেও রাইবাবুর সুরও ছিল) পরিচয়, পরাজয় এমনই কত সব ছবিতে ওঁর গান সুপারহিট করেছে। অথচ কোন গানের সুরেই একঘেঁয়েমো বা অন্যের সঙ্গে মিল নেই। প্রতিটি গানেরই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। এ সুর বাজারে চলবে কিনা কিংবা এর কমার্শিয়াল ভ্যালু আছে কিনা এসব নিয়ে কোনোদিন ওঁকে মাথা ঘামাতে দেখিনি। কেমন করে গানের সুরটি সুন্দর হবে তারই জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

রাইবাবুর ইস্টার্ণ ওয়েস্টার্ণ দুটি সংগীতধারার সম্বন্ধেই প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিলো। আমার ধারণা ঠিক সেই কারণেই উনি যখনই কোনো সুর রচনা করেছেন—ওঁর মৌলিক চিন্তার সঙ্গে এই সংগীতিক অভিজ্ঞতা অজান্তে মিশে সেই সুরে এমন এক মাধুর্য্য সঞ্চারিত হয়েছে যা সকল শ্রেণীর মানুষকেই appeal করত।

মুন্সী বলে একজন সারেংগী বাজাতেন। তার পুরো নামটি মনে পড়ছে না। রাইবাবুর কণ্ঠে কোনো সুরের গুঞ্জন শুনলেই মুন্সীজী সেই রাগের ভিত্তিতে কতরকম permutation, combination দেখাতেন আবার মুন্সীজীর অনেক সাজেশনও ওকে inspire করত। দুজনের আণ্ডারস্টাণ্ডিং বড় সুন্দর ছিলো। মুন্সীর কোনো একটি পর্দা সুরে লাগলেই রাইবাবু 'আহা' করে উঠতেন। আবার রাইবাবুর কোনো সুর পছন্দ হলে মুন্সীজী 'কেয়াবাত' বলে তারিফ করতেন। এতে করে সত্যিকারের একটা গানের আসরের পরিবেশ গড়ে উঠত। আর এখন?

গানের 'টেক' হোলো বোম্বেতে। তারপর সেই রেডিমেড প্রডাক্ট এনে ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডে জুড়ে দেওয়া হোলো। সবই ডিপার্টমেণ্টাল ব্যাপার। সবই যেন অতিমাত্রায় সরলীকৃত হয়ে গেছে আর সেই সঙ্গে যান্ত্রিকও। কাজের সে আনন্দ কোথায়? তাই বলছিলাম শুধু বক্স-অফিসের কথা ভেবেই আমরা কেউ কাজ করতাম না। কাজের আনন্দেই কাজ করতাম। কাজকে আমরা ভালবাসতাম। কাজের প্রতি এ ভালবাসা আজকের দিনের শিল্পীদের আছে কি?

অনেকেই আমার কাছে রাইবাবু, পঙ্কজবাবু, উভয়ের শিক্ষাপদ্ধতির

কথা জানতে চেয়েছেন। এরকম তুলনামূলকভাবে কোনোদিন চিন্তা করিনি। দুজনেই গুণী, শিল্পী, কথার ওপর দুজনেই সমান জোর দিতেন।

আগেই বলেছি পঙ্কজবাবুর সমস্ত জিনিসটাই খুব গোছানো ছিলো। শিল্পী ও সুশিক্ষকের এমন সমন্বয় দেখা যায় না। কোন শিক্ষার্থীকে কিভাবে তালিম দেবেন সে সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। আমার খোলা গলা। ওপরের দিকে থ্রিল শোনাতে পারে সেজন্য তারসপ্তকের পর্দায় কি করে গলার জোরটা একটু কমাতে হবে, আবার মধ্যসপ্তকে কোথায় জোর দিতে হবে এসব মডুলেশন উনিই শিখিয়েছেন। কোন্ গানের ফিলিং বা সেন্টিমেণ্ট কোন কথা বা পর্দায় জোর দিলে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে সে শিক্ষাও ওঁরই কাছে।

এঁদের সবার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের শিক্ষা পেয়েছিলাম ভীষ্মবাবুর কাছে, নিউ থিয়েটার্সে আসবার অনেক আগে। সেই ম্যাডান কোম্পানীর যুগেই। মেগাফোনে রেকর্ডের যুগে.জে. এন. ঘোষের ইচ্ছেয় ভীষ্মবাবুর কাছে নাড়া বেঁধেছিলাম। শান্ত, আত্মভোলা মানুষটি সবসময় অন্যমনস্ক। সবার মাঝে থেকেও যেন চারপাশের জগত থেকে স্বতন্ত্র এক জগতে বাস করতেন। নিস্পৃহ, নীরব। কোনোসময় আপনমনে গুনগুন করে গান গাইতেন। কোনো সময় একেবারে চুপচাপ। বিশ্বসংসারে গান ছাড়া আর কিছুই যেন চেনেন না। ওঁর এই ভাবুক ভাবটি ভারী ভালো লাগত। এমন হয়েছে কোনোদিন হয়ত আমাকে ওঁর গান শেখাবার কথা। নানারকম রাগের পথ ধরে কিছুটা এগোন। আবার থেমে যান। কোনোটাই যেন ঠিক মেজাজে লাগলো না। সারেংগী বাদককে 'ছোড় দিজিয়ে' বলে উঠে পড়লেন। আবার কোনোদিন হয়ত শেখার কথা নেই। হার্মোনিয়ম বাজাতে বাজাতে কোনো স্বর মনে লেগে গেলো। সেদিন আর ছাড়ান নেই। নানান তানের কারুকার্য যেন ফুলঝুরীর মত সবেগে বেরিয়ে আসত তাঁর ঐ আবেশঢালা মধুর কণ্ঠ থেকে। আর উনি গাইতে গাইতে হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত ভাবে তাড়া দিতেন, 'কই গান? থামছেন কেন?'—আমি কি ওঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারি? কিন্তু সে কথা শোনে কে? আপনহারা আবেগে গেয়ে এবং গাইয়ে যাবেন। সময়ের জ্ঞান থাকত না। হয়ত আমার সিনেমার টিকিট কাটা আছে। ওঠবার জন্য ছটফট্ করছি, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছি না। ঠিক ভয়ের জন্য নয়।

কোনো শিল্পী যখন কিছু সৃষ্টি করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন—ঠিক সেই মুহূর্তেই বাস্তব তাগাদার রূঢ়তায় ঐ তন্ময়তা ভাঙ্গানোটা ত মানুষকে হত্যা করারই সামিল। তাই অপেক্ষা করতাম।

ভীষ্মবাবুর ট্রেনিং-এ অনেক রেকর্ডও করেছি। রাগপ্রধান গানে দৃঢ়নিবদ্ধ নিয়মকানুন থেকে শিল্পীর নিজেকে মুক্ত রাখবার প্রচুর অবকাশ আছে। তবু উনি শুদ্ধ রাগ এবং তার চেয়েও বড় কথা রাগের ভাবের ভেতর লীন হয়ে যেতেন বলেই রাগের আত্মাটি তার গানে শরীরী হয়ে উঠত। ওঁর কাছে 'তব লাগি ব্যথা', 'নবারুণ রাগে' মূলতানের ওপর একটি গান শিখতে শিখতে এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে।

ঠিক শিক্ষার্থী যেমনভাবে শেখানো হয়ে থাকে সেভাবে উনি শিক্ষা দিতেন না। ওঁর তান, বিস্তার, সূক্ষ্ম কাজ একবার শুনেই আমি হুবহু তুলে নেব এইটিই যেন আশা করতেন। শুনে খুশী হলেন কি হলেন না, ওঁর নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত ভাব থেকে সেকথা বোঝবার উপায় ছিলো না। কেবল কোনো তান শুনে বিশেষ একধরণের নীরবতা ও মুহূর্তকালের জন্যে চোখবোঁজা দেখে বুঝতে পারতাম কখন আমার গাওয়া গান ওস্তাদের মনের মত হয়েছে। এটাও বুঝতে পারতাম বেশ কিছুদিন ওঁর কাছে শিক্ষা নেবার পর।

এই প্রসঙ্গেই আবার বলি অতবড় সাধক ও ওস্তাদের শেখানো উচ্চাঙ্গের গানও যে অল্প আয়াসেই তুলে নিতে পারতাম এর মূলেও মনের অজান্তেই কাজ করেছে ওস্তাদ আলারাক্কার শিক্ষাপদ্ধতিতে আমার স্বল্পকালের সাধনা। তখনও বারবার মনে হোতো বিদায় বেলায় তাঁর সেই খেদোক্তি 'আজ যশ ও অর্থের মোহে তুমি কতবড় জিনিস হারালে সেকথা একদিন বুঝবে'। ও কথাটা কানে বাজলেই যেন ভয়ে শিউরে উঠতাম আর নানান কাজের মধ্যে সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ভয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করতাম।

নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার কিছুদিন বাদেই এল ভাগ্যের এক অভাবনীয় মোড় ঘোরার অধ্যায়।

কাজকর্ম নেই। মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। বাড়িতে বসে থাকলে বিষণ্ণতা আরো পেয়ে বসবে। তাই এই বিষাদের মেঘ উড়িয়ে দেবার জন্যই কি করব ভেবে না পেয়ে একদিন মেট্রোর একটা ম্যাটিনী শোতে ছবি দেখতে গেলাম। তখন কি জানতাম মেঘের আড়ালে সূর্য হাসছে?

ইণ্টারভ্যালে লবিতে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রমথেশ বড়ুয়া। কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি করছ ?'

জানালাম নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার পর থেকে কিছুই প্রায় করছি না। তাছাড়া বাড়ি করতে গিয়ে যে প্রচণ্ড অর্থ-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি সেকথাও তাঁকে জানালাম। মিঃ বড়ুয়া হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজকর্ম করবার ইচ্ছে আছে, না খেয়ে ঘুমিয়ে গড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও ?'

'কাজকর্ম করবার ইচ্ছে নেই ? বলেন কি মিঃ বড়ুয়া ? শিল্পীর জীবনে কাজ না থাকা মানেই ত মৃত্যু। আপনি কি আমায় এরই মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে বলছেন ?'

'আমি বলছি না। তুমি চাইছ কিনা জানা দরকার ছিল। যাক কাল সকালে বাড়ি আছো ত ? আমি যাচ্ছি। একটা কাজের কথাই আলোচনা করব।'

পরদিন যথাসময়ে মিঃ বড়ুয়া এলেন সঙ্গে এম-পি প্রোডাকসনের মালিক মুরলীধর চ্যাটার্জিকে নিয়ে। ওঁদের কাছেই জানা গেল মুরলীবাবু কয়েকটা ব্যবসায়ে বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাণিজ্যের কোঠায় প্রায় চাবীতালা বন্ধ করতে চলেছেন, আর ভাবছেন অতঃপর কি করা যায় ? উপস্থিত মিঃ বড়ুয়ার সহায়তায় একটি ছবি করবার ইচ্ছে তাঁর প্রবল। কিন্তু মন সংশয়-মুক্ত নয়। যদি এবারেও ব্যর্থ হন তাহলে যে কি হবে ভাবা যায় না। একমাত্র ভরসা বাংলা চিত্রজগতের ভগবানস্বরূপ মিঃ বড়ুয়ার আশ্বাস। ছবিতে দুজন হিরোইন। তারই একজনের ভূমিকা আমি গ্রহণ করতে রাজী কিনা। যদি রাজী হই আমার চাহিদা যথাসম্ভব পূর্ণ করতে উনি চেষ্টা করবেন। তবে তাঁর তৎকালীন আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে একটু যদি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ভাবাভাবির আর ধৈর্য নেই। কয়েক মাস কাজ না করে হাঁপিয়ে উঠেছি। তাছাড়া অর্থের প্রয়োজন ত ছিলই। চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলাম। 'শেষ উত্তর' ও তার হিন্দী ভার্সন 'জবাব'-এর দক্ষিণাস্বরূপে মুরলীবাবু আমায় সঙ্গে সঙ্গেই পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন। অর্থ সমস্তার অনেকখানিই সমাধান হল। এ দুটি ছবি শেষ হবার পরে নূতন

চুক্তি অনুসারেও মোটা টাকার মাসমাইনে ও পার্সেণ্টেজ পাবার কথাও পাকাপাকি হয়ে গেল।

বহুদিন বাদে স্টুডিও ফ্লোরে গিয়ে মনটা আনন্দে ঝলমল করে উঠল। এ যেন একটা বহুমূল্য রত্ন হারিয়ে আবার খুঁজে পাওয়া। কাজের উদ্দীপনাও শত গুণ বেড়ে গেল। সেই 'মুক্তি'র পর আবার এই ছবিতে মিঃ বড়ুয়ার পরিচালনায় এবং তাঁরই বিপরীতে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া গেল।

এ ছবিতে কাজ করবার সময়েই মিঃ বড়ুয়াকে যেন নতুন করে চিনলাম। বয়স ও অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির অনেক বন্ধ দুয়ার খুলে যাবার দরুণই যেন মিঃ বড়ুয়ার মত অমন দুর্লভ প্রতিভাবানের নতুন করে মূল্যায়ণ করা সম্ভব হোলো। আগেই বলেছি 'শেষ উত্তর'-এর নায়িকা দুজন। একজন ধনীকন্যা, উগ্র আধুনিকা, তথাকথিত অভিজাত মহলের আলোকপ্রাপ্তা। অপরজন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নম্র, শান্ত, ঘরোয়া মেয়ে। একজন নায়কের বাগদত্তা, অপর-জন প্রণয়িণী। নায়কের হৃদয়ের আকর্ষণ দ্বিতীয়ার প্রতিই। তবু তিনি প্রথমাকেই বিবাহ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। কারণ তাঁর কাছে হৃদয়ের দাবীর চেয়ে অনেক বড় ছিল স্বর্গত পিতার দেওয়া কথার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন, সজাগ কর্তব্যবোধ।

কর্তব্য ও হৃদয়ের গোপন চাওয়ার দ্বন্দ্বে চঞ্চল নায়ক—আর তারই দোলায় দোলায়িত দুই নায়িকার হৃদয়যন্ত্রণার কাহিনী ছিল 'শেষ উত্তর'।

প্রথম নায়িকা ছিলেন যমুনা, দ্বিতীয়া আমি।

বড়ুয়া বরাবরই অদ্বিতীয়। কিন্তু এখন দেখলাম আত্মবিশ্বাস তাঁর আরো বলিষ্ঠতর, আরো গভীর তাঁর দৃষ্টি আর সংযত সংক্ষেপ তাঁর নির্দেশনা। কিন্তু আচার-ব্যবহার, কথাবার্তায় আগের সেই গম্ভীর কাঠিন্যের আবরণ যেন কিছু শিথিল যার জন্য আগের চেয়ে তাঁকে অনেক সহজ, অনেক কাছের মানুষ মনে হত।

একটা শটে ছিল মীনাকে (আমার ভূমিকা) মনোজ (মিঃ বড়ুয়া) বলছে, 'আমার এলাহাবাদ যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই থাকব।' উত্তরে মীনা বলবে, 'ইচ্ছে-অনিচ্ছে সবই কি আপনার একার? আমি যদি বলি আমি আপনাকে থাকতে দেব না?' মনোজ তখন ভুল বুঝে

অভিমানভরে নায়িকার কাছে গচ্ছিত-রাখা ব্যাগটা ফেরত চাইবে। কারণ চলে যাবার জন্য সে তখন মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। মীনার প্রশ্ন, 'আপনি সত্যিই আপনার ব্যাগটা ফেরত চাইছেন?' অন্যমনস্ক নায়ক দৃঢ়স্বরে বলে, 'আমি সত্যিই আমার ব্যাগটা ফেরত চাইছি।' অতঃপর নায়িকার নীরবে ব্যাগ এনে দেওয়া।

শটের আগে মিঃ বড়ুয়া বললেন, 'ব্যাপারটা বুঝলে ত? নায়ক অভিমান করেই ব্যাগটা ফেরত চায়। কিন্তু নায়িকার পাল্টা অভিমান তার অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যই সে বোঝেনি। তাই অত জোরের সঙ্গে ব্যাগটা চাইল। সাধারণ মেয়ে হলে ঐ দৃঢ়তাকে ভুল বুঝে নিজেকে অপমানিত মনে করত এবং চড়া স্বরে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু মীনা শুধু প্রচণ্ড অভিমানিনীই নয়, সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং প্রকাশকুণ্ঠ। তাই এখানে তার অভিব্যক্তি নীরব। অতএব Let the silence speak here।'

একটা শটেই ফাইনাল টেক হয়ে গেল। সকলে চলে যেতে এই প্রথম কেন জানি না মিঃ বড়ুয়াকে প্রশ্ন করলাম, 'মিঃ বড়ুয়া, আপনাকে খুশী করতে পেরেছি কি?'

'তা পেরেছ? কিন্তু তুমি খুশী ত? না, এখনও মনের মধ্যে কোন অভিযোগ অসন্তোষ আছে?'

চলে যাচ্ছিলাম। ওঁর প্রশ্নের ধাক্কায় যেন চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি সেই অন্তর্ভেদী দুটি চোখের গভীর দৃষ্টি সোজাসুজি আমার ওপর ন্যস্ত। কিন্তু ঠোঁটের কোণে যেন মৃদু হাসি স্থির হয়ে আছে।

'একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন মিঃ বড়ুয়া?' আমার প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে মৃদু হাসি সারা মুখে যেন আলোর মত ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বিনাভূমিকায় তাঁর সহজাত অনাড়ম্বর ভঙ্গীতেই বললেন, 'তোমার মনেই কি আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিল না যে, আমি ইচ্ছে করে তোমায় ডিটেলস-এ কোন চরিত্র বুঝিয়ে দিই না? আর এর কারণ'...তারপর আমার লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে যেন হঠাৎ থেমে গিয়েই বললেন, 'যাক কারণটা আর নাই বললাম।'

'কিন্তু একথা আপনি জানলেন কেমন করে? আমি ত কারো সঙ্গেই এ বিষয়ে কোন আলোচনা করিনি!' (কোরতাম কেমন করে? 'বড়ুয়া

সাহেবের' পরিচালনার বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করবার সাহস ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কার ছিল? আমি ত সামান্য হিরোইন।)

'কানন, জীবনে একটা সময় আসবে যখন বুঝবে তোমার সম্বন্ধে অন্যের ইম্প্রেশন জানবার জন্য কোন আলোচনা করবার অথবা শোনবার দরকার করবে না। মানুষের একটা ভঙ্গীতেই এমন অনেক কথা বোঝা যায়, হাজারটা কথায় যা যায় না?'

আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। স্বল্পভাষী মানুষটি এতগুলি কথা বলেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমি একটু দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে আসছিলাম। উনি আবার ডাকলেন, 'যেও না, শোন।' তারপর সেই অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি আবার স্থির হয়ে গেল আমার মুখের ওপর। বললেন, 'যাকে যতটুকু বলার দরকার তাকে আমি ঠিক ততটুকুই বলে থাকি। তারচেয়ে বেশীও বলি না, কমও না। তোমাকে কোন ভূমিকা বুঝিয়ে দেবার সময় আমি কোনদিন বেশী কথা বলিনি, কারণ আমি জানতাম তোমার মত আর্টিস্টকে বেশী বলার দরকার নেই। বুঝেছ?'

এবার আর আস্তে নয়, একেবারে ছুটটে পালিয়ে এলাম ওঁর সামনে থেকে। প্রমথেশ বড়ুয়ার মত সংযত চাপা মানুষের সামনে অবাধ্য আবেগের অশ্রুবর্ষণ করা? ছিঃ!

নিজেকে সেদিন বড় সম্মানিত মনে হয়েছিল। যে সে লোক নয়। বাংলা চিত্রজগতের প্রায় ভাগ্যবিধাতার মতো ব্যক্তি প্রমথেশ বড়ুয়ার এত বড় কমপ্লিমেণ্ট আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে? একি স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ নয়? চোখের জল মুছে তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। কিন্তু তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম বলে সেদিনও যেমন লজ্জিত ছিলাম না, আজও লজ্জিত নই। কেন? সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আজ এতটুকু অন্তত বুঝেছি যে, আমরা জোর গলায় বিশ্বাসের মহিমা প্রচার করলেও জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের মহিমাও কিছু কম নয়। সত্য সম্বন্ধে আলো পাবার পক্ষে অবিশ্বাস একটা মস্ত সোপান। তবে এই আলো পাবার ইচ্ছেটাই আন্তরিক হওয়া চাই। সেখানে কোন খাদ থাকলে চলবে না।

যাক যা বলছিলাম। 'শেষ উত্তর' সব দিক থেকে সৌভাগ্যেরই ইঙ্গিতবাহী হয়েছিল। তবে সকল সৌভাগ্যকে ছাপিয়ে উঠেছিল মিঃ বড়ুয়ার যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ।

আর একটি কথা আগে মনে হয়েছিল যা এ কাহিনীর একটি অধ্যায়ে আমি বলেছি, ক্যামেরার ফোকাশের বেশীর ভাগটাই মিঃ বড়ুয়া রাখতেন নিজের দিকে হয়ত নিজেকেই বেশী প্রাধান্য দেবার জন্য। ইদানীং আমাকেও ছবি তোলার নেশায় পেয়েছিল। দু-তিনটি তখনকার দিনের বেস্ট মডেলের ক্যামেরাও কিনেছিলাম। ছবি তোলার প্রতিযোগিতায় বেনামীতে ছবি পাঠিয়ে প্রাইজও পেয়েছি। ক্যামেরা সম্বন্ধে একটু জ্ঞান হওয়ার দরুনই বোধ হয় বুঝেছিলাম আগের ধারণা কত ভ্রান্ত। কেন? মিঃ বড়ুয়া ছিলেন ছোট্টখাট্ট এতটুকু মানুষ। উনি যখন হাফপ্যাণ্ট আর স্পোর্টিং গেঞ্জী পরে স্টুডিও লনে ব্যাডমিণ্টন খেলতেন দূর থেকে দেখে মনে হতো যেন 'স্কুলবয়'। সেই মানুষটাই যমুনা, কমলেশকুমারী, চন্দ্রা, এদের মত দীর্ঘাঙ্গী (চলতি বাংলায় যাকে বলে লম্বা) মেয়েদের বিপরীতে হিরোর পার্ট করেছেন। কিন্তু এতটুকু বেমানান ত লাগেই নি, উপরন্তু ব্যক্তিত্বে, অভিব্যক্তির অনন্যতায় এবং স্বাভাবিকতায় তিনি সে যুগের সকলকেই ছাপিয়ে উঠেছিলেন। (এ যুগেই বা তাঁর ধারে-কাছে দাঁড়াবার মত কজন আছে? 'দেবদাস' আর কাউকে ভাবা যায়?)

না, কথার খেই হারাইনি। আমি বলছিলাম মিঃ বড়ুয়ার ঐ উদাসী বিষণ্ণতা, ঐ অভিনব এক্সপ্রেশনের অনেকখানিই পর্দার বুকে যথাযথভাবে ফুটে উঠতে পারত না যদি না ক্যামেরার সংস্থাপন খুব কাছাকাছি না হতো। কারণ ছোট জিনিস দূর থেকে এত ছোট দেখায় যে, তার অস্তিত্বই অনেক সময় না-মঞ্জুর হয়ে যায়। বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির প্রথম শ্রেণীর ক্যামেরাম্যান প্রমথেশ বড়ুয়া এ সত্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলেই ক্যামেরা সন্নিবেশ সম্বন্ধে তাঁর এত সাবধানতা। ছবির সামগ্রিক সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রাখতেন বলেই হিরো বড়ুয়ার চেহারার চরিত্রকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য ক্যামেরা-ম্যান বড়ুয়া এত ব্যস্ত, এত সজাগ ছিলেন।

আজকাল আমার একটা কথা প্রায় মনে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেরই কাজের অবসরে ছবি তুলতে পারাটা একটা শিক্ষার অঙ্গ করে নেওয়া উচিত। যেমন উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের গায়ক-বাদকের তবলা বাজনাটা মোটামুটি রপ্ত থাকে বলেই লয় ও সুরের ভারসাম্য রাখাটা তাঁদের কাছে সহজ হয়। ওস্তাদ আল্লারাখার কাছে গান শেখবার সময় আমাকেও একটু একটু তবলা শিখতে হয়েছে। ওস্তাদ বলতেন, 'তুমি সুরের স্রোতে

ভাসবে সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে লয়ের দাঁড় ঠিক চলছে কিনা। না রাখলেই নৌকা বানচাল হয়ে যাবে।'

তাই বলছিলাম শিল্পীদের ক্যামেরার জ্ঞান থাকলে শুধু পরিচালকের যথাযোগ্য সহায়তা করাই হয় না, চেহারার কোন্ এ্যাঙ্গল ক্যামেরার চোখে কেমন দেখায় সেই বোধেই অভিনীত চরিত্রের বক্তব্যকে আরো জোরালো করা যায়।

এ ত গেল মানস-জগতের লাভের হিসেব। 'শেষ উত্তরে'র বাস্তব সাফল্যও উল্লেখ করবার মতই।

'শেষ উত্তর' ও তার হিন্দী ভার্সন 'জবাব'-এ প্রমথেশ বড়ুয়ার চ্যালেঞ্জ উন্নত-শিরে বিজয়পতাকা ওড়ালো।

এ ছবি শুধু সুপার হিট করেনি। ১৯৪২ সালে বি. এফ. জে. এর বিচারে সেবছর শ্রেষ্ঠ স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় পুরস্কার আমিই পাই 'শেষ উত্তরে'র অভিনয়ের জন্য। আমি পর পর দু-বছর (১৯৪১ সালে পরিচয়, ১৯৪২-এ শেষ উত্তর) এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছি।

১৯৪২ সালের ২৫শে জুলাই পূর্ণ, শ্রী ও পূরবীতে এ ছবির মুক্তি হয়। হিন্দী ভার্সনও সেই বছরেই মুক্তি লাভ করে। তখন শুনেছিলাম এ ছবি থেকে সাতাশ-আটাশ লক্ষ টাকা লাভ হয়, যেখানে ডবল ভার্সন ছবি তৈরীর খরচ ছিল পাঁচ লক্ষ। ছবি তৈরীর খরচ ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এখন ত দুটি ভার্সনের ছবি করতে কমপক্ষে পনেরো-ষোলো লক্ষ টাকা খরচ।

'শেষ উত্তর' ছবি করবার সময়ই যমুনার কাছাকাছি আসবার সুযোগ ঘটল। এর আগে ওর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ থাকলেও অন্তরঙ্গতা ছিল না। খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের নিরীহ মেয়ে বলে যমুনাকে বরাবরই খুব ভাল লাগত। এখানে ওর আতিশয্যবিহীন আন্তরিকতা আমায় মুগ্ধ করেছে।

সংসারে অভিন্নহৃদয় বন্ধু পাওয়াটা সবচেয়ে বড় হলেও সংসার এবং কর্ম জীবনের নানা লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রীতির নানা শ্রেণীর ছোট-বড় দানের ভূমিকাও তুচ্ছ করবার মত বস্তু নয়।

মাত্র কয়েকমাস আগে আমার ছেলের বিয়েতে যমুনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে যেতেই ওর সেই হাত দুটি জড়িয়ে ধরার উষ্ণতা যেন পুরানো দিনের যমুনাকে মনে করিয়ে দিল। আমার তাড়া ছিল। বললাম, 'যমুনা, লক্ষীটি

ভাই, আজ আর বসব না।' 'ইস, সেকি হয় নাকি? আমি তোমায় জোর করে ঘরে টেনে নিয়ে যাব।' সত্যিই গেল। এই জোরের সঙ্গে যদি হৃদয়ের উত্তাপ থাকে তা হৃদয়কে স্পর্শ করেই, তার পরিধি এতটুকুই হোক আর এতবড়ই হোক।

মনে হল কালের স্থূল হস্তক্ষেপ মানুষের বাইরেটার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু অন্তরের নিভৃতলোকে মানুষ বুঝি চিরকালই এক ও অভিন্ন।

'শেষ উত্তর'-এর বিপুল সাফল্য আমায় যেন নতুন প্রতিষ্ঠা দিল। শুধু কর্মক্ষেত্রেই নয়, রসিকচিত্তেও। গানগুলির প্রত্যেকটিই ত 'হিট সং' হয়ে দাঁড়ালো। এসব গানের রেকর্ড-সেল থেকেও প্রচুর রয়ালটি পেয়েছি।

গানের ক্ষেত্রে 'শেষ উত্তরে' এমন স্মরণীয় জনপ্রিয়তার একটা বড় অংশ প্রাপ্য সঙ্গীত পরিচালক কমল দাসগুপ্তর। কমলবাবু তখনকার দিনের— শুধু তখনকার দিনেরই বা বলি কেন, সর্বযুগেরই বাংলাদেশের সঙ্গীতজগতের এক শীর্ষস্থানীয় সুরকাররূপেই সম্মানিত হবার মতই সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব।

সুরকার হিসাবে বিভিন্ন ভাবের ও ছন্দের গানে তার অফুরান বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। 'শেষ উত্তরে'র প্রতিটি গান সমান জনপ্রিয় হলেও 'যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে' গানটির সুরকল্পনার আবেগ আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিলো।

গান তুলতে গিয়ে মানুষটিব পরিচয় পেয়ে আরো বেশী মুগ্ধ হলাম। এতবড় গুণী, কিন্তু কি সাদাসিধে সরলমানুষ। কি বেশভূষায়, কি আচরণে বোঝবার উপায় নেই উনি এতবড় প্রতিভার অধিকারী। ওঁকে চেনা যায় ওঁর গানের সুরে আর শেখানোর ঐকান্তিক যত্নে। ওঁর মধ্যের যে গুণটি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল সেটি ছিল এই যে যাকে শেখাচ্ছেন তার মতামত ও suggestion কেও যথেষ্ট মূল্য দিতেন। কোনো জায়গায় আমি যদি বলতাম মীড়টা এইভাবে দিলে কেমন হয়? কিংবা থামাটা আগে? বা পরে? উনি সোৎসাহে বললেন, 'চমৎকার। এটা আরো সুন্দর হোল্গো।'

এ হেন উদারতা খুব কম পরিচালকের মধ্যেই দেখেছি।

এরপরই মুরলীবাবুর সঙ্গে নতুন করে দু'বছরের কনট্রাক্ট হয়ে গেল। মুরলীবাবু অত্যন্ত সৎ, ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ। কিন্তু এসব গুণকেও ছাপিয়ে উঠেছিল ছোট-বড় সবার কাছেই তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। 'শেষ উত্তর'

হিট পিকচার হয়েছিল বলে মিঃ বড়ুয়ার প্রতি ত বটেই, আমার প্রতিও তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। একাধারে অর্থবান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির এমন অকৃপণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদারতা বড় একটা দেখিনি। চিত্র জগতে ত নয়ই। আর দেখিনি বলেই তার স্মৃতি আজও এমন করে মনকে অভিভূত করে রেখেছে। দাক্ষিণ্য হিসাবে মোটা অঙ্কের টাকা ছাড়াও যে সম্মান পেয়েছি, তার আনন্দ জীবনীশক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্মশক্তিকেও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমারই ব্যবহারের জন্য স্টুডিওতে বিশেষভাবে সুসজ্জিত মেক-আপ-রুম সংশ্লিষ্ট স্নানঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই নিরিবিলি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করবার, অভিনয় ও গানকে সুন্দরতর করে তোলবার কল্পনায় বিভোর হয়ে যাবার অবকাশ পেতাম বলেই তখনকার কাজ এমন সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে।

এরপরের ছবি 'যোগাযোগ' যার হিন্দী ভার্সান হোলো 'হসপিটাল'। এ ছবিতে আমার বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন তখনকার রূপশ্রেষ্ঠ অভিনেতা জ্যোতিপ্রকাশ। অমন চেহারা বড় একটা চোখে পড়ে না। বিধাতার দেওয়া রূপের সঙ্গে মিলেছিলো তাঁর চরিত্র ও অতুলনীয় স্বভাব-ব্যবহারের মাধুর্য। রূপসী নারী অথবা রূপবান পুরুষ নিজের রূপলাবণ্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারে? আর এর জন্য অন্তরের অতলে থাকেই থাকে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার। কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশের মধ্যে কোনো আত্মসচেতন উগ্রতার লেশমাত্র ছিল না। নম্রমধুর ব্যবহারে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানজ্ঞাপনের বৈদগ্ধ্যে মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধে রুচিমার্জিত অন্তরটিই যেন প্রতিফলিত হোতো।

অত অল্পবয়স। কিন্তু কখনও কোনো লঘুচিত্ততা অথবা শালীনতাবোধের ঘাটতি দেখিনি তাঁর চলায়, বলায়, আচারে-ব্যবহারে। স্বভাবমাধুর্যই হয়ত বা তাঁর স্নিগ্ধ রূপের আবেদনকে গভীর করে তুলেছিলো। দীর্ঘতায় কিছু স্বল্পতার ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছিল তাঁর মুগ্ধকারী হাসি আর সরল নিষ্পাপ চাউনি। রোমান্টিক হিরোর রোল ওঁকে এত সুন্দর মানিয়েছিল। জ্যোতি-প্রকাশের সঙ্গে কাজ করে সত্যিই বড় আনন্দ পেয়েছি।

কিন্তু কে জানত নিয়তির মত দুর্ঘটনা এ-আনন্দের এমন নির্মম পরি-

সমাপ্তি ঘটাবে? ছবিটির তিন-চতুর্থাংশ শেষ হয়েছে। সবার মন আনন্দে ভরপুর। এম. পি. প্রোডাকসনস সবদিক দিয়েই আর একটি মধুর ছবি চিত্ররসিকদের উপহার দিতে পারবে—এই বিশ্বাসে সবাই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। প্রতিদিন আমার কাছে কত চিঠি যে আসত—কানন দেবী ও জ্যোতিপ্রকাশের চেহারা ও অভিনয়ের কম্বিনেশন দেখবার জন্য সবাই অধীর প্রতীক্ষায় রত।

এমন সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই জ্যোতিপ্রকাশের মহার্ঘ রত্নের মত জীবনের অবসান ঘটল। ওঁর স্ত্রী তখনকার সুদর্শনা ও খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী শীলা হালদারের মৃত্যু ঘটল। আর এ-বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করতে পারেননি তাঁর প্রেমময় কোমলপ্রাণ স্বামী। আত্মঘাতী হয়ে তিনিও মৃত্যুবরণ করলেন।

সারা চিত্রজগতে শোকের ছায়া নেমে এল। কিন্তু এ-শোক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করল আমাদের, যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলাম এবং সে অসম্পূর্ণ কাজের ক্ষতিপূরণ ঘটাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিলো।

কিন্তু চরম ক্ষতির মুহূর্তেও মন ভরে উঠেছিল তাঁর প্রেমের সততায়, আন্তরিকতার একাগ্রতায়, আত্মনিবেদনের নিষ্ঠায়। এমন সীমাহীন ভালবাসার কাহিনী কবির কল্পনাতেই প্রত্যক্ষ করা যায়, আর পড়া যায় সেইসব উপন্যাসে যেগুলিকে বাস্তবীরা অবাস্তবতার অপবাদ দেগে কোণঠেষা করে রেখে দেন। এই ধূলিধূসর আবেগহীন জগতে এমন আত্মহারা প্রেমের রূপ কি মানুষের চেতনায় অন্য একটা পরিণতির আভাস দেয় না?

রূপকথার রাজপুত্রের মত জ্যোতিপ্রকাশ এবং তাঁর অভিনব জীবননির্বাণে আমরা সবাই ত খুবই মুষড়ে পড়লাম। যেদিন প্রোজেকসান দেখানো হোলো 'যোগাযোগে'র সেই শেষ-না-হওয়া ছবি, স্টুডিওর সবাই যত মুগ্ধ হয়েছে তার চেয়ে বেশী 'হায় হায়' করেছে। এমন ছবি তার সার্থক সমাপ্তিতে পৌছতে পারল না? অন্য কোনো হিরোকে দিয়ে নতুন করে ছবিটি আরম্ভ করার কথা ভাবাও যাচ্ছে না, অথচ না করেই বা উপায় কি? কাজ ত বন্ধ রাখা যায় না?

অগত্যা জহর গাঙ্গুলীকে দিয়ে আবার নতুন করেই ছবিটি শুরু করা হোলো। জহরবাবু শক্তিমান অভিনেতা। পার্ট উনি ভালই করেছিলেন। তবু সবার মনটা খুঁত খুঁত করত। এমন অশুভ সূচনা যে ছবির তার

পরিণাম হয়ত দুর্ভাগ্যবাহীই হবে এইরকম একটা আশঙ্কায় সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকতাম।

কিন্তু সকলের সব আশঙ্কাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে শুধু হিট নয় 'সুপার-হিট' ছবির তালিকায় স্থান পেয়েছিল এম. পি. প্রোডাকসনের 'যোগাযোগ'। শুধু অভিনয় নয়, গানও এ ছবির একটা বড় আকর্ষণ ছিল। এ-ছবিতেই রবীন মজুমদারের সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁর গাওয়া দু-একটি গানও যথেষ্ট সমাদৃত। পরিচালক সুশীল মজুমদারের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য।

এই ছবিতেই নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে। একেবারে প্রথমের দিকে ম্যাডান থিয়েটারে আমার সঙ্গে ব্যবহারে ও কথাবার্তায় তাঁর যে প্রচ্ছন্ন একটা অবহেলার ভাব মনকে পীড়া দিত, এখন যেন তা তিরোহিত। এখানে তিনি আমার প্রতি অনেক স্নেহকোমল। এই ছবিতে কাজ করবার সময়ই তাঁর সময়ানুবর্তিতা, ডিসিপ্লিন ও শিল্পবোধ-সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল।

'যোগাযোগ'-এর গানগুলির কালজয়ী জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। তিন-চার বছর আগে, কোন্ একটি সিনেমা হলে মনে নেই, পুরনো দিনের ছবি হিসেবে 'যোগাযোগ' দেখানো হচ্ছিল। সেই সময়ই এত বছর বাদেও দর্শকদের তুমুল উচ্ছ্বাসের উল্লেখ করে কোনো একটি ইংরাজী পত্রিকায় কোনো এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন:

...and the whole house hummed with the tune of "If you don't like me don't give your heart."

'যদি ভাল না লাগে ত দিও না মন'-এর এমন উপভোগ্য অনুবাদে এই বয়সেও কৌতুকবোধ না করে পারিনি।

তবু জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে একত্রে অভিনীত ঐ একটি মাত্র ছবির শেষ অবধি পৌঁছতে পারলাম না—এ আফসোস যাবার নয়। এর আগে 'পরাজয়ে'র একটি সিনে কয়েক মুহূর্তের জন্য অভিনয় করেছি ওঁর সঙ্গে, কিন্তু সে নিতান্তই ছোট রোল।

ছবির লাভের অঙ্কও রীতিমত উৎসাহব্যঞ্জক। ১৯৪৩ সালের ১৭ই এপ্রিল উত্তরা, পূরবী ও পূর্ণতে বাংলা ছবির মুক্তি ঘটল। হিন্দী ভার্সন বোম্বের কোন এক ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে বিক্রী করে প্রচুর

টাকা পেয়েছিলেন মুরলীবাবু। আর সে লাভের একটা মোটা অংশ আমিও পাই।

ছবির পরিচালক সুশীল মজুমদারের কৃতিত্ব নিশ্চয় ছিল। নইলে এত দুর্ঘটনার পরও ছবি হিট করল কেমন করে? তবু একটা সিন সেদিনের দৃষ্টিভঙ্গীতেও বড় ছেলেমানুষী বলে মনে হয়েছিল। হাসপাতালের একটি দৃশ্যে 'নহ একাকী' গানটি গাইতে গাইতে নায়িকা একটি স্ট্যাচুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পিছনে 'প্রসেশন' করে চলেছে রোগীর দল। সেদিন আমার কাছে যেটা ছেলেমানুষী মনে হয়েছিল (স্ব-অভিনীত ছবির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও) আজকে বাংলা ছবির এই অগ্রগতির যুগে পরিণতমান দর্শকের চোখে সেটা হাস্যকর হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

তখন যুদ্ধ চলছিল। সারা দেশ জুড়ে হাহাকার। সবদিকে একটা বড় রকমের তছনছ হয়ে গেল। আমার জীবনটাও নানান কারণে খুব এলোমেলো হয়ে পড়েছিলো। এই যুদ্ধোত্তর যুগের ছবি হোলো 'বিদেশিনী'। তখন যুদ্ধের দরুণ ফিল্ম রেশন হয়ে যায়। লাইসেন্স যোগাড় না করে কোনো প্রযোজকই ছবি তৈরীর কাজে হাত দিতে পারতেন না।

'বিদেশিনী' করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুরলীবাবু একদিন আমাদের ডেকে গল্পটি পড়িয়ে শোনালেন। আমি লেখিকা নই, পরিচালকও নই। তবু চিত্রজীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা দিয়ে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, 'বিদেশিনী'র প্লটের জোর নেই। এ-গল্প সিনেমায় চলবে না। এ-কথা ওঁদের জানালাম, গল্পটি গ্রহণ করবার বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদও। কিন্তু মুরলীবাবু জানালেন যে এই গল্প সিনেমাতে করবার লাইসেন্স হাতে নিয়েই তিনি কাজ শুরু করতে চলেছেন। অতএব এ-গল্প না করলে ছবির লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'বিদেশিনী'র হিরোইনের রোল নিতে হোলো। কারণ আমি এম. পি-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। বাদানুবাদ দিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে চলে আসা যেত না তা নয়। কিন্তু যে আমি জীবনে কারো কাছে কোনোদিন অকৃতজ্ঞ হইনি, সেই আমি তাঁকেই বিপন্ন করে চলে যাব যিনি জীবনের অতি দুঃসময়ে আমায় প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দিয়েছেন? অতএব তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া কিই বা উপায় ছিল? কিন্তু মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল এম. পি-র আগের দুটি ছবির সুনাম এতে অক্ষুণ্ণ থাকবে ত?

ধীরাজ ভট্টাচার্যকে নায়ক ও আমায় নায়িকার ভূমিকায় নিয়ে ছবি শুরু হোলো, শেষ হোলো এবং ১৯৪৪ সালের ২৯শে মে পর্দার বুকে মুক্তও হোলো। কিন্তু মিথ্যা হোলো না আমার আশঙ্কা। ছবি দর্শকদের একেবারেই খুশী করতে পারেনি। তখনই মনে হয়েছে 'বিদেশিনী'তে এম. পি প্রোডাকসনের যে ভাঙন শুরু হোলো তার সর্বনাশা ঢেউ বুঝি তীর ভেঙে সব ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এর পরের ছবি 'পথ বেঁধে দিল'। এ ছবিতেই প্রথম ছবি বিশ্বাসের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটল। ছবিবাবু মস্তবড় অভিনেতা এবং তার চেয়েও বড় শিল্পী এ-কথা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই জেনেছিলাম। এখন মানুষটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধুর অন্তঃকরণটির সঙ্গেও পরিচয় ঘটল।

সহশিল্পীরূপে তাঁর অমায়িক সহযোগিতা ত পেয়েইছিলাম, এছাড়া তাঁর রসিক চিত্তটিও কম আকর্ষণীয় ছিল না। যেমন মার্জিত কৌতুক তাঁর প্রতি কথায়, তেমনই নির্ভেজাল আন্তরিকতা তাঁর ব্যবহারে। দেখা হলেই খুব কাছে এসে কানের কাছে একটু ঝুঁকে স্নেহ ও রঙ্গভরে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় একাধারে বড়র স্নেহ, এবং সম্ভ্রমবোধের দূরত্বে সুন্দর একটা ভারসাম্য লক্ষ্য করতাম। ব্যক্তিত্বপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারায় শুধু নয়—এই সংযত ব্যবহারই ছিল তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত আভিজাত্যের অঙ্গ। এ-আভিজাত্য নিছক পড়ে পাওয়া নয়, এ ছিল তাঁর বিদগ্ধ অন্তরের সৃষ্টি।

শিল্পী ছবি বিশ্বাসের সম্বন্ধে শিল্পরসিকদের কাছে নতুন করে কিছু বলার নেই। এইটুকু শুধু না বলে পারছি না শিল্পজগতে ছবিবাবু প্রবেশ করেছিলেন বিধিদত্ত রাজদণ্ড হাতে নিয়েই। তাঁর রাজকীয় ব্যক্তিত্বের সামনে সকলের মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসত।

এ ছবির পরিচালক ছিলেন প্রেমেনবাবু। প্রেমেনবাবুর পরিচালনা ভালই তবে তার চেয়েও ভাল লাগত এবং এখনও লাগে ওঁর লেখা গল্প উপন্যাস পড়তে।

'পথ বেঁধে দিল'র বাংলা সংস্করণ ১৯৪৫ সালের ১৯শে মে-তে মুক্তি পেল। হিন্দী সংস্করণ মুক্তিপ্রাপ্ত হোলো তারই কয়েকমাস বাদে।

এ ছবির অবস্থা 'বিদেশিনী'র চেয়ে আশাপ্রদ ছিল। কিন্তু তবু এই কথাটাই যেন দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে এম. পি. প্রোডাকসন রাহুগ্রস্ত। এ সময়টা মুরলীবাবুকেও খুব বিপর্যস্ত ও চিন্তিত মনে হোতো।

মাঝে মাঝে যখন ওঁর ধর্মতলার অফিসে যেতাম, দেখতাম ওঁকে ঘিরে বসে আছে গণৎকারের দল।

সরল মানুষ মুরলীবাবু তাঁর সততা ও কর্মক্ষমতা সত্বেও ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। শুনেছিলাম রাশিচক্র মিলিয়েই তিনি মহরতের দিন, স্যুটিং আরম্ভ করার দিন, হিরো হিরোয়িন এমন কি পরিচালক পর্যন্ত নির্বাচন করতেন।

দুটি ছবিতে লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্ক বেশী হওয়ার দরুনই মানুষটাও যেন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

এম. পি. প্রোডাক্‌সনের পরবর্তী দুটি ছবি হোলো 'তুমি আর আমি' (বাংলা ও হিন্দী) এবং 'অনির্বাণ'। হিরো যথাক্রমে মিহির ভট্টাচার্য ও জহরবাবু।

"অনির্বাণ" ছবিটি হিট্ না করলেও গানগুলি জনপ্রিয় হয়েছিলো। 'মুক্তি' তে প্রথম শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বাদ পাই তারপর "অনির্বাণ" ছবি এবং তারও আগে কিছুদিন শ্রীঅনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি। একটু কড়া শিক্ষক কিন্তু কি যত্ন করে শেখাতেন। এতটুকু ভুল হবার উপায় ছিল না।

প্রথমটির পরিচালক অপূর্ব মিত্র। ইনি দেবকীবাবুর আত্মীয় এবং অ্যাসিস্টেণ্ট ছিলেন, যদিও পরিচালনার কাজে তাঁর ধার কাছ দিয়েও যেতে পারেননি। আর সৌমেন মুখার্জির পরিচালনা সম্বন্ধে যত কম বলা হয় ততই ভাল।

এম. পি. প্রোডাক্‌সনের পরবর্তী ছবিগুলি যেন পূর্ব খ্যাতিকে ধাপে ধাপে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় একটা কথা প্রায় মনে হোতো, মুরলীবাবুর বাণিজ্যলোকের যে দরজা এমন সাড়ম্বর সাফল্যে খোলা হোলো তা শেষ অবধি বন্ধ করে দিতে হবে না ত?

এসব ছাড়াও এম. পি. প্রোডাক্‌সনের বাইরে 'বনফুল', 'কৃষ্ণলীলা' ও 'আরেবিয়ান নাইট' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করি। পরিচালক নীরেন লাহিড়ী।

পি. আর. প্রোডাক্‌সনের ব্যানারে প্রযোজিত 'বনফুল' ছবিতে পি. এন. রায়ের সঙ্গে পার্সেণ্টেজ বেসিসে কাজ করেছি। বোম্বের তরুণ অভিনেতা কৃষ্ণকান্ত এ ছবির হিরো, পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। ছবি যেমনই হোক, টাকা ভালই পেয়েছিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানাই, এন-টি-তে কাজ করবার সময়ই বোম্বে থেকে অনেক লোভনীয় টাকার অঙ্কের প্রলোভন নিয়ে প্রস্তাব এসেছিল ওখানের চিত্রজগতে কাজ করবার আমন্ত্রণবাহী হয়ে, এখন তাদের তাগাদাটা আরো জোরালো হোলো।

প্রথমের দিকে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই করিনি। কারণ নিউ থিয়েটার্স ও বি. এন. সরকারই তখন সবরকম সুবিধা অসুবিধা নিয়েই আমার কাছে স্বর্গ ও বিধাতা। আর এখন ত সে প্রশ্ন ওঠেই না। কারণ সুখে-দুঃখে, শান্তিতে ও দ্বন্দ্বে, আনন্দ ও বেদনায় যে বাংলাদেশ জননীর স্নেহে আমায় আশ্রয় দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, দিয়েছে ভারতব্যাপী যশ, আজ আমার সেই বাংলাদেশকে ছেড়ে যাব কোথায়? কেন? কিসের আকর্ষণে? ঈশ্বর যে অর্থ আমায় দিয়েছেন নিজের সম্মান ও সুনাম বজায় রেখে চলার পক্ষে তা কি অপর্যাপ্ত নয়? এর চেয়ে বেশী লোভ করে বহির্মুখী চটকের ডাকে সাড়া দিলে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই পূজারত একাগ্রতা? চাঞ্চল্যের গড্ডলিকা প্রবাহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এ যেন দরিদ্র মার স্নেহাঞ্চল ছায়া ত্যাগ করে কোনো উন্নাসিক ধনীর ঐশ্বর্যের অহঙ্কারের কাছে আপনাকে বিকিয়ে দেওয়া।

তাই ওঁদের আমি জানালাম, বাংলাদেশ ছেড়ে বোম্বে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সত্যিই প্রয়োজন হয় ওঁরাই যেন এখানে এসে ছবি করে নিয়ে যান। মিঃ বড়ুয়াকেও অনেক চেষ্টা করে বোম্বের কোনো পার্টি নিয়ে যেতে পারে নি।

অতঃপর বোম্বেরই এক প্রযোজক লক্ষ্মীদাস আনন্দ কোলকাতায় এসে দেবকীবাবুর পরিচালনায় একটি হিন্দী ছবি 'কৃষ্ণলীলা' করে নিয়ে গেলেন। এই ছবিতে আমার ছিল রাধার ভূমিকা। প্রথম জীবনে জয়দেবের 'রাধা'র ভূমিকা এবং শেষের দিকে রাধার ভূমিকা দিয়ে একটি বৃত্তকে সম্পূর্ণ করাই কি বিধাতার অভিপ্রায় ছিল?

বোম্বের এই পার্টি আমায় প্রচুর অর্থ দিয়েছিল। যতদূর জানি বাংলাদেশের চিত্র জগতে আজ অবধি কোনো শিল্পীর দক্ষিণা আমার সেই অঙ্ককে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি।

'কৃষ্ণলীলা'র পর দুটি স্বতন্ত্র ব্যানারে আরো দুটি ছবিতে কাজ করলাম।

একটি পাওনীয়ার পিকচার্সের 'চন্দ্রশেখর', অন্যটি গীতাঞ্জলি পিকচার্সের 'ফয়শালা'।

প্রথম ছবিটি শুরু হওয়ার সংবাদ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্র-রসিক মহলে খুব সাড়া পড়ে গেল। কারণ এই ছবিতেই সর্বপ্রথম বোম্বের ম্যাটিনী আইডল অশোককুমারের বিপরীতে আমি অভিনয় করি। অশোক-কুমার বাঙালী হলেও বোম্বের নায়কশিরোমণি। বোম্বে ফিল্মের গ্ল্যামার, অশোককুমারের গ্লামার এবং আমারও যৎকিঞ্চিত শিল্পীখ্যাতি সব মিলিয়ে 'চন্দ্রশেখর' একটা গ্ল্যামারাস ছবি হয়ে উঠেছিল। তার ওপর কাস্টিং-এ ছিলেন একধারে ছবি বিশ্বাস, নীতিশবাবু, অমর মল্লিক এবং রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ শক্তিসম্পন্ন শিল্পীবৃন্দ। পরিচালক দেবকী বসু।

কিন্তু সবার ওপরে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাণ্টিক কাহিনী। টিমওয়ার্ক জোরালো হবার দরুন ছবির বক্তব্যকে যথাযথ রূপ দেওয়া এত সহজ হয়েছিল।

এ ছবিতে কাজ করতে খুব ভাল লাগার কারণ বোধহয় কাহিনীর স্বপ্নময়তা যা আমাদের বাস্তব পরিবেশকে ভুলিয়ে দিত। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রেম, মর্মঘাতী বিচ্ছেদ, নির্ভীক, স্বাধীন ভারত সম্রাটের সঙ্গে ক্ষমতালোভী কপটাচারী ইংরেজের যুদ্ধ—বিশ্বাসঘাতকতা, নির্জন অরণ্য, রোমান্স, মায়ের মত স্নেহশীল প্রতাপের ঘোড়া—এর কোনোটাই দৈনন্দিনের ছককাটা জীবনের পরিধিতে পড়ে না। এই চমকপ্রদ ভাবটাই আমায় এমন করে টানত।

সবচেয়ে ভাল লেগেছিল প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের নির্মল ও মার্জিত সুন্দর সৌহার্দ্য। একজন শৌর্যে বীর্যে তেজীয়ান মহান প্রেমিক। যেমন গভীর তাঁর প্রেম—তেমনই দুর্জয় তাঁর ত্যাগ আর নির্মম সংযম। প্রেমিকার দীঘল চোখের মিনতি তাকে কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে এতটুকুও টলাতে পারেনি।

অপরজন (চন্দ্রশেখর) জ্ঞানতপস্বী উদার, আপন ভোলা সাধক, পুঁথিই যাঁর প্রাণ। কিন্তু শৈবলিনীর বিরহে সেই পুঁথিকেও তিনি নির্দ্বিধায় আগুনে ফেলে দিতে পারলেন। কারণ যাকে তিনি গ্রহণ করেন তাঁকে অত্যাজ্য ধর্মের মতই গ্রহণ করেন।

একজন শৈবলিনীর প্রেমিক, অপরজন স্বামী। একজন পেয়েও ছেড়েছেন, আর একজন পেয়েও তাকে কর্তৃত্বের নাগপাশে বাঁধেননি। চন্দ্রশেখর

জানেন প্রতাপ ও শৈবলিনীর সম্পর্ক। তবু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এ শ্রদ্ধায় কোনো খাদ নেই, ভান নেই।

অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে এই ভেবেই মনে মনে হাসতাম যে এখনকার যুগে—কি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এহেন মর্যাদাব্যঞ্জক মধুর সম্পর্কের কথা ভাবা যায়? সম্ভাব্য সকলরকম উচ্চশিক্ষা ও বৈদগ্ধের অধিকারী হয়েও প্রেমিক তার প্রেমিকার কাছে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কীয়ের সম্বন্ধে এমন সম্ভ্রম ভরে কথা বলতে পারেন? কেন পারেন না? খুব সম্ভব পাশ্চাত্যের বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির অলক্ষ্য প্রভাবেই এখনকার প্রেমিকের কাছে ভাল-বাসার সংজ্ঞা আলাদা হয়ে গেছে। বড় প্রেমই যে বড় ত্যাগ করবার শক্তি রাখে এ চিন্তাও আজ হাস্যকর। তাদের বাসনার ঝড় বহন করে আনে শুধুই প্রত্যাশা, আকাঙ্খা উৎকণ্ঠা বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর প্রতিপদেই একটা আর একটার সঙ্গে জড়িয়ে মনটাকে হিজিবিজি চাঞ্চল্যে কুশ্রী করে তোলে। তাই হয়ত বুদ্ধ থেকে শুরু করে সকল দিশারীই এত জোর দিয়েছেন বিশেষ করে নর-নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধেই। কেননা এ সম্বন্ধে লুব্ধতা, প্রত্যাশা ও প্রতিদান কামনার দিকটাই যে আনে জ্বালা, শঙ্কা, উদগ্র উত্তপ্ত বহির্মুখিতা।

প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর বাইরের সকল বৈষম্যসত্ত্বেও মিলেছিলেন একরোখা সরল মহত্বে, অন্তরের অতলে জাগ্রত তীব্র ধর্মবোধের পুণ্যক্ষেত্রে। এই মহাকাব্যধর্মী কাব্যের নায়িকা হয়ে যেন সেই আদর্শোপম যুগে জেগে উঠেছিলাম।

১৯৪১ সালের ১৪ই নভেম্বর লাইট হাউসে সাড়ম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত 'চন্দ্রশেখর' শুধু অসাধারণ হিট পিকচারই হয়নি, বহুদিন অবধি বেস্ট সেলার এবং শীর্ষতম স্থান পেয়েছে।

কিন্তু এমন আনন্দের হাটেও আমার জন্য কিঞ্চিৎ বিষাদের মেঘ সঞ্চিত রাখতে আমার রঙ্গপ্রিয় জীবনবিধাতা ভোলেননি। আমার জন্য ধার্য দক্ষিণা ছিল মোটা অঙ্কেরই। কিন্তু প্রযোজকবৃন্দ প্রচুর লাভ করেও এগারো হাজার টাকা থেকে আমায় বঞ্চিত করবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেননি। এমন একটা উজ্জ্বল মুহূর্তে প্রযোজকদের এহেন আচরণে বিরক্তির তিক্ততা মনকে একেবারেই স্পর্শ করেনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। বিশেষ করে আমার বহুদিনের আকাঙ্খিত

বিদেশে যাবার ঠিক আগেই এই ঘটনা আমায় বেশ খানিকটা বিচলিত করেছিল। তবে এটুকু জোর দিয়েই বলা যায় যে বিদেশে থাকাকালীন ছবিটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের আনন্দ-সংবাদ এ দুঃখকে অনেকখানিই ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল।

যাইহোক সময় ও বয়সের ব্যবধানে এ ক্ষতি আমি ভুলে গেছি এবং তাদের সঙ্গে আমার মোটামুটি প্রীতির সম্পর্কই বজায় আছে।

এ ছবিতেই প্রথম অশোককুমারের সংস্পর্শে এলাম। শিল্পী হিসাবে উনি অত্যন্ত কোঅপারেটিং। মানুষ হিসাবে ভদ্র মার্জিত কিন্তু বড্ড বেশী কায়দাদুরস্ত, যাকে বলে ফর্মাল—বাংলাদেশের নায়কদের মত অনাড়ম্বর ও আত্মীয়তাধর্মী নয়। অনেক পরে বোম্বেতে অবশ্য অশোক-কুমার দম্পতির সঙ্গে আমার ও আমার স্বামীর যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়, এবং তারপর সস্ত্রীক কোলকাতায় এসে দু-একবার আমাদের আতিথ্য গ্রহণও তিনি করেছেন। এ দূরত্ববোধ তখন অনেকটাই অপসারিত হয়ে গেছে; এবং আজও আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পর্কই আছে।

এরপর গীতাঞ্জলি নিবেদিত এবং অপূর্ব মিত্র পরিচালিত 'ফয়শালা'—সবদিক থেকেই একেবারে ব্যর্থ ছবি। এ ছবি ১৯৪৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর প্যারাডাইসে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। কিছু অর্থপ্রাপ্তি ছাড়া এ ছবির সম্বন্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা নেই।

'চন্দ্রশেখর' ও 'ফয়শালা'র কাজ শেষ হবার অব্যবহিত পরই ১৯৪৭ সালের ৬ই আগস্ট আমি বিদেশে যাত্রা করি। উদ্দেশ্য—ওখানের সিনেমা, স্টুডিও তথা চলচ্চিত্র জগত দেখা। ভাল করে জ্ঞান হওয়ার আগে থেকে যে চিত্রলোকে আমার প্রবেশ তার অগ্রগতির চূড়ান্ত বিকাশ (যা পাশ্চাত্যেই ঘটেছে) দেখবার আকাঙ্খা আমার বরাবরই ছিল প্রবল। এখন অবসরও খানিকটা পাওয়া গেল এবং আর্থিক অবস্থাও অনুকূল। তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই সাগরপারে পাড়ি দিলাম।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ভুলদা ও রাণীদির (প্রশান্ত মহালনবীশ ও রাণী মহালনবীশ) কথা; আমার বিদেশ ভ্রমণের আনন্দস্মৃতির অনেকখানিই জুড়ে আছেন এই স্নেহপ্রবণ বিদগ্ধ দম্পতি। রাণীদি এখানে আগে থেকেই ছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন ভুলদার যাওয়ার। আর ঠিক এই সময় উনিও যাচ্ছিলেন। এই যোগাযোগই আমার পক্ষে

অত্যন্ত শুভযাত্রা হয়ে দাঁড়ালো। ভুলদার সঙ্গে স্বল্পকালীন সফরের সময়ই তাঁর উদার ও মুক্ত মনের স্নেহস্পর্শ একঝলক হাওয়ার মতই আমার ব্যথাদগ্ধ হৃদয়কে যেন জুড়িয়ে দিয়েছিল। জীবনে কতশত লোকেরই ত সংস্পর্শে আসি, প্রত্যেকের কাছেই কিছু-না-কিছু পাই কিন্তু আলোর পাথেয় পাই শুধু তাঁদেরই কাছে যাঁরা নিজেদের অন্তরাত্মার আলো দিয়ে আমাদের জীবনকে আলোছায়ার লীলাকে উস্কে দিয়ে যান।

প্রশান্তদা জ্ঞানী, গুণী, সাধক, বৈজ্ঞানিক হয়ত বা দার্শনিকও। আর এসবেরই ফলশ্রুতি ছিল তাঁর নির্লিপ্ত অকুতোভয়, মধুর ব্যক্তিত্ব যা কোনো সামাজিক সীমার মধ্যে হৃদয়ের অপরিমিত ঐশ্বর্যকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখেনি। ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আত্মীয়তার সূত্রেই। কিন্তু এই উপলক্ষে গড়ে ওঠা উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের নিবিড় বন্ধন অটুট ছিল তখনও যখন এই আত্মীয়তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আর এখানেই ছিল তার মহত্ব।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি মানুষের স্নেহ ভালবাসাকে বড় জোর বলা যায় 'বাঃ।' কারণ এখানে সকল সম্পর্কের দায়-দায়িত্ব বহন করেন স্বয়ং প্রকৃতি। কিন্তু আত্মীয় সম্পর্কের বাইরেও মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার মধ্যে তার হৃদয়ের গৌরব সূচিত হয়—কারণ এখানে মানুষ স্রষ্টা। ভুলদা আমার জীবনে এমনই এক আলোকস্তম্ভের মত ব্যক্তিত্ব, যাঁর স্নেহসজল হৃদয়ের সান্নিধ্যে এসে পেয়েছি অনেক। এই অভিজ্ঞতাকেই কবির ভাষায় বলা যায়—'অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।'

মনে পড়ে, ওদেশে থাকার সময় খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ছিল ওঁর সজাগ দৃষ্টি। হলিউড দেখতে যাব। কে নিয়ে যাবে সেখানে, যেন কোনো অসুবিধা না হয়। অসুস্থ হয়ে পড়েছি। ওদেশে হসপিটালের সুব্যবস্থা নার্স সবই কল্পতরুর মত অনায়াসলভ্য; তবু এসব খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর ভুলদার মায়ের মত ব্যগ্রব্যাকুল ব্যবস্থাপনা আজও যেন ভোলা যায় না। রাণীদি তাঁরই সুযোগ্যা সহধর্মিণী।

কালের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে অনেক ভাঙ্গাগড়ার বিবর্তন চলেছে। কিন্তু আগেই বলেছি ভুলদার সঙ্গে নিবিড় স্নেহ সম্পর্কের মর্যাদা তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রেখেছেন। যেখানেই যেতেন আমার জন্য টুকিটাকি কত কিছু নিয়ে আসতেন; কিউরিওর ওপর আমার চিরকালের ঝোঁক। যেখানেই গেছি রকমারী কিউরিও কেনাটা অজানতেই যেন আমার কাজের

তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছে। ভুলদা একথা জানতেন—আর মনে করে দেশ-দেশান্তর থেকে কতরকম কিউরিও যে আমার জন্য সংগ্রহ করে এনেছেন। একবার ওঁর হাত থেকে একটা কিউরিও নেবার সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায় আমার খুব ছোটবেলায় মেলা থেকে মা আমার জন্য একটি বেতের চুবড়িতে করে খেলাঘরের রান্নাবাটি, পুতুল এনে দিয়েছিলেন। তখনও ঠিক এমনই খুশী হয়েছিলাম।

আজ একই বছরে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে মা ও ভুলদাকে হারিয়ে মনে হচ্ছে আমার স্নেহ করবার মানুষগুলিকে বিধাতা যেন একে একে সরিয়ে নিচ্ছেন।

এই ট্যুরেই লণ্ডন, কায়রো, ইটালী, প্যারিস, সুইজারল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক, হলিউড, কানাডা মেক্সিকো, ওয়াশিংটন, শিকাগো, লস এ্যাঞ্জেলস, আরও নানান দেশ বেড়াবার সময় দৃশ্য দেখার চেয়ে স্টুডিওগুলি দেখার ওপরই জোর দিয়েছি বেশী।

এই সময়েই একদিন গিয়েছিলাম এম-জি-এম স্টুডিও দেখতে। ছ শো একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে সে যেন আলাদা এক জগত। পনের-ষোল দিন ধরে দেখেও শেষ করতে পারিনি। না দেখলে কল্পনাও করা যায় না কি বিরাট সেখানকার কাণ্ডকারখানা। প্রবেশদ্বারের সামনেটা কতকটা আমাদের রাজভবনের মতন। আগে থেকে অনুমতি নিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ না করলে সেখানে প্রবেশের অধিকার মেলে না। গেটের সামনে প্রবেশপত্র চেক করে নিয়ে ব্যবস্থাপকমণ্ডলী আগে ফোন করে জেনে নেন—কোন ফ্লোর খালি আছে, কোন ফ্লোরে কাজ চলছে। তারপর 'গাইড' সঙ্গে দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার পালা।

বিরাট বিরাট আর বিরাট। সবই সেখানে বিরাট। কত হাজার বছর আগের জগৎ তার সমস্ত চমক বিহ্বলতা নিয়ে যেন সেখানে অপেক্ষা করছে।

একটা বিভাগে গিয়ে মনে হোলো যেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে গেছি। কত পুরোনো মডেলের হাজার হাজার গাড়ি। ঘোড়ার গাড়ি থেকে শুরু করে মোটরগাড়ি সৃষ্টি হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়, পরিবর্তন ও আধুনিক মডেলের গাড়িতে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাস যেন একনজরেই চোখে পড়ে।

এ বিভাগের সঙ্গেই লাগাও আর এক চত্বরে হাল আমলের গাড়ির হাজারো মডেল। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গতি প্রকৃতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিটিও উপভোগ করবার মতই।

পরের বিভাগে গিয়ে ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবার যোগাড়। লোমহর্ষক জঙ্গল—ঝোপঝাড় ঘন আগাছা যেন আস্ত সুন্দরবনটাই তুলে আনা হয়েছে। এই জঙ্গলের মধ্যে বাঘ-ভাল্লুক তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে রীতিমত পুরুষানুক্রমে ঘরকন্না করতে পারে। জঙ্গল সংশ্লিষ্ট বিরাট লেকও অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখবার মতই।

তারপরই বাগান। সেখানে নানা রংবেরঙের অর্কিড। পৃথিবীর কোনো দেশের এমন কোনো ফুল নেই যা সেখানে দেখা যায় না। দুচোখ ভরে—এ বাগান দেখেছিলাম আর ভাবছিলাম স্বর্গলোকের নন্দনকানন কি এর চেয়েও মনোহর?

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখাবার এবং শেখাবার জন্য মস্তবড় শিক্ষায়তন রয়েছে। তাঁরা স্টুডিও দেখে এ সম্বন্ধে আলোচনার ক্লাস অ্যাটেণ্ড করে যাতে সেখানে বসেই পড়াশোনা, খেলাধূলা করতে পারেন—তারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

মেক-আপ রুম দেখে ত তাজ্জব বনে যেতে হয়। যে কোনো মানুষ সে যত কুৎসিতই হোক না কেন এখানের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মেক-আপের কল্যাণে ক্ষণিকের জন্যও যেন রূপসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে আগেকার দিনে মুনি-ঋষিদের একটি বরে—সুন্দর অবয়বে রূপান্তরিত হওয়ার মতই।

পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা পোশাকের ঘরে কত রকমারী ছাঁদের ও রঙের পরিধেয়। সম্রাট-সম্রাজ্ঞী রাজা-রানী থেকে শুরু করে ভিখারিণীবেশ ধারণের অজস্র সজ্জাপ্রকরণ। মন্ত্রবলে যেন একনিমেষে ইতিহাসের যে কোনো পাতায় ফিরে যাওয়া যায়।

টেকনিশিয়ানস রুমে কত রকমের সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি, 'মিউজিক টেক' ঘরে সে কি অপূর্ব সুরের মায়াজাল। আর সঙ্গীত গ্রহণের কি বিস্ময়কর ব্যবস্থা।

শিল্পীদের বিশ্রামাগার, ভোজনকক্ষ, সুইমিং পুল, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ—কি যে নেই, আর কি অপর্যাপ্তভাবে।

একটা ঘরে শুধু গল্প পড়ে শোনাবার জন্যই লোক মোতায়েন আছে,

পালা করে তারা প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পীদের গল্প পড়েই শুনিয়ে যাচ্ছে। সারা স্টুডিওতে যেন শিক্ষাক্ষেত্র ও রিসার্চের আবহাওয়া। বিরাট টেলিফোন একসচেঞ্জ ত ছিলই আর তখনকার দিনেই পঁচাত্তর জন পুলিশ সেই আজবদেশের ট্র্যাফিক কণ্ট্রোল করছে (এখন জানি না তাদের সংখ্যা কত)। মিনিয়েচার ট্রেনে এক বিভাগ থেকে আর এক বিভাগে মাল নিয়ে যাওয়া আসা চলছে।

ওয়ার্নার ব্রাদার্স আর-কে-ও রেডিও এগুলি অবশ্য অত ডিটেলসে দেখতে পারিনি। তবে ওখানেও যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে তারই একটা আন্দাজ নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। মেক্সিকোতে ছবির মত ছোট্টখাট্টো পরিচ্ছন্ন স্টুডিওটি গীতি-কবিতার মতই সুন্দর।

স্থানাভাবে হলিউডের পূর্ণাঙ্গ ছবি দিতে পারলাম না। কয়েকটি আঁচড়ে সামগ্রিক ধারণার একটু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র কারণ সুদক্ষ চিত্রকর আমি নই।

ওদেশের স্টুডিও দেখে যে সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম সেটি হচ্ছে এই যে সৃষ্টি ব্যাপারটা হল প্রকৃতির বিকাশ। সৃষ্টি কি? না, প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু অপ্রকাশ আছে তাকে প্রকাশ করবার, যা কিছু অব্যক্ত আছে তাকে ব্যক্ত করবার, যা কিছু অমূর্ত আছে তাকে মূর্ত করে তোলবার একটা অফুরন্ত প্রচেষ্টা। এই স্রোতকে এরা এড়িয়ে যায়নি—উপরন্তু সৃষ্টির নেশায় মেতে যথার্থকে আহ্বান করেছে। তাই বুঝি ওদের কর্মের উদ্দীপনার অন্ত নেই। অন্ত নেই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষের রহস্যভেদ করিবার স্ফুরণে, অক্লান্ত উদ্যমের।

ওদেশের স্টুডিও ও টেকনিশিয়ানস রুমের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের দেশের স্টুডিও ফ্লোরকে তাসের ঘর বললেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। তবু শুধুমাত্র শিল্পী, পরিচালক ও টেকনিশিয়ানদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, প্রতিভা ও শিল্পের প্রতি ভালবাসার জোরেই যা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কোনো দেশের রসিক সমাজই অপসৃষ্টি বলে তাচ্ছিল্য করতে পারবেন না। যদি তাঁরা আমাদের দেশের স্বল্প সরঞ্জামের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব ছবিকে বিচার করে দেখেন তবে অবাকই হবেন। তাই ত ওদেশের স্টুডিও মহলের বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্মিত হলেও এইটুকু ভেবেই মনটা খুশী হয়ে উঠেছিলো যে এতরকম সুযোগ-সুবিধা পেলে আমাদের দেশের

চলচ্চিত্রশিল্প কোনো অংশে অন্য দেশের পিছনে ত থাকতই না বরং ভাবের মহত্ত্বে, ধ্যানের গভীরতায়, কল্পনার ঐশ্বর্যে সকল দেশের সেরা হয়ে উঠতে পারত।

এই ট্যুরেই একাধারে ভিভিয়েন লে, ক্লার্ক গ্যাবেল, স্পেন্সার ট্রেসি, অ্যাডলফ মেঞ্জো, ক্যাথারিন হেপবার্ন, মিরনা লয়, রবার্ট ইয়ং, রবার্ট রিয়ন প্রমুখ তখনকার দিনের শীর্ষস্থানীয় শিল্পব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল। ওঁদের সুবিখ্যাত চিত্রসাংবাদিক ও সমালোচক H.H. Wollenburge -এর সঙ্গেও আলাপ হোলো। ওঁদের অমায়িক, সহজ ব্যবহার ও আপন করে নেওয়ার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেও মনে বেশী দাগ কেটেছেন ভিভিয়েন লে। তাঁর স্যুটিং-এর অবসরে একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছি, গল্প করেছি, আর সামান্য পরিচয়েই স্পর্শ পেয়েছি তাঁর প্রাচ্যমুখী গভীর মনটির। ভিভিয়েন একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাই ভারত সম্বন্ধে তাঁর নানান জিজ্ঞাসার যেন অন্ত ছিল না। চেহারার মধ্যেও কোথায় যেন ছিল ভারতের ধ্যান-মুখীনতার অতল রহস্য। বর্ণের অসামান্য জৌলুষকে গভীরায়ত করেছিল তাঁর দীর্ঘপক্ষ্ম দুটি কালো চোখের নিবিড় ইসারা।

আমাদের দেশের স্টুডিও সম্বন্ধে উনি অনেক কথা জানতে চাইলে আমি সলজ্জে বললাম, 'তোমাদের যে রকম সব ব্যাপার দেখছি আমাদের স্টুডিও মহল সম্বন্ধে তোমায় বলার বা জানানোর বিশেষ কিছু নেই। সে-সব ছেলেখেলার কাহিনী শুনলে তোমাদের হাসি পাবে।' উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত দুটি টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'এর জন্য এত কুণ্ঠা কিসের? ভারতবর্ষ শিল্পে, কাব্যে, গানে সকলের উর্ধ্বে। আর এত উর্ধ্বমুখী আকৃতি নিয়ে যে দেশের শিল্পী জন্মায় বাইরের বাধা তাদের বেশীদিন দাবিয়ে রাখতে পাবে না।'

ভোজনের শেষে ওদের fruit pudding-এর প্রশংসা করতে না করতেই উনি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা কমপ্লিমেণ্ট দিলেন, 'কিন্তু তোমাদের দেশের পিঠে পায়েসের কাছে এ পুডিং দাঁড়াতে পারে? ওদেশের পায়েসের সেই চালের সুঘ্রাণ আজও ভুলতে পারিনি।'

মাত্র কয়েকটি কথাতেই তাঁর সংবেদনশীল অন্তর, ভারতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিনয়-নম্র মনটিকে বড় আপনার মনে হয়েছিল। আর কোন এক অদৃশ্য গ্রন্থি নিয়ে মনটা তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন গাঁটছড়া বেঁধেছিল।

আর বোধকরি সেইজন্যেই মাত্র কয়েক বছর আগে ভিভিয়েনের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে মনটা এমন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল।

ওদেশের আরও দুটি দিনের স্মৃতি আজও আমার আনন্দের উৎস হয়ে আছে। একটি হচ্ছে ভারতের হাই কমিশনার শ্রী কৃষ্ণ মেনন আয়োজিত আমার সম্বর্ধনা সভা এবং ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ, অপরটি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্মাননা অনুষ্ঠান।

শ্রীমেননের অমায়িক সৌজন্য ও আদরে বিদেশ যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বদেশ হয়ে উঠেছিল। ১৫ই আগস্ট 'ইণ্ডিয়া হাউসে' ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়ল। বক্তৃতাদি বাদে ছিল শুধু আমারই গানের অনুষ্ঠান। গেয়েছিলাম—আমাদের যাত্রা হোলো শুরু।

গান জীবনে অনেক গেয়েছি। কিন্তু সেদিনের সেই আত্মহারা উল্লাসের অনুভূতি, আমার কাছে যেন একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সাত সাগরের পারে দাঁড়িয়ে গাইতে গাইতে মনে হয়েছিল, স্বদেশের সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে গেছে, আর আমার ভারতবর্ষের ত্যাগী নেতারা তাঁদের ত্যাগ ও তপস্যা ও আত্মবলিদানের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করে সেদিন অসংখ্য দেশবাসীর জন্য আনন্দের যে মহাসমূদ্র সৃষ্টি করেছেন সুদূর বিদেশ থেকে আমার গানখানিও যেন প্রার্থনার কল্লোল হয়ে সেই সমুদ্রেই মিশে যাচ্ছে। দূরে থেকেও আমার স্বদেশবাসীর সঙ্গে এক ও অভিন্নতাবোধে অন্তর পূর্ণ হয়েছিল। জন্মভূমিকে কে না ভালবাসে? কিন্তু অতি কাছে থেকে নিশ্চিন্ত নির্ভর স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় যে অনুভূতি সম্বন্ধে হৃদয় সচেতন থাকে না, দূরের থিতিয়ে যাওয়া আলোয় সেই অনুভূতিই যেন তার অপরূপ আবেশে প্রাণ-মন ভরে দেয়। হয়ত সেইজন্যই আপনাকে জানবার, চেনবার ও বোঝবার জন্য মাঝে মাঝে দূরত্বও অবশ্য প্রয়োজনীয়। মাতৃঅঙ্গ থেকে বিচ্ছেদ না ঘটলে ত মাকে দেখা যায় না। এই বুঝি বিধিনির্দিষ্ট অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

ভোজসভায় মিঃ মেনন আমার কাছে বসে কত যত্ন করে যে খাওয়াচ্ছিলেন যে কোনো আইটেম বাদ দেবার উপায় ছিল না। 'এটা একটু খেয়ে ভাখ, এরা করে ভাল'—'ওকি, ওটা যে টাচই করলে না, একটু চাখ অন্তত!' বলে নিজের খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চামচ করে সামনে রাখা কারীপট থেকে সবরকম খাদ্যবস্তু আমার পাতে সমানে ঢেলে যাচ্ছেন।

আমার জন্য বিশেষ ডিস্‌ হিসাবে বেশ কয়েকরকমের পুডিং করানো হয়েছিলো। কিন্তু দু-একটা খাওয়ার পর আর পেটে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। আমি চামচটা প্লেটের ওপর রেখে দুহাত জোড় করে বললাম, 'মিঃ মেনন, আর একটুও না—প্লিজ'।

'হ্যভ এ টেস্ট অ্যাটলিস্ট'—বলেই মিঃ মেনন পাহাড়ের মত উঁচু করে পুডিং প্লেটে ঢেলে দিলেন অ্যাত্ত্ত বড় পুডিং-এর টুকরো। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং হলশুদ্ধ লোকের হাসির রোলে সারা সভা যেন সচকিত হয়ে উঠল। এমনই আনন্দের হাটে ভোজসভা সাঙ্গ হোলো।

ওখানের গ্রামোফোন কোম্পানীর অধিকর্তা একদিন আমায় আমন্ত্রণ জানালেন ওঁদের স্টুডিওতে। যথাসময়ে গাড়ি এল। সঙ্গে এলেন স্বয়ং কর্তা। বললাম, 'ইউ আর টেকিং টু মাচ ট্রাবল ফর মি।' 'নট অ্যাট অল—ইউ আর আওয়ার আর্টিস্ট, অ্যাণ্ড ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু অনার ইউ।' ঐ 'আওয়ার আর্টিস্ট' কথাটি যেন এক ঝলক হাওয়ার আদরের মতই সারা হৃদয় জুড়িয়ে দিল।

তারপর বিরাট স্টুডিও গেটে গাড়ি পৌছতে না পৌছতেই—দেখি মস্তবড় এক পুষ্পস্তবক হাতে দাঁড়িয়ে ওখানেরই এক হোমরা-চোমরা অফিসার। এরপর পার্টি, গান, গাওয়া, ওদের কারখানা দেখা, উপহার গ্রহণ, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই যেন স্বপ্নের মাঝ দিয়ে কেটে গেল। আর কি ক্ষিপ্রগতি এদের কাজকর্ম। পরের দিন লাঞ্চের আগেই ওদের সঙ্গে তোলা প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের ছবির এক মস্তবড় অ্যালবাম—আরও একটি নানারঙা ফুলের তোড়ার সঙ্গে এসে হাজির। সঙ্গে কতরকমের কেক আর চকলেট। সুদৃশ্য একটি কার্ডে লেখা: 'উইথ বেস্ট কমপ্লিমেন্টস অফ গ্রামোফোন কোং টু দি কুইন অফ মেলডি।'

ওদেশ থেকে ফিরে যে দুটি স্বতন্ত্র ব্যানারে কাজ করেছি তার একটি হোলো সুধীর দাস প্রযোজিত এবং চিত্ত বসু পরিচালিত 'বাঁকালেখা'।

১৯৪৮ সালের মে মাসে ছবির কাজ শুরু হয়। ছবিটি মুক্তি পেল ঐ বছরই ১৯শে নভেম্বর। অন্য ছবিটি হোলো প্রণব রায় পরিচালিত 'অনুরাধা'। দুটি ছবির কোনোটি সম্বন্ধেই আমার বিশেষ বক্তব্য নেই।

এরপর আমি নিজের প্রোডাকশনে মন দিলাম। এ আমার কত দিনের আকাঙ্খা, কত রাতের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন দেখার শুরু কবে থেকে? সেই আমার বড় সাধের নিউ থিয়েটার্সে কাজ করবার সময় থেকেই। তখনই ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবতাম এমন দিন কি আসবে না যখন নিজেই এমন একটা কোম্পানী খুলে বসব যার প্রতিটি ছবিতে থাকবে সুন্দর কাহিনী, প্রাণকাড়া গান। প্রতিভাসমৃদ্ধ শিল্পী, সুরকার, কলাকুশলী, সবারই আত্মবিকাশের পূর্ণ অধিকার ত থাকবেই, সবার ওপর থাকবে স্বাধীনতা। কোথাও কোনো কর্তৃত্বের পীড়ন থাকবে না, থাকবে শুধু পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালবাসা। এই শক্তির জোরেই চলার পথের সব বাধা কেটে যাবে না কি?

কিন্তু স্বপ্ন যদি স্বপ্নই থেকে যায়? এ ভয়ও যে না হয়েছে তা নয়। কারণ খুব কম ক্ষেত্রেই স্বপ্ন ও বাস্তবে ছন্দের মিল দেখা যায়। তবু দেখাই যাক না চেষ্টা করে? জীবনের অনেক ক্ষেত্রের মত এখানেও ত অঘটন ঘটতে পারে। আর যদি তা নাও ঘটে স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেও কি নতুনতর প্রাপ্তির ক্ষতিপূরণ ঘটবে না? এ অভিজ্ঞতা ত অস্বীকার করা যায় না যে বিধাতাকে যখনই কঠিন কঠোর মনে হয়েছে তখনই কোনো-না-কোনো পথ বেয়ে নেমে এসেছে তারই করুণার ঢল?

এইরকম নানা আশ্বাসে মনকে চাঙ্গা করে নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম। আমার প্রোডাকসনের নাম দিলাম 'শ্রীমতী পিকচার্স'। কেন? এর কারণস্বরূপ গানের কলির মত ঘুরেফিরে সেই নিউ থিয়েটার্সের কথাটাই আসে।

আগেই বলেছি, কৃষ্ণচন্দ্র দে আমায় 'রাধে' বলে ডাকতেন। আর তারই সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রেখে পি এন. রায় ডাকতেন 'শ্রীমতী'। জীবনের গৌরবদীপ্ত যুগের একটি মধুর স্মৃতিকেই লালন করতে চেয়েছি বলেই হয়ত নিজের প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সময় ঐ নামটাই মনে এল।

অজয় কর (ক্যামেরাম্যান), বিনয় চ্যাটার্জি (সিনারিও রাইটার) আর আমাকে নিয়ে আমাদের সম্মিলিত ইউনিটের নাম হোলো 'সব্যসাচী' ইউনিট।

এই ছবিতেই অনুভাকে (ভবিষ্যতের স্বনামধন্যা অনুভা গুপ্ত) আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ রোলে নিয়েছিলাম। অনুভা প্রসঙ্গে এই কথাটা ভুলতে

পারি না যে প্রথম থেকেই ও আমায় শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসায় গ্রহণ করেছে, আমার প্রতিটি নির্দেশ মেনেছে আর হৃদয়ের একাগ্রতা দিয়ে. আমার কাজকে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা করেছে। 'অনন্যা' ছাড়া 'বামুনের মেয়ে'তেও ও কাজ করেছে এবং 'মহিলা-শিল্পী-মহল' (পরে এ প্রসঙ্গ আসবে) ও আরও অনেক ক্ষেত্রে অনুভার সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু কখনও মুহূর্তের জন্যও আমার প্রতি ওর আনুগত্য ও আন্তরিকতার, কোনো তারতম্য দেখিনি। যখন ও উঠতি আর্টিস্ট তখন ওর স্বভাবে ব্যবহারে যে নম্রতা ছিল ঠিক সেই নম্রতারই অপরিবর্তিত রূপ দেখেছি যখন ও শিল্পীখ্যাতিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত' বছরখানেক আগে যেদিন ও আমাদের সবাইকে ছেড়ে সব দেওয়া নেওযার বাইরে চলে গেল, তখন কানে বাজছিল ওর 'সেই বালিকাসুলভ মিষ্টি মিষ্টি কৈফিয়ত, 'কাননদি, রাগ কোরো না গো দুটি পায়ে পড়ি। আজ বা'ডতে হঠাৎ অনেক লোক এসে গেল. বলে রিহার্সালে আসতে দেরি হোলো।' এখনকার এমন অহং ভাবাপন্ন যুগে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি এমন আনুগত্যের কথা ভাবা যায়? আমার কাছে এতটা নত হবার ওর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু যে হয়েছিল সে. ওর নির্মল অন্তঃকরণের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার তাগিদ। এ সুকুমার সরল আচরণের স্মৃতি আজও মনকে ভিজিয়ে দেয়।

তারপর যা বলছিলাম। 'অনন্যা'র কাজ শুরু হোলো, শেষ হোলো এবং ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সগৌরবে মুক্তিপ্রাপ্ত হোলো। কিন্তু এই ছবিতেই সর্বপ্রথম সিনেমার ছবির উপর ট্যাক্স বসানোর দরুন আমাদের কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। তাছাড়া আমার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রোডাকসন ম্যানেজার প্রোডাকসন কস্ট যে উঁচু ধাপে উঠিয়েছিলেন— তার ফলে তাঁর লাভ হয়েছে প্রচুর, কিন্তু ক্ষতির মূল্য দিতে হয়েছে আমায়। তবে সান্ত্বনা এই যে 'অনন্যা'কে শিল্পরসিক ও সমালোচকবৃন্দ অত্যন্ত সমাদরেই গ্রহণ করেছেন।

আর 'অনন্যা'কে উপলক্ষ্য করেই আমার জীবনে এল পরম লগ্ন।

এই সময় টালিগঞ্জে নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলের থেকে আমার কাছে কিছু ডোনেশন দেবার আবেদন এল। আর ঐ প্রতিষ্ঠানেরই পুরস্কার বিতরণী সভায় তৎকালীন রাজ্যপাল ডঃ কাটজু এলেন সভায় পুরস্কার বিতরণ ও উদ্বোধন করার জন্যে। ডোনেশনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সভায় প্রধান অতিথি হবার:

আর রাজ্যপালকে অভ্যর্থনার দায়িত্বভার গ্রহণের সম্মতিও দিতে হোলো।

'অনন্যা'র স্যাটিং-এর পর গেলাম। ডঃ কাটজুর সঙ্গে আলাপ তো হোলোই, আলাপ হোলো তার Naval A. D. C. হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গেও। নিয়মমাফিক পরিচয়ের আগেই তাঁর দিকে চোখ পড়েছিল। না পড়ে পারে? কি বলব তাঁকে। রূপবান? পরম রূপবান? অসাধারণ সুন্দর? না, কোনো গতানুগতিক বিশেষণই এ ক্ষেত্রে ঠিক লাগসই হয় না। দেখলাম সকলের মাথা ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। ঋজু, সরল, ছিপছিপে। যৌবনের প্রাণবন্ত সৌন্দর্য সমৃদ্ধে ভরপুর। জমকালো ইউনিফর্ম ছাপিয়েও ফেটে পড়ছে তাঁর রঙের জৌলুষ। প্রশস্ত ললাট, চোখ দুটি খুব বড় নয় কিন্তু ভারী উজ্জ্বল আর বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর সপ্রতিভ চাউনী। আর এই রূপকে শাণিত করে তুলেছে তাঁর অসাধারণ স্মার্টনেস। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা এক টুকরো মিষ্টি হাসি কি সেই স্মার্টনেসকেই অলঙ্কৃত করে? চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে? না রূপে? বলতে পারি না?

তবে ফর্মালিটি অথবা লৌকিক শালীনতা বোধের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করেও অবাধ্য চোখ দুটির দৃষ্টি বার বার যেন ওঁরই ওপর পড়ছিলো। আর কি আশ্চর্য? যতবার তাকাচ্ছি দেখি উনিও আমার দিকেই চেয়ে আছেন। চোখাচোখি হতে উনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমিও। বেশ কয়েকবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল। আর সকলের অলক্ষ্যে দুজনের চুরি করে দেখাটা দুজনের কাছেই বারবার ধরা পড়ে যাচ্ছিল। লজ্জার মধ্যেও এক অ জানা পুলকে মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অপরাধটা তাহলে আমার একার নয়। এ অপরাধের আর একজন ভাগীদারও আছেন। একথাটা মনে হতেই —কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়—'বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।' নাটকীয় মনে হলেও আরও একটা অকপট সত্যকথা না বলে পারছি না, ঠিক এই মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথের 'ওগো সুন্দর চোর' চরণটি মনের মধ্যে গুন-গুন করে ফিরছিল।

এই হোলো আমাদের প্রথম দেখার অধ্যায়।

বাড়ি ফিরলাম। কাজ-কর্ম সবই চলছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে ভেসে উঠছে একটি রূপ। রাজবেশের মত জমকালো পোশাকের এতটুকু অবকাশে ফুটে ওঠা গোলাপী আভার রং, মিষ্টি হাসি, ক্ষিপ্র সপ্রতিভ

গতিভঙ্গি—আর সেই 'চুরি করে দেখা।' সব কাজেই কেমন একটা অন্য-মনস্কতা এসে যাচ্ছে, আর মনের অতলে উঁকি দিচ্ছে একটা প্রশ্ন, 'আর একবার দেখা হয় না?' কি আশ্চর্য যোগাযোগ! বিধাতা যেন আমার মনের ইচ্ছেটা পূর্ণ করবার জন্যই হঠাৎ কল্পতরু হয়ে উঠলেন।

কারণ, ঘটনার কিছুদিন বাদেই উনি একদিন এলেন গভর্নমেণ্ট হাউসেরই একটা ফাংশনে গান গাইবার অনুরোধ নিয়ে—আমারই মত হৃদয়ের গোপন তাগিদে নয় ত—যাই হোক, তখন চোখে দেখার সূচনাটা বিলম্বিত লয়ের আলাপে পৌঁছল।

তারপর 'অনন্যা'রই স্যুটিং-এর একটা লোকেশন ছিল পলতায়। কিন্তু তার জন্য গভর্নমেণ্টের কোনো পদস্থ কর্মচারীর পারমিশন দরকার। তখন আমায় সবাই ধরলেন হরিদাস ভট্টাচার্য এ বিষয়ে যথাযোগ্য সাহায্য করতে পারেন কারণ তিনি স্বয়ং গভর্নরের এ-ডি-সি আর তাঁর সঙ্গে ত সেদিন আলাপই হয়েছে। অতএব এ সুযোগ…ইত্যাদি ইত্যাদি। মুখে বললাম 'দেখি চেষ্টা করে' কিন্তু কাউকে জানতে দিইনি এই রকম কোনো সুযোগের প্রতীক্ষায় মনটা কিভাবে উৎকণ্ঠিত রয়েছে, আর—এ সুযোগ পেয়ে মনের ভেতর কি দ্রুতলয়ের নৃত্যের মাতন শুরু হয়েছে।

সুযোগের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতে একটুও দেরি হোলো না। মিঃ ভট্টাচার্য শুধু ব্যবস্থাই নয়, সব কিছুরই অত্যন্ত সুব্যবস্থা করে দিলেন, নির্বিঘ্নেই সকল কাজ সুসম্পন্ন হোলো।

এরপর হঠাৎই একদিন ফোন বেজে উঠল—একটি মধুর কণ্ঠের প্রশ্ন 'কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?' ওকে বললাম, 'বোধহয় পারছি'—কিন্তু মনে মনে বললাম, 'ও কণ্ঠ আমি লক্ষ লোকের মধ্যেও চিনে নিতে পারি।'

এরপর আস্তে আস্তে ফোনের মাত্রাও বেড়ে চলল। প্রথমে মাঝে মাঝে, তারপর প্রতিদিন—ক্রমশঃ একদিনে অনেকবার। আসা-যাওয়াও চলতে থাকে সমান ছন্দে। এর ব্যতিক্রম হলেই মনটা উদাস হয়ে যেত ঐ গভর্নমেণ্ট হাউসের পথেই। দেখা হলে খুব একটা আবেগভরা রোমান্টিক কথাবার্তা হোতো—তা নয়। কিন্তু ওঁকে দেখলেই কর্মক্লান্ত মনের বিরসতা উবে গিয়ে সে কোন এক মধুরতায় সারা মন ভরে যেত। ঐ কয়েকটি মুহূর্তের জন্যই তৃষিত মন যেন উন্মুখ হয়ে থাকত।

কি একটা কারণে একদিন দুজনেই ব্যস্ত থাকায় পুরো একদিন ফোন-

যোগে কথা বা দেখা হয়নি। পরদিন উনি ফোন করতেই বললাম, 'কাল মনটা বড্ড খারাপ হয়েছিল। অনেক রাত অবধি ঘুম আসেনি।' ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল 'আমারও।'

'সত্যিই'?

'সত্যিই'। তারপর কিছুক্ষণের নীরবতার পরই কানে এল সেই পরিচিত মিষ্টি কণ্ঠের সুস্পষ্ট উচ্চারিত কটি কথা, 'তাই ভাবছিলাম এত কষ্ট করবার কি দরকার?'

'তার মানে?'

'দেখাশোনার ব্যবস্থাটা ত' পাকাপাকি করে নিলেই হয়।'

একটা অনির্ণেয় আবেগে সারা শরীর কেঁপে উঠল—গলাও বুঁজে এল। কোনো রকমে শুধু বলতে পারলাম, 'সেই ভালো।'

এ আলোচনার পর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হয়ে গেল। কিন্তু তাও কি বিনাবাধায়? রেজিস্ট্রেশনপর্ব নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হোলো। কিন্তু আমাদের দুজনের, বিশেষ ক'রে মিঃ ভট্টাচার্যের মত ছিল—'কালির স্বাক্ষরে ক্ষতি নেই। কিন্তু দুটি জীবনের মহামিলনের এই পুণ্যলগ্নটি বাঁধা থাক হিন্দুপ্রথার বিবাহডোরে।'

সত্যি কথা বলতে কি, একটি ইচ্ছের মধ্যেই যেন আমার কাছে মানুষটির অন্তর চকিতদ্যুতির মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বর্ষারাতে নিকষ কালো আকাশের বুকে আলোর চমক-লাগানো বিদ্যুতের মতই। আগেই বলেছি মধুর আলাপের কোনো প্রকাশ্য ছন্দে আমাদের মধ্যে হৃদয়বিনিময় হয়নি। তার কারণ হলো ওঁর অনুচ্ছ্বাসী চাপা স্বভাব, যার ফলে বাইরের লোকেরা খুব সহজেই ওঁকে ভুল বুঝতেও পারে, ভাবতেও পারে উন্নাসিক, ফর্মাল—এমন কি বেরসিকও।

কিন্তু ওঁর একটু কাছে যে এসেছে—তার কাছে ভেতরটা স্বচ্ছ হতে দেরি হয় না! সবাই ওঁকে বলত 'সাহেব'—শুধু রং ও চেহারার জন্যই নয়। কেতাদুরস্ত নিখুঁত আদবকায়দার চালচলনের জন্যও। এটা ওঁর স্বভাবগত তো বটেই, মজ্জাগতও। পদস্থ সরকারী কর্মচারী হওয়ার দরুন সাহেবমহলে কর্মক্ষেত্রের অনেকটাই প্রসারিত ছিল বলে মানুষটা চলতি কথায় যাকে বলে এমন সাহেবী চালচলনসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আপন দেশ ও ধর্মের প্রতি ওঁর কত অবিচল নিষ্ঠা আর ঐকান্তিক অনুরাগ

সেটা বোঝা গেল ঐ একটি কথায়—'অগ্নিসাক্ষী করে নারায়ণশিলা সাক্ষ্য রেখে যদি দুটি হৃদয় পরস্পরকে গ্রহণ না করে তাহলে বিবাহ কথাটার কোনো মানেই হয় না।' গহন বনের ঘন ঝোপের আড়ালে সবার অলক্ষ্যে ফুটে-ওঠা, নাম-না-জানা এক ঝলক ফুলের গন্ধের মতই ঐ কটি কথার সৌরভে যেন মনটা ভরে উঠল।

রেজিস্ট্রেশনের ঠিক পাঁচ দিন কি সাত দিনের মধ্যেই ছিল এই হিন্দুমতে বিবাহ। কিন্তু ঠিক তার আগের দিন প্রবল জ্বরে উনি প্রায় অচৈতন্য। বিয়ের দিনও টেম্পারেচার ছিল ১০৩। উঠে দাঁড়ানো ত দূরের কথা বসবার ক্ষমতাও ছিল না। সেইজন্যই আমি চেয়েছিলাম দিনটা পিছিয়ে যাক, যতদিন না উনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু উনি কোনো কথা শুনবেন না। ওঁর ঐ এক কথা—'শুভস্য' শীঘ্রম। আয়োজন যখন সম্পূর্ণ আর একদিন, এক মুহূর্তও দেরি নয়। সে জ্বরই হোক আর যাই হোক। (পরেও দেখছি জীবনের সব ক্ষেত্রেই ওঁর ঐ একই নীতি, কোনো সিদ্ধান্তে একবার পৌঁছলে তার আর নড়চড় হয় না।) ডাক্তার, পুরোহিত—সবাই বললেন, অসুস্থ শরীরে একেবারে উপবাস থাকাটা অনুচিত, কিছু খাওয়া দরকার, এবং এটা প্রথাবিরোধী নয়। কিন্তু পূর্ণ উপবাসের সঙ্কল্প থেকে কেউ ওঁকে টলাতে পাবেনি।

ঐদিন এবং বিবাহলগ্নে আমার একাধারে বান্ধবী ও শিক্ষিকা, শ্রীমতী বীণা দেবী সেন ও তাঁব স্বামী ডাঃ আর. এন. সেন অক্লান্ত সেবা, সাহচর্য, চিকিৎসা ও সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা দিয়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়ে, আমাদের দুজনকেই চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। এ ঋণ অপরিশোধ্য।

ঐ দিন প্রতি মুহূর্তে ডাঃ সেন রোগীর কাছে বসে তার প্রতি লক্ষ্যই শুধু রাখেননি, প্রয়োজনীয় ইনজেকশন দিয়ে ট্যাবলেট খাইয়ে শোওয়া মানুষটাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে তবে ছেড়েছেন। বিবাহের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পরও অতন্দ্র প্রহরীর মত আমার সঙ্গে তিনিও রোগীর শিয়রে বসে থেকেছেন আর—বারবার হাতটি ধরে পাল্‌স পরখ করেছেন—সজাগ থেকেছেন—রোগীর অবস্থা যাতে কোনোরকম শঙ্কার দিকে না যায়।

বিবাহলগ্নটি সঙ্কটমুক্ত হতে পারেনি, তবু সেই মুহূর্তেই চিত্ত যেন পুণ্যস্নান করে উঠল। ছবির মত আজও দেখতে পাই দীপ্ত তেজে আগুন

জলে উঠেছে যেন মর্তের অতল হতে তেজ ও বিভায় উঠে এসেছে অগ্নি-দেবতা স্বয়ং, আর তারই দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর দাহে দেহ, মন, প্রাণ সব যেন শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের কাব্যসৌন্দর্য আর ব্যঞ্জনার গভীরতায় চারিদিকের অতিজানা বাস্তব পৃথিবীটা অবাস্তব স্বপ্নলোক হয়ে উঠেছিল। পুরোহিতের উচ্চারিত 'যদেদং হৃদয়ং তব, তদেদং হৃদয়ং মম'-র প্রতিটি কথা জীবন্ত হয়ে উঠ্‌ছিল, আর তার পরম ভাবকে শুনছিলাম ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে দিয়ে নয়, তার অন্তরালের নিঃশব্দতার মধ্য দিয়ে। এ নীরবতার ছন্দ সেদিন রাতেই হৃদয়ে বেজে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরটায় কি যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেল।

মনে হোলো মুক্ত নীল আকাশের হাজার তারা, বনবনান্ত, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল যেন নিবিড় স্তব্ধতায় এই মিলনের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর মনের মধ্যে অশ্রান্ত নূপুরের মত ধ্বনিত হচ্ছিল 'যদেদং হৃদয়ং তব।' পূজোর নৈবেদ্যর মত পরস্পরকে দান ও গ্রহণের এমন মর্যাদামণ্ডিত রীতি—হিন্দু বিবাহ ছাড়া আর কোনো বিবাহেই বুঝি নেই।

একবার চাইলাম ওঁর মুখের দিকে। সে যন্ত্রণাকাতর, ক্লিষ্ট মুখ আজও আমায় পীড়া দেয়। আগুনের আভায় সারা মুখ রক্তবর্ণ, সারা কপাল, মুখ, গাল, চিবুক ঘামে ভেসে যাচ্ছে। আমি হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে চমকে উঠলাম, 'ও পড়ে যাবে না ত? জ্বরের যন্ত্রণা ও উপবাস ঐ শরীরে যদি না সয়?' পিছনে দাঁড়ানো বীণা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'অত বিচলিত হোয়ো না, কোনো ভয় নেই। ডাঃ সেন ওঁর পিছনেই আছেন। শেষ হতে আর বেশী দেরীও নেই। তুমি পূজোয় মন দাও।'

ঈশ্বরের কৃপায় শুভকাজ সম্পন্ন হোলো। বিবাহান্তে বাসরে গিয়ে একটু সুস্থির হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল সেই মিষ্টি হাসি—আর একটি কথা, 'অগ্নিসাক্ষী রেখে, মালাবদল করে বিয়ে না করলে —বিবাহ—কথাটার কোনো মানে হয় না।' তারপরই ডাঃ সেনের দুটি হাত ধরে বললেন, 'কিন্তু আপনি না থাকলে অগ্নিসাক্ষী ত দূরের কথা, বিয়ের পিঁড়ি অবধি পৌঁছতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'যাঁর কাজ তিনিই ঠিক করিয়ে নেন, মিঃ ভট্টাচার্য, আমরা নিমিত্ত মাত্র', বললেন ডাঃ সেন।

১৯৪৩ সাল থেকে এই দম্পতীর সঙ্গে আমার পরিচয়। ওঁর সঙ্গে

প্রথম সম্পর্ক ছিল শিক্ষিকা ও ছাত্রীর। আমায় পড়াতেন, আর কত যত্ন করে, দরদভরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প করতে করতেই নানা বিষয়ে আমার দৃষ্টি খুলে দিতেন। মনে পড়ে একদিকে পড়ে থাকত আমার স্টুডিও ডায়লগের খাতা, অন্যদিকে substance-writing, translation-এর খাতা। কোনোদিন যদি কোনো টাস্ক-এ এতটুকু অবহেলা করেছি, বকুনীর সীমা-পরিসীমা থাকত না।

এই শিক্ষিকা-ছাত্রীর সম্পর্কই পরে গভীর সখিত্বে রূপান্তরিত হয়। তারপর থেকে সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে উভয়েই উভয়ের বন্ধু হয়ে উঠেছি। অনেক ঝগড়া হয়েছে মনোমালিন্যও ঘটেছে। কিন্তু বন্ধুত্বের বাঁধন আজও শিথিল হয়নি।

নানান দ্বন্দ্ব ও শঙ্কার ঝড়-তুফান এবারও যে মনকে বিপর্যস্ত করেনি তা নয়। নিন্দুকের রসনার বিষ, ঈর্ষার নির্লজ্জ আক্রমণ, সঙ্কীর্ণমনার পরশ্রী-কাতরতা উদ্দাম হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। তাঁদের শুধু খবরটুকু পাবারই অপেক্ষা ছিল। রূপান্বিতা, গুণান্বিতা বিবাহযোগ্যাদের পিতামাতারা ত আমার সীমাহীন আস্পর্ধায় ক্ষেপেই আগুন। এমন লোভনীয় রাজপুত্রতুল্য পাত্র কিনা হাতছাড়া হয়ে গেল সামান্যা এক চিত্রাভিনেত্রীর জন্য? কি আছে ওর? রূপ? মরি, মার, মেকআপের প্রসাদে আর শাড়ি গয়নার দৌলতেই যা চটক? অমন মহার্ঘ সাজ-সজ্জার সুযোগ পেলে রূপবতী হয়ে উঠতে মেয়েদের এক লহমাও দেরি হয় না।

ছিদ্রান্বেষী নিষ্কর্মার দল—এবারে রুচিবিগর্হিত পত্রিকা হয় ত বার করেন নি। কিন্তু অশ্লীল কার্টুনের হীন ইঙ্গিতে হৃদয়ের জ্বালা ছড়িয়ে দিতে ওঁদের একটুও দেরী হয়নি।

বিজ্ঞম্মণ্যরা গোঁফে চাড়া দিয়ে গম্ভীর মুখে রায় দিলেন, একজনের রূপের চটক আর অর্থ, অন্যের রূপ ও পদমর্যাদার মোহজাত মিলনের এই মায়ামহল নিশ্চিহ্ন হোলো বলে। এ হোলো দেহতৃষ্ণা প্রদক্ষিণ করা, স্ফুরৎ বিভা আলেয়ার আলো। কামনামদির প্রতিশ্রুতির স্বধর্মই হোলো ভাকা, রঙিন উৎকোচে প্রলুব্ধ করা। কিন্তু সে যে বুদ্বুদের মতই ক্ষণস্থায়ী, এ খবর কে না জানে?

এসব কথায় বুক যে কেঁপে ওঠেনি, দ্বিধায় মন যে কখনও সঙ্কুচিত হয়নি, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি কই? তবে পদে পদে ঘাত,

প্রতিঘাত, বিরোধিতা অতিক্রম করে চলতে চলতে মনটা শুধু সহনশীল নয়, কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাই এসব বিপত্তির আঁচ প্রাণকে যদি বা স্পর্শ করত, মনকে একেবারেই ছুঁতে পারত না। শুধু বারবার ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করতাম, 'শক্তি দাও প্রভু, অভিজ্ঞের ছদ্মবেশে এইসব অপদেবতাদের অমঙ্গল কামনার আক্রমণ থেকে আমাদের এই নির্মল সুন্দর আত্মসমর্পণকে রক্ষা কোরো।'

কিন্তু বাইরের বাধাকে দাবিয়ে রাখলেও মনের অতলে লুকিয়ে থাকা ছায়াচরের মতো হাজারো অন্তর্দ্বন্দ্বের উতলা বেদনা মনকে কি কাতর করেনি? এ যন্ত্রণার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সময় লেগেছে অনেক। কত একলা মুহূর্তের চোখের জল বিনিদ্ররজনীর চিন্তা, প্রতি-দিনের নীরব পর্যবেক্ষণ ব্যয়িত হয়েছে একটা নিশ্চিত বোঝাপড়ায় পৌঁছতে।

কেবলই ভেবেছি খুব অল্পদিনের পরিচয়কে ঝোঁকের মাথায় এতবড় দায়িত্বের বাঁধনে বেঁধে ভুল করলাম না ত? পূবরাগের স্বাদ পেতে না পেতেই লাফিয়ে উঠে সে স্বাদকে কায়েম করতে গিয়ে একূল ওকূল দুকূলই যদি হারাতে হয়? আমার পূর্ব জীবনের সব কটি পাতাই ত ওঁর কাছে খোলা। কিন্তু আমি ত ওঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। একেবারে কিছুই না জেনেশুনে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ার এই দুঃসাহস পেলাম কোথা থেকে? এ কি রোমান্স-পিয়াসী মনের অজানাকে আলিঙ্গনের ব্যাকুলতা? রূপ ও পদমর্যাদার মোহ? নিঃসঙ্গ জীবনের সান্নিধ্য-উন্মুখতা? না, অনিশ্চিত জীবনের নিশ্চিত নিরাপত্তার নীড় খোঁজা?

আমার চিরদিনের সৌন্দর্যব্যাকুল মনের রূপমুগ্ধতা অস্বীকার করব না। চিরচলিষ্ণু ঢেউয়ের কুলমাতানো ফেনকিরীট চোখকে আকর্ষণ করে,—প্রাণকেও মাতায়,—কিন্তু মন যে চায় মহাসমুদ্রের নিস্তরঙ্গ শান্তি, উদার স্বপ্নভরা আরাম-কুঞ্জ, বিরামনিলয়? সে স্বপ্ন যদি ভেঙে যায় তবে সংসারের অকরুণ হাটের নির্মম পরিহাস আর লজ্জার গ্লানি বইব কেমন করে?

এমনই নানান অনিশ্চিত পরিণতির আশঙ্কায় শঙ্কিত প্রতিটি দুঃসহ মুহূর্তের আঁচে নিজে দগ্ধ হয়েছি, কিন্তু ওঁকে জানতে দিইনি। তবু মাঝে মাঝে এ দ্বন্দ্বের ছিটেফোঁটাও প্রকাশ হয়ে পড়ত না কি?

যাকে বলে হাই সোসাইটির 'নায়ক' ছিলেন তখনকার মিঃ ভট্টাচার্য।

প্রায়ই ওঁর কোন আসত অজস্র বান্ধবীদের কাছ থেকে। রঙ্গ, রহস্য ও শাসন-প্লাবিত সেইসব কটাক্ষের রঙ্গভরা জবাবই শোনা যেত। তাঁরা শাসাতে ছাড়তেন না, সখীপ্রাচুর্যের নন্দনকানন ছেড়ে একেশ্বরী দ্বীপে নিজেকে বন্দী করার অহঙ্কার বেশীদিন থাকবে না। মায়াবিনীর ছলনার জাল একদিন ছিন্ন হবেই—শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতেই হবে সেই চেনামহলের আশ্রয়ে। তখন দেখব বীরবরের কত গুণপণা, কত বীরত্ব। দুঃসাহসের বড়াই কত থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। উনি হেসেই উত্তর দিতেন, 'আগে জাল ত ছিড়ুক, তার পরের কথা না হয় পরেই ভাবা যাবে।'

আমার বিষণ্ণতা দেখে হেসে বলতেন, 'কি অমনই মন খারাপ হয়ে গেল? যে জিনিসের কোনো মূল্যই নেই, তাকে অত মূল্য নাই দিলে।' মেঘ কেটে খুশীর আকাশ উঠত ঝলমলিয়ে।

কিন্তু সে আলো ম্লান হয়ে যেতেও দেরি হোতো না। নিরালা মুহূর্তে আবার মনে ঘনিয়ে উঠত আশঙ্কার অন্ধকার। কতদিন ওঁর ঘুমন্ত, প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছি এ প্রসন্নতা চিরদিন অম্লান রাখতে পারব ত? যদি দুজনের এ আকর্ষণ শুধুই চোখের মোহ হয়? মিলনতৃষা শান্ত হলে দুজনেই যদি দুজনের কাছে ফুরিয়ে যাই?

কিন্তু চিন্তাক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত মন একদিন নিজেই যেন নিজেকে ভৎর্সনা করে ওঠে, জীবনের এতবড় আনন্দলগ্ন এমন অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যর্থ হতে দিতে আছে? ছিঃ! জীবনেব প্রথম প্রেমের উন্মাদনাকেও ত থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল এমনই হাজারটা যুক্তি, তর্ক, দায়িত্বজ্ঞানের বিধিনিষেধের জোরে। কিন্তু কি হোলো? সাবধানী মনের বিচারবুদ্ধি, হিসেব-নিকেশ, অঙ্গীকার শপথের শাসনে তাকে কি বেঁধে রাখতে পেরেছিলাম? যা অনিবার্য তা ঘটবেই। কেউ তা রোধ করতে পারে না। কতদিন স্তব্ধ রাতে কানের কাছে কেউ কি বলেনি, কূল পেতে হলে আগে ঝাঁপ দিতেই হয় অকূলে? সংসারে বুদ্ধির একটানা নির্দিষ্ট পথে চললে নানা সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য লাভ হয় সত্য, কিন্তু তাই বলে কি কখনও আভাস পাইনি যে কাটাছাঁটা মাপাজোপা, বাঁধাধরা জীবনের পারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করার মধ্যে যে সার্থকতা নিহিত সে এসবের অনেক ওপর?

একথা বললে কি সত্যের অপলাপ করা হয় না যে শুধু মানুষটার রূপের আকর্ষণেই আপনাকে তাঁর কাছে সঁপে দিয়েছি? ওঁর রূপের

আড়ালের ব্যক্তিত্বও কি কিছু কম আকর্ষণীয়? ব্যক্তিত্বহীন রূপ ত গন্ধহীন ফুলের মতই ব্যর্থ। কল্পিত আশঙ্কায় মনের শক্তি ক্ষয় করবার সময় কি আর আছে?

এরপরই চিন্তার ধারা গেল পাল্টে। চলল মানুষটার অন্তরে প্রবেশের তপস্যা। কি সে চায়? কেমন তার ভাবনার ধারা? কি তার ধ্যান, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা? কেমন করে তার চাওয়ার সঙ্গে আমার দেওয়ার ছন্দ মেলানো যায়?

কিন্তু এ প্রয়াসও যে একদিনেই সার্থক হয়েছে তা নয়। হোঁচট খেতে হয়েছে প্রতি পদেই। দেখেছি দুজনের রুচি, প্রকৃতি, পছন্দ, অপছন্দে হয়ত মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী। কিন্তু তবুও যে আমাদের সম্পর্কটা গোঁজামিল হয়ে দাঁড়ায় নি, তার কারণ দুজনের যথার্থ বোঝাপড়ায় কোনো খাদ নেই।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা দরকার।

যেমন সবজির বাগানের ওঁর ভারী শখ কিন্তু আমার শখ ফুলের বাগানের। ওঁব কপি, বেগুন, আলু, লাউডগা আর কুমড়োপ্রীতি নিয়ে আমি কত ঠাট্টা করেছি। উত্তবে উনি বলেছেন—'উদর পরিতৃপ্ত না থাকলে ফুলের গন্ধ উপভোগ করবে কে?'

আমার গান, ঘর সাজানো, বাগানের পরিচর্যা, কিউরিও অথবা অন্যান্য শখশৌখিনতায় ওর উচ্ছ্বাস না দেখে আহত হয়েছি। কিন্তু তাই বলে ত একদিনও ওঁকে সৌন্দর্যবিমুখ স্থূল প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়নি? আমি যে দেখেছি অনেক সময় কত আকর্ষণীয় আমোদ আহ্লাদের প্রলোভন অনায়াসে উপেক্ষা করে রাশি রাশি বই নিয়ে ওকে একাগ্রচিত্তে পাঠের মধ্যে তলিয়ে যেতে। একনাগাড়ে চোদ্দ পনের ঘণ্টাও বই-এর মধ্যে ডুবে থাকতে দেখেছি। এক শুদ্ধ চিন্তার রাজ্যের বাসিন্দা যেন! সেই পাঠরত জ্ঞানপিপাসুকে কত যে মুগ্ধ হয়ে দেখেছি, উনি জানতেও পারেননি।

কোনোদিন কাব্য করে কোন ভালবাসার কথা বলে উনি আমার অন্তর ভরে দেননি সত্য, কিন্তু দেখেছি আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে দিনের পর দিন কি উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতায় নিজের হাতে ফ্রিজ থেকে চিকেন বার করে রান্নাঘরে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রাঁধুনীর দিকে লক্ষ্য রাখতে, যাতে রোগীর উপযোগী পরিচ্ছন্নতায় পথ্য প্রস্তুতে ত্রুটি না হয়।

কোনো সাড়ম্বর সমাচারে আমার প্রতি ওর আগ্রহ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু আমার মার মৃত্যুর সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন, সারারাত জেগে শ্মশানে থেকেছেন, আর দিনের বেলার অতিপ্রয়োজনীয় আরাম বিশ্রামকে অনায়াসে অবহেলা করে বাড়িতে শোকগ্রস্ত প্রতিটি জনের তদারক করেছেন।

আমার কল্পনাপ্রবণ মনের অনেক স্বপ্ন, আদর্শ হয়ত বা উনি ভাব-বিলাসিতা বলে মনে করেন, কিন্তু দেখেছি এই স্বপ্নকেই অনাহত রাখার ওর ব্যাকুলতার সীমা নেই। কঠিন বাস্তবের অনেক কঠিন তথ্য ওর জানা আছে বলেই অনেক ক্ষতি, অনেক ঝড়ঝাপ্টার সঙ্কট থেকে উনি আমায় মুক্ত রেখেছেন। কত বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও কর্মশৃঙ্খলা দিয়ে বিষয় ও কর্মক্ষেত্র সামলেছেন। অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য আমায় যাতে বিপন্ন হতে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। মানুষকে অবিশ্বাস করতে বলেননি, কিন্তু বিশ্বাসটা যাতে অপাত্রে না পড়ে সে বিষয়ে সাবধান করে আমায় কত সঙ্কট থেকে বাঁচিয়েছেন। 'আমি নিজে ঠকব না, অপরকেও ঠকাব না', ওর এই নীতি মেনে সংসারের অনেক ক্ষেত্রে আমার লাভের অঙ্কই মোটা হয়েছে।

আর সারা চিত্ত ভরে উঠেছে ওর মা, বাবার ওপর—দেবতার মত ভক্তি, নিষ্ঠা, ও সেবাপরায়ণতা দেখে। আজও একদিন যদি মা বাবার কাছে যেতে না পাবেন অথবা কোন বিভ্রাটের দরুণ যোগাযোগ করতে না পারেন, অমন উচ্ছ্বাসহীন মানুষটাও শিশুর মত অধীর হয়ে ওঠেন।

অনেক দিনের অনেক সংঘাতের মাঝেও এই সত্যই স্বচ্ছ হয়েছে যে নিছক হাল্কামোর পাল তুলেই উনি দাম্পত্যজীবনের তরী ভাসাননি। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞ দৃঢ়তায় হাল ধরে তরী সামলাবার ক্ষমতাও রাখেন।

আর যে সত্যটি উপলব্ধি করে ভারী তৃপ্তি পেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন ফুলের মতই বিভিন্ন মানুষেরই আছে নিজস্ব প্রকাশের ছন্দ, ফুটবার ধরণ, আছে দেওয়ার গতি, নেবার ভঙ্গী। তাকে ফোটবার অবকাশ দিতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়। ধৈর্য হারালে চলে না। তার যথার্থ প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা না করে বাইরের এতটুকু ক্ষতির তুচ্ছতায় বিচলিত হলে লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশী। আর অনেক সময় এই

টিকে ভুলের জন্যই জীবনের অনেক বড় সম্পদ থেকে আপনাকে বঞ্চিত হতে হয়।

আমাদের চাওয়ার মধ্যে কখনও কোনো আশাভঙ্গের বেদনা আসেনি তা নয়, আমাদের মতান্তরও আছে প্রচুর, আছে প্রকৃতিগত বৈষম্য। কিন্তু এ সবকে ছাপিয়েও বড় হয়ে উঠেছে আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাসের মিল, আদর্শের মিল, শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মিলন। বাইরের নানান ঘটনায় দুজনের প্রতিক্রিয়ার রং ও রূপ ভিন্ন হতেও পারে। কিন্তু আপাতবিরোধী রঙের উৎস নিখাদ নিরঞ্জন সরল সততার শ্রদ্ধায় আমরা এক ও অভিন্ন।

আরও একটি বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বোঝাপড়া ছিল। সেটি হোলো এই যে কোনোদিন অতীতের কোনো প্রসঙ্গ তুলে আমরা কেউই বর্তমানের শান্তধীর জীবনে চাঞ্চল্য বা অশান্তির আবর্ত সৃষ্টি হতে দেব না। এ শর্ত উনি কোনোদিন, কোনো কারণে ভাঙেননি। ওঁর শালীনতা-মার্জিত মনের এই সংযমকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আমাদের সম্পর্ক অনেক ঝড়ঝাপটায় কখনও টলমল করে ওঠেনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু পর পর চব্বিশ বছর ত কেটে গেল। কোনদিন কেউ কাউকে ছাড়ার কথা ভাবতে পারিনি।

এই মিলনই বুঝি সেই অগ্নিসাক্ষী করা হিন্দু বিবাহের দান।

বিবাহের কিছুদিন বাদেই উনি এ-ডি-সির কাজ ছেড়ে দিয়ে বার্ড কোম্পানীর এক দায়িত্বপূর্ণ কাজে যোগ দিলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাই। অনেকেরই ধারণা এই বিবাহের কারণেই গভর্নমেণ্টের অতবড় কাজ তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত।

বিয়ের পরও বেশ কিছুদিন উনি এ-ডি-সির পদে বহালই শুধু ছিলেন না, ডঃ কাটজুর সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিল। মনে পড়ে কতবার তাঁর সস্নেহ আহ্বানে আমরা রাজভবনে গেছি, একসঙ্গে চা খেতে খেতে কত গল্প করেছি। আমার স্বামী ওঁর সঙ্গে নানা জায়গায় গিয়ে মুভিতে যেসব ছবি তুলেছিলেন প্রজেকটারে সেইসব দেখাতে উনি ছেলেমানুষের মতই খুশী হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের কত আশীর্বাদ করেছেন, সব বাধাকে কাটিয়ে উঠে আমাদের পরস্পরের বাঁধন যাতে অচ্ছেদ্য হয় তার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

এ-ডি-সির চাকরি ছাড়ার কারণ আর কিছুই নয়। দিনের বেলা প্রায় সমস্তক্ষণ ছাড়াও রাত্রের অনেকটা সময় এবং প্রয়োজন হলে রাত্রেও ওঁকে মাঝে মাঝে বাড়ি ছেড়ে থাকতে হোতো। অবিবাহিত জীবনে যে কাজ করা সহজ, গৃহী লোকের পক্ষে নানা কারণেই সে কাজ সম্ভব হয় না। তাছাড়া বাড়িতে আমি একা। খানিকটা সেই কারণেও এ চাকরি করা ওঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বার্ড কোম্পানীর সঙ্গে ও ওঁর মনোমালিন্য ঘটল অল্পদিনের মধ্যেই। যে পোস্টে প্রোমোশন দিয়ে কর্তৃপক্ষ ওঁকে রেঙ্গুন পাঠাতে চাইলেন, ওঁর আগে সেই পোস্টে শুধুমাত্র ইউরোপীয়ানরাই বহাল ছিলেন। কিন্তু তখনও শাদা চামড়ার সঙ্গে কালা আদমীর তফাতটা ছিল প্রবল। (একথা দিয়ে আমি একেবারেই কিন্তু কবুল করছি না যে কালা আদমী বলতে যা বোঝায় উনি তাই।) তাই ঐ পদের জন্য মনোনীত এক ভারতীয়কে সে দক্ষিণা দিতে তাঁরা রাজী নন, যে দক্ষিণা দিতেন শাদা চামড়ার অধিকারীকে।

উনি চিরকালই একরোখা এবং স্বাধীনচেতা মানুষ। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটারের সঙ্গে এই নিয়ে ওঁর তুমুল বচসা চলে। রেঙ্গুনে উনি ছেলেবেলা থেকেই মানুষ, শিক্ষাদীক্ষাও ওখানেই। রেঙ্গুনের সংসারনির্বাহের মহার্ঘতা সম্বন্ধে ওঁর অভিজ্ঞতা ছিল। সে সম্বন্ধেও উনি উল্লেখ করেন এবং এ প্রশ্নও তোলেন ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান ইউরোপীয়ানদের চেয়ে কতটা নীচে হওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন? এম-ডি উত্তরে ওঁকে বলেন—'ইন্‌সোলেণ্ট।' তার পরের পর্ব হোলো রেজিগনেশন লেটার দিয়ে, বার্ড কোম্পানীর চাকরি থেকে মিঃ ভট্টাচার্যের প্রস্থান। ওঁরা অবশ্য একটু অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, রেঙ্গুনে যাবার প্রস্তাব বিবেচনাধীন রইল, উপস্থিত মিঃ ভট্টাচার্য তাঁর যথানির্দিষ্ট কাজে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু মিঃ ভট্টাচার্যের একটি কথা, "Now or never."

উনি নির্ভীক, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির সম্মান সম্বন্ধে সবসময় সচেতন এ সবই সত্যি। কিন্তু আমি জানি 'এহ বাহ্য'। তখন আমার কর্মক্ষেত্রে আমি ছিলাম সম্পূর্ণই একা, আর নানান সমস্যায় বেশ কিছুটা বিব্রতও হয়ে পড়েছিলাম। উনি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই মুখে কিছু না বললেও সব কাজে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমায় সাহায্য করবার একটা অন্তর্লীন তাগিদেই উনি অতবড় কাজ অমন অনায়াসেই ছেড়ে

দিতে পেরেছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস। ওঁর অনেক শুভাকাঙ্খী বন্ধু বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন লোভনীয় পদমর্যাদা ও মাসের শেষে মোটা দক্ষিণা ছাড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাছাড়া লোকে ত এমনও ভাবতে পারে সব কাজকর্ম ছেড়ে রূপসী ও বিত্তসম্পন্না স্ত্রীর আঁচলের তলায়……ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করলে তা থেকে কেউই ওঁকে নড়াতে পারত না। তাছাড়া মানুষের জীবনে এমন সময় আসে যখন সে লোকনিন্দা বা উপহাসকে বহন করতে সঙ্কুচিত ত হয়ই না বরং তাকে বরণ করতেই আকুল হয়ে ওঠে। উনি বলেন, সমাজের অপবাদের ভয়ে যন্ত্রপুত্তলীর মত জীবনযাপন করা এক জিনিস (এর নাম 'ভণ্ডামো') আর যথার্থ বাঁচা আর এক জিনিস, এবং তার নাম সার্থকতা।

এইসময় আমার শ্রীমতী পিকচার্সে 'বামুনের মেয়ে'তে কাজ করবার সময়ই আমাদের 'সব্যসাচী' ইউনিটে ওঁর নামটিও যুক্ত হয়েছিল। কারণ সিনেমার দিকে ওঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল। আর লেখবার প্রবণতা ত মজ্জাগত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে উনি স্টুডিওতে এসে স্যুটিং-এর কাজকর্মও দেখতেন।

'বামুনের মেয়ে'র প্রডাকসন চলাকালেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম যুগের ধারা কেমন করে আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। মনে আছে আমাদের যুগে একটি ছবি স্যুটিং-এর সময়ের একটি ঘটনা। সেট রেডী। কিছুক্ষণ স্যুটিং করার পর পরিচালক হঠাৎ বললেন, 'আমি একটু খেলা দেখে আসি। তোমরা ততক্ষণ গল্পগুজব কর।'

সারাদিন অপেক্ষা করার পর তিনি যখন ফিরলেন বিকেল তখন সন্ধ্যের দিকে পা বাড়িয়েছে। আমরা মেক-আপ নিয়ে সারাদিন আড়ষ্ট হয়ে বসে শ্রান্ত, বিরক্ত। কিন্তু সেই শ্রান্ত দেহমনেই স্যুটিং করতে হয়েছে রাত বারোটা একটা অবধি।

আর 'বামুনের মেয়ে'র কাজের সময় একদিন খানিকক্ষণ স্যুটিং করার পর যাঁকে নিয়ে সেদিনের প্রধান কাজ, সেই শিল্পীই হঠাৎ বললেন, 'আজ খেলা দেখতে যাব, আর স্যুটিং করা সম্ভব নয়।' অতঃপর আমাদের সারাদিনের প্রস্তুতিপর্বের পরিশ্রম, এবং অর্থব্যয়ের ক্ষতিকে মেনে নিয়ে স্যুটিং 'প্যাক আপ' করে সেদিনের কাজ স্থগিদ রাখতে হোলো।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম এ যুগের শিল্পীরা বোধহয় আগের যুগের শিল্পীদের ওপর মালিকদের কর্তৃত্বের পীড়নের শোধ নিচ্ছেন, আর আমরা এখনকার যুগের কর্তৃপক্ষ আগেকার যুগের প্রযোজক, পরিচালকদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছি। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস যে আমার ভূমিকাটা দুই যুগেই সমানই রয়ে গেল। একযোগে কর্তৃপক্ষের অপরযুগে শিল্পীদের মর্জি মেনে নেওয়া।

এক যুগের অন্যায়ের দায়দায়িত্ব অপর যুগকে কিছুটা বহন করতেই হয়। তারজন্য এঁদের আমি দোষ দেব কেমন করে? কিন্তু সব মেনে নিলেও একথা কিছুতেই মানতে পারি না যে জীবনের কর্মক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন বজায় রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। যেখানে অনেকজনকে নিয়ে কাজ এবং প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত কাজের ওপর সামগ্রিক সার্থকতা নির্ভর করে, একজনের কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত না হলে যেখানে অন্যকে তার জন্য ক্ষতির মূল্য দিতে হয়, সেখানে এ দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন না থাকাটা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ।

যাই হোক 'বামুনের মেয়ে' পাবলিক ঠিক নিতে পারেনি, হয়ত বা এ কাহিনীর বক্তব্য বা আদর্শ মেনে নেবার মত মন তখনও তৈরী হয়নি। তবে এ ছবি বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধন্য হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, অজয় করের সহৃদয় সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে শ্রীমতী পিকচার্সের প্রতিটি সৃষ্টি সার্থক করে তোলার ব্যাকুল প্রয়াস। ক্যামেরাম্যান হিসেবে অজয়ের খ্যাতি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। এই কোম্পানীর ছবিতেই পরিচালনার কাজেও ও এগিয়ে এল। কর্মী হিসাবে ওর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শিল্পবোধ যে কোনো মানুষেরই শ্রদ্ধার বস্তু নিশ্চয়। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় ওর অন্তঃকরণ যা আজও আমায় মুগ্ধ করে। যখন যে কাজ প্রয়োজন তাতেই ও এগিয়ে যায়। কাজ শেষ হলে নীরবে সরে আসে। কোনো আত্মবিজ্ঞপ্তির ঢাক পেটাতে অথবা জাহিরীপনা করতে ওকে কখনও দেখিনি।

মানুষকে খুব সহজেই আপন করে নেওয়ার গুণেই আমার মা, দিদি সকলের কাছেই ও একেবারে বাড়ির ছেলে হয়ে উঠেছিলো।

অজয়ের মধ্যের যে বস্তুটি আমায় মুগ্ধ করে সেটি হচ্ছে এই, ওর প্রতি কারো কোনো অবিচারের জন্য কখনও ওকে কোনো অভিযোগ, অনুযোগের

-ঝড় তুলতে দেখিনি। ও বিশ্বাস করে প্রতিদান কামনাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কও হয়ে ওঠে বাণিজ্যের দরদস্তুর। ঠিক এই কারণেই ওর সঙ্গে কারো সম্পর্ক কোনোদিন ভাঙন ধরে না। ও এতদিন ছিল আমার বন্ধু, সহকর্মী, আমার পরিবারের আপনজন। ওর নির্মল স্বভাবের আকর্ষণে আমার স্বামীও ওকে এক লহমায় যেন বন্ধুত্বের পদে বরণ করে নিলেন।

আমাদের সঙ্গে ওর এ সম্পর্ক আজ অবধি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ ত হয়নি, বরং কালের সঙ্গে সঙ্গে আরো গভীর আরো অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। আজও প্রত্যেকদিন অজয়ের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গল্প না করলে ওঁর মেজাজটা মাখনহীন টোস্টের মতই খটখটে হয়ে ওঠে। তাই মাঝে মাঝে ভাবি অজয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বটা কার বেশী? আমার না ওঁর?

'বামুনের মেয়ে' রিলিজ্ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাণাকে যখন কোলে পেলাম সারা জীবনের সকল অপূর্ণতা যেন কানায় কানায় ভরে উঠল। আমার প্রতি জীবন-বিধাতার অকৃপণ করুণার কোনো অন্ত নেই। কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠতম পাওয়ার বরদানে ধন্য হলাম এতদিনে। কতদিন ওর ঢলঢলে কচি মুখখানার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে ওরই জন্য বুঝি এতদিন সারা চিত্ত তৃষিত ছিল। কত ঘুম-না-হওয়া রাতের অতৃপ্তি, কত-দিনের অকারণ বিষণ্ণতা সে কি ওর অভাবেই নয়? কতদিন ওর কপালে গালে হাত বুলোতে বুলোতে ভেবেছি ওই ত 'ইচ্ছে হয়ে ছিল মনের মাঝারে।' সম্মোহিতের মত বারবার আবৃত্তি করেছি:

'ছিলি আমার পুতুলখেলায়
প্রভাতে শিবপূজোর বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।'

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা টলমল করে উঠেছিল। শুষ্কপ্রায় মনের ফাটলে দুলে উঠেছিল সবুজ স্বপ্নলতা, প্রাণের চরে ঝিকিয়ে উঠেছিল অশ্রুসুখের ঝিকিমিকি। মনে হয়েছিল জীবনের আর কোনো ব্যর্থতাই কোনোদিন আমায় দুঃখ দিতে পারবে না।

এরপর 'মেজদিদি'র কাজ শুরু হোলো। 'মেজদিদি' থেকেই মিস্টার ভট্টাচার্যের ছবির কাজে হাত দেওয়া শুরু। বার্ড কোম্পানীতে কাজ করতে করতেই উনি পুরো সিনারিও লিখে ফেলেছিলেন। এ ছবিও সব্যসাচী পরিচালিত। একটা কথা ভাবতে ভারী মজা লাগে। অজয়, তনুবাবু

(তরুণ মজুমদার) এবং যাত্রিক গোষ্ঠী এইরকম কয়েকজনের পরিচালনায় কাজে হাতেখড়ি হয় শ্রীমতী পিকচার্সেই। আজ এঁরা বাংলার খ্যাতনামা পরিচালক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

তারপর যা বলছিলাম। 'মেজদিদি'তে আমি ছিলাম নাম ভূমিকায় আর রেণুকা রায় ছিল আমার বড় জায়ের ভূমিকায়। এই 'মেজদিদি'তেই আমি সর্বপ্রথম ক্যারেকটার রোলে অভিনয় করি।

বলাবাহুল্য, সমস্ত বাঙালি পাঠক-পাঠিকার মতো শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, গল্প প্রথম থেকেই আমার মনকে বড় টানত। দৈনন্দিন জীবনের অতি চেনামহলের তিনি বাস্তব ঘটনাকে তাঁর অসামান্য হৃদয়ের যাদুকরী শক্তিতেই বুঝি এমন সরস ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। যে কোনো পাতার যে কোনো লাইনে একবার চোখ পড়লে যেন বই শেষ না করে ছাড়া যায় না। কেন? মানুষকে তিনি যথার্থ সম্ভ্রম করতে জানতেন। এই সম্মান ও ভালবাসার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাদের অন্তরগহনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও ব্যথা-বেদনাকে এমন জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। মানুষকে জানতে হলে তাকে ভালবাসতে হয়, অজানতেই যেন শরৎচন্দ্রের কাছে এই সত্যে দীক্ষিত হয়েছি। নানান ঘটনা বেদনার মধ্যে দিয়ে তাঁর এই প্রশ্নটাই যেন হৃদয়ে ধাক্কা দেয়—যা দরদ দিয়ে বোঝবার, যুক্তি দিয়ে তার নাগাল কি কেউ পেয়েছে কোনোদিন?

'মেজদিদি'তে অভিনয় করবার সময় বারবার শুধু এই কথাটিই মনে হয়েছিল, 'মেজদিদি'র ত স্বামী সন্তান নিয়ে পূর্ণ সংসার, তবু অনাত্মীয় একটি ছেলের প্রতি তার এই সীমাহীন ভালবাসার কারণ কি? আর তার জন্য সংসারে এমন অশান্তির ঝড় সৃষ্টি করবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তার কারণ বোধহয় এই যে নারীহৃদয়ের স্নেহভালবাসা সোজা খাতে বয় না। সে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ কেটে খাদ গহ্বর সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়। তাই কি দুই সন্তানের জননী হয়েও তাঁর স্নেহ করবার তৃষ্ণা মেটেনি? না, জননীর অন্তরের বেদনা দিয়েই পিতৃমাতৃহীন কেষ্টর দুঃখকে এমন করে বুঝেছিলেন? হয়ত দুটোই সত্য।

রাণাকে পাওয়ার পর থেকে 'মা' ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা ভাবতে পারিনি। তাই এইরকম একটি চরিত্র রূপায়ণের সুযোগ পেয়ে ভারী তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

এই ছবিটির চিত্রনাট্য রচনায় ওঁর মনটির সঙ্গেও যেন নূতন করে পরিচয় ঘটল। আমার স্বামীর এটা দোষ কি গুণ জানি না, বই-এ যা থাকে তাকেই যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখবার চেষ্টা করেন। এ নিয়েই আমাদের অনেক আলোচনা হয়েছে। ওর মত হোলো এই—'প্রতিভা ও প্রকাশক্ষমতায় লেখকের চেয়ে বড় না হলে তাঁর লেখা পাল্টাবার অধিকার কারো নেই। তাছাড়া প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার যে বিকাশ ও পরিণতি তিনি ঘটিয়েছেন তার যথাযথ রূপটিই তুলে ধরা দরকার। এখানে আমার দৃষ্টিভঙ্গির কাঁচি চালানোটা আমি আমার্জনীয় অপরাধ বলেই মনে করি।'

শরৎচন্দ্রের প্রতি ওঁর এই দুর্বলতায় আমারও মনের কোথায় যেন একটা সায় ছিল। শ্রদ্ধেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এই নম্রতা সত্যিই বড় দুর্লভ। আরো কঠিন সস্তা বাহাদুরীর প্রলোভন সংযত করে তার পূর্ণাঙ্গরূপ বজায় রাখা।

এই 'মেজদিদি'তেই উনি একটি অবাঙালী মুসলমান ছেলেকে ট্রেনিং দিয়ে কেষ্টর ভূমিকায় নামান। দুঃখী কেষ্টর স্নেহপিপাসু চিত্ত, তার দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, তেজ ও সংযম এমন আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তার চলা বলা ও এক্স:প্রশনে যে কে বলবে সে শরৎচন্দ্রের মানসসন্তান কেষ্ট নয়!

যে একেবারেই বাংলা জানে না কতদিন ধরে তাঁকে প্রায় দিবারাত্র বাড়ির ছেলের মত করেই বাড়িতে রেখে পুরোপুরি বাঙালী বানাবার জন্য যে পরিশ্রম উনি করেছেন তা রীতিমত সাধনার পর্যায়ে পড়ে। বিস্মিত হয়ে ভাবতাম উনি ত সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ ছিলেন। তবু শিল্পী-সৃষ্টির এমন অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি আয়ত্ত করলেন কেমন করে? Necessity is the mother of invention, না মানুষের সুপ্ত শক্তি পরিবেশের প্রভাবে জাগ্রত হয় বলে?

'মেজদিদি' রিলিজ্ হবার আগে স্টুডিওতে যেদিন দেখানো হোলো সব্বাই ত দারুণ খুশী। আমারও ভালো লেগেছিল নিশ্চয়। নিজের জিনিসের ওপর কার না দুর্বলতা থাকে? তবু খুব একটা উৎফুল্ল হইনি। কারণ আগের দুটি ছবির অভিজ্ঞতা আমায় একটু দমিয়েই দিয়েছিল।

ঠিক এই সময়ই একদিন উনি স্টুডিও থেকে ফোন করে জানালেন একজন ডিস্ট্রিবিউটার 'মেজদিদি'র চিত্রস্বত্ব খুব চড়া দামে কিনতে চাইছেন। আমি রাজী কিনা। টাকার অঙ্কটা তুচ্ছ করবার মত ছিল না। তবু কেন

জানি না আমাকে সেই চিরকালের বে-পরোয়া বুদ্ধিতে পেয়ে বসল। হয়ত বা শরৎচন্দ্রের প্রতি অপরিসীম দুর্বলতাবশতঃই বলে বসলাম, 'কথায় বলে বারেবারে তিনবার। এই শেষবারের মত আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা হোক। এবার ব্যর্থ হলে ছবি করা বন্ধ করে দেব।' উনি বললেন, 'তথাস্তু।'

আর একদিন উনি স্টুডিও থেকে ফিরে বললেন, 'বুঝলে, আজ হিলম্যান গাড়িটা বাজি রেখে এলাম নারায়ণ পিকচার্স কোম্পানীর কাছে।'

'সে আবার কি?'

'প্রাণকৃষ্ণবাবু (দত্ত, ঐ কোম্পানীর একজন পার্টনার) বললেন 'মেজদিদি' দারুণ হিট্ করবে। আমি বললাম 'দুর! যতসব অ্যাবসার্ড কথা।' উনি বললেন, 'যদি হয় আমায় কি দেবেন?'

'কি চান?'

উনি ঠাট্টা করে বললেন 'এই গাড়িটাই বাজি থাক।'

'তাই থাক।'

'মেজদিদি' রিলিজ্ হওয়ার পর সত্যিই কিন্তু গাড়িটা ঐ কোম্পানীকে দিতে হয়েছিল। কারণ 'মেজদিদি' শুধু বক্স অফিসের শীর্ষস্থানীয়ই নয়— ১৯৫১ সালের শ্রেষ্ঠতম ছবিগুলির অন্যতমরূপে স্বীকৃত হয়।

বাজিতে হারার যে এত আনন্দ তা জানতাম না।

'মেজদিদি'র পরই আমরা সাগরপারে যাত্রা করলাম। আর আগেরবার ভুলুদা (প্রশান্ত মহলানবিশ) অবশ্য যাবার পথে আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু ও-দেশে সারাক্ষণ প্রায় একাই কেটেছে। দ্রষ্টব্য যা কিছু তা দেখেছি, বেড়িয়েছিও এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শেও এসেছি। কিন্তু সব কিছুরই যেন নীরব দর্শক। মনের মধ্যে কখন কি বস্তু কি অনুরণন তুলছে সেকথা জানাবার কেউ না থাকায় নিঃসঙ্গতা অনেক আনন্দকেই ম্লান করে দিয়েছিল।

এবারে উনি সঙ্গে থাকাতে যেখানেই গেছি, মনে হয়েছে এক অন্তহীন আনন্দের রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। এত আনন্দ বুঝি দুহাতে বিলিয়ে ছড়িয়ে শেষ করতে পারব না। রাণাকে মার কাছে রেখে গিয়েছিলাম। কেবল ওর জন্য মাঝে মাঝে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠত। তবে প্রাণশক্তির উচ্ছল জোয়ারে সামলে নিতে পারতাম।

ওখানে একটি নতুন মডেলের গাড়ি কিনেছিলাম। কিছু খাবার সঙ্গে

নিয়ে সকালে বেরিয়ে পড়ে আবার রাতে হোটেলে ফিরতাম। ঠিক পিকনিক পার্টির মতই মজা লাগত। একটা রাত্রের কথা এখনও মনে আছে। বেড়াতে বেড়াতে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রের মধ্যে আর হোটেলে ফেরা সম্ভব নয়। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে রাত্রিবাসের উপযুক্ত একটা হোটেল খোঁজা হোলো; কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও ট্যুরিস্টদের উপযোগী পান্থশালা ছাড়া কিছুই জুটল না। মনের আনন্দে দুজনে তাতেই ঢুকে পড়লাম। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যই বুঝি অন্যান্য অসুবিধার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। ওদেশের গ্রাম্যজীবনেরও কিছুটা স্বাদ পাওয়া গেল।

সকালবেলা আবার হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়লাম। বেশ খানিকদূর চলে আসার পর উনি হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'ঐ যা! বড্ড ভুল হয়ে গেছে ত।' বলেই আবার গাড়ি ঘোরালেন।

'কি হোলো আবার?' আমি ভাবলাম হয়ত বা ঐ সরাইখানায় কিছু ফেলে এসেছেন। যেতে যেতে বললেন, 'আসবার সময় তাড়াতাড়িতে ওদের টাকা দিয়ে আসতে ভুলে গেছি।' আমি বললাম, 'তার জন্য আবার এতটা যাব? বড্ড দেরি হয়ে যাবে না? তার চেয়ে ঐ টাকাটা রেখে দাও-না, কোনো গরীব-দুঃখীকে দিয়ে দেব? তাহলেই ত ঋণশোধ হয়ে যাবে।'

'ঋণশোধের প্রশ্ন নয়। এ-টাকা না দিয়ে এলে ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে ওদের ধারণাটা কি হতে পারে ভেবে দেখছ?—নিজেদের একটু অসুবিধার জন্য স্বদেশের সম্বন্ধে ওদের এইরকম পুওর ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করে যাওয়াটা কি ঠিক?'

'সত্যি, ভেরী সরি। আমি অতটা ভেবে দেখিনি। থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি লেসন।'

ঠিক উৎসবের মতই যেন দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। দর্শনীয় বস্তুগুলি যেন তাদের গোপন ভাণ্ডারের বিপুল আনন্দ সম্ভার মেলে ধরল—যা এর আগে ধরেনি। কারণ দেখার একজন মনের মত সঙ্গী মিলেছিল এবার। ওঁর প্রচুর পড়াশোনা থাকার দরুণ প্রতিটি জায়গায় গিয়ে চারিদিকের যা কিছু দৃশ্যবস্তু লক্ষ্য করতেন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে, আর আমাকেও তার খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিতেন এত সুন্দর করে যে আমার কাছে যেন একটা নতুন জগৎ খুলে গেল। নতুন পরিবেশে দেখলাম—ওঁর অন্তরতম সত্তার

হঠাৎ জলে-ওঠা রূপ। দেখতাম ওঁর কত জ্ঞান-গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা। সবার ওপর প্রকাশ করবার এমন সাবলীল সহজ ভঙ্গী। দেশে থাকতে ওঁর এ রূপ আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল।

তাই ভাবতাম মানুষকে বুঝতে হলে, জানতে হলে, কত সময়, প্রতীক্ষা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে বিভিন্ন মানুষের সাড়া দেবার রূপ আলাদা, ভঙ্গী আলাদা। এই রূপ ও ভঙ্গীর আয়নায় প্রতিফলিত হয় তার হৃদয়ের ছবি। এই ছবিই তার যথার্থ রূপ। তাই ত এই সরস ভ্রমণের স্মৃতি আমার জীবনের এক পরম ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে।

আমেরিকার মত্ততা লণ্ডনে নেই। লণ্ডনের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল নিয়মে বাঁধা। এদের আচার-ব্যবহার অত্যন্ত ফর্ম্যাল। মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করবার মত এদের সততা ও দেশপ্রেম। ট্রাফালগার স্কোয়ার ও চেরিংক্রশে দেখতাম রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত দৈনিক কাগজ, কত রকমের কত বিষয়ের। কিন্তু বিক্রেতা নেই। কাগজের দাম রাস্তার পাশে রাখা একটি বাক্সে ফেলে দিয়ে পথিকরা প্রয়োজনমত কাগজপত্র নিয়ে যেত। এ জিনিস আমাদের দেশে ভাবা যায়?

কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। ওদের সঙ্গে মিশে দেখেছি (অবশ্যই ব্যতিক্রম কয়েকজন ছাড়া) নিটোল ভদ্রতার আবরণ ভেদ করেও আমাদের প্রতি ওদের বিতৃষ্ণার আঁচটা টের পাওয়া যেত।

আমরা তখন সবে স্বাধীন হয়েছি। হয়ত সেইজন্যই এক মুহূর্তের জন্য ওরা ভুলতে পারত না যে ওরা আমাদের শাসকের জাত। তাই ওদের নিখুঁত ফর্ম্যালিটির সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের প্রাচীরটিও থাকত সযত্নরক্ষিত। তাছাড়া ওরা রক্ষণশীল জাত। কোনো ব্যতিক্রমকে চট করে গ্রহণ করে না। এখন শুনেছি আমেরিকার চাঞ্চল্য ওদের জীবনেরও পরিবর্তন এনেছে।

আমেরিকানরা অতিথিকে 'হাউ ইনটারেস্টিং' বলে দূরে সরিয়ে রাখে না। ওরা আমুদে, প্রাণখোলা জাত। কিন্তু বড্ড দ্রুতবেগে চলে বলেই ওদের জীবনযাত্রা খানিকটা বহির্মুখী না হয়ে পারে না। তারই প্রতিক্রিয়ায় হয়ত আজ ভারতের অন্তর্মুখীন শিল্প, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবোধের প্রতি ওদের এই মুগ্ধতা।

তবে ওদের গ্রহণশীলতাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।
বিবেকানন্দকে আমেরিকাই আগে নিয়েছে। উদয়শঙ্কর আজও শুনেছি
'গড্ অফ্ ডান্স'-রূপেই সম্মানিত। আলি আকবর, রবিশঙ্কর আজ সারা
বিশ্বের। কিন্তু ওঁদের শিল্পকৃতিকে আমেরিকাই বোধহয় সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত
স্বীকৃতি দিয়েছে। এ উচ্ছ্বাস ক্ষণস্থায়ী কি চিরস্থায়ী সে বিচারের ভার
মহাকালের। কিন্তু সুন্দরকে পূজা করবার এই ব্যাকুলতা—যদি উচ্ছ্বাসও
হয়—তবে সে উচ্ছ্বাসও বরণীয় নয় কি নীরস ঔদাসীন্যের কাঠিন্যের চেয়ে?

আনন্দভরা দিনগুলির যেন পাখা গজালো। দেখতে দেখতে কটা
মাস কেমন করে কেটে গেল টেরই পাওয়া গেল না। এরই মধ্যে দেশ
থেকে একদিন মার চিঠি এল—রাণা খুব অসুস্থ। চিন্তার কোনো কারণ
নেই, তবে সম্ভব হলে যেন তাড়াতাড়ি ফিরে।

চিঠিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ানো, আনন্দ, হৈ-হৈ সবই যেন মাথায়
উঠল। উনি তৎক্ষণাৎ ফোন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাসেজ বুক
করে জিনিসপত্র প্যাক করার কাজে লেগে গেলেন। আমার কোনো
কাজেই যেন আর হাত-পা উঠছিল না। শুধু রাণারই জন্য তখনকার
দিনেই বোধহয় দু-হাজার টাকার বেশী খেলনা কিনেছিলাম। সেইগুলিই
সবচেয়ে আগে গুছোতে বসলাম। উনি হেসে বললেন, "এতসব খেলনা
দেখলেই রাণা তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে তেজী ঘোড়ার মত
টগবগ করবে। সেই দৃশ্যটা মনে করে অন্ততঃ উৎসাহ পাবার চেষ্টা কর।
বেবিদের ওরকম একটু-আধটু অসুখ-বিসুখ হতেই পারে। ওর জন্য এত
নার্ভাস হলে চলে?"

উদ্বিগ্নচিত্তে যাত্রা করলাম। যথাসময়ে দেশে পৌঁছলাম। রাণা তখন
মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু আমাদের গৃহচিকিৎসক ডাঃ পালের কাছে
যা শুনলাম, তা রীতিমত ভয় পাবারই মতন। ও নাকি একেবারে ব্লু বেবী
হয়ে গিয়েছিল। সে-যাত্রা সামলেছে বটে, তবু একবার হার্ট স্পেশালিস্ট
দেখানো প্রয়োজন। এটা হার্টেরই কোনো সীরিয়াস ব্যাপার বলে তিনি
আশঙ্কা করছেন। ডাঃ পাল শুধু আমাদের বাড়ির ডাক্তারই নন। আমাদের
পরিবারের সঙ্গে ওঁর দীর্ঘকালের পরিচয় ও আসা-যাওয়ার ফলে গড়ে-ওঠা
ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তার পর্যায়েই পড়ে। আমাদের বাড়ির সকলের অসুখে-

বিমুখে আজও উনি ওঁর স্নেহসজাগ হৃদয়ের ব্যগ্রতা নিয়ে দেখা-শোনাই শুধু করেন না, অভিভাবকের মতই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। একজনের অসুখে দেখতে এলে সঙ্গে-সঙ্গে আর সকলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তদারক করতে ভোলেন না। প্রত্যেকের ধাত্ ওঁর অতিপরিচিত।

ওঁরই পরামর্শে রাণাকে হার্টস্পেশালিস্ট দেখানো হোলো। কোলকাতার যতজন ছিলেন প্রায় প্রত্যেককেই। সকলের রায় সমান হোলো না। কেউ বললেন ভয়ের কিছু নেই। ওষুধপত্র খেলেই সেরে যাবে। অন্যেরা যা বললেন তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তাঁদের মতে হার্টে একটা 'হোল' হয়েছে। ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার নৈলে ও একেবারেই ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। বিশেষ করে একথা জোর দিয়ে ব'ললেন ডাঃ বিষ্ণু চ্যাটার্জি। আর হার্ট-স্পেশালিস্ট না হলেও তাঁর মতকেই সমর্থন করেছিলেন ডাঃ পাল।

আমরা দুজনেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। সে অপারেশন এদেশে তখনও বিশেষ চালু হয়নি। এর সাফল্যও অনিশ্চিত। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ত অপারেশনে একেবারেই মত ছিল না। সারা পরিবারে ঐ একটিই পুত্রসন্তান। বংশের কুলতিলক। ওর যদি কিছু···না, তার চেয়ে যেমনই থাকুক বেঁচে থাক। আমার স্বামী অন্য সবদিকে এত নিঃশঙ্কচিত্ত হলেও ছেলের ক্ষেত্রে একেবারে অসহায়া নারীর মতই ভীতু হয়ে পড়লেন। ওঁরও ঐ একই মত। অপারেশন এখন থাক।

আমার তখনকার মনের অবস্থা বলে বোঝাবার ভাষা নেই। সিরিয়াস অপারেশন? যদি সাকসেসফুল না হয়? আর ভাবতে পারতাম না। চোখের সামনে যেন মুঠো মুঠো অন্ধকার নেমে আসত। সারাজীবনের সাধ ও স্বপ্নের জীবন্ত রূপ আমার রাণা। সে যদি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকে, আমার জীবনটাও যে অর্থহীন হয়ে পড়বে। আবার ওর না থাকা মানেই ত জীবনের আলো নিভে যাওয়া। কি করব? কি করা উচিত? কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলাম না। এক বছর লেগেছিল মনস্থির করতে। আজও মনে পড়ে কতদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আর ধড়মড় করে চমকে উঠে রাণার বুকে হাত দিয়ে দেখেছি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় নি ত? প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কার যে ভয়াবহতা তা বর্ণনা করতে পারব না।

এমনই বিক্ষিপ্ত, উদ্বিগ্ন চিত্ত নিয়েই 'দর্পচূর্ণ'র কাজ শুরু করলাম। শ্রীমতী পিকচার্সের ব্যানারে এবং আমার স্বামীর পরিচালনায় এ ছবি

দর্শকদের খুশীই করেছে। নায়কের রোলে ছিলেন রাধামোহন, নায়িকা আমি। রাধামোহনবাবুকে আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লেগেছিল, শুধু উচ্চশিক্ষিত বলেই নয়, যথার্থ শিক্ষিত বলে। স্বভাব-ব্যবহার মার্জিত, বিনম্র। শুধু সু-অভিনেতাই নন, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে ওঁর জ্ঞানের পরিধি ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা শ্রদ্ধা করবার মতই।

এরপর ওঁরই পরিচালিত 'নববিধান'কে হিট পিকচার্সের তালিকায় ফেলা যায়। এ ছবিতে কতজন অভিনন্দন জানিয়েছেন একাধারে আমার অভিনয়-প্রযোজনার যুগ্ম সাফল্যকে। অনেকে এমন কথাও বলেছেন এতদিন অবধি চিত্রজগতে আমার প্রতিষ্ঠার মূলে আমার কণ্ঠের অবদানই ছিল প্রবল। এখানে গান একটা দুটো থাকলেও অভিনয়টাই ছিল প্রধান। আর শুধু অভিনয়ে যে আমি এতটা চিত্তস্পর্শী হতে পারি এটা তাঁরা ধারণাও করতে পারেননি। নিছক গান ও চেহারার ম্যাগনেটিক ফোর্সে অভিনয়টাকে বক্স অফিসের দোরে পৌঁছে দেবার অভিযোগ যাঁরা করতেন —তাঁদের ক্ষোভ দূর করতে পেরেছি এই আনন্দটাই আমার কাছে মস্তবড় পুরস্কার হয়ে উঠেছিল।

তখন রাণার জন্য মনের উৎকণ্ঠার কথা আগেই বলেছি। স্টুডিওতে জহরবাবু, কমলবাবু, নানারকম হাসি-তামাশায় পরিবেশকে এমন ভাবে জমিয়ে তুলতেন যে কয়েক মুহূর্তের জন্যও যেন চিন্তাভারটা একটু হাল্কা হয়ে যেত। কমলবাবু খুব রসিক আর আমুদে ছিলেন। সকলকেই খুব টীজ করতেন, আর ওঁর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, যে যেরকম স্বভাব ও প্রকৃতির তার সঙ্গে ঠিক সেই ভাবেই মিশতেন। স্টুডিওর প্রত্যেকেই ওঁকে খুব পছন্দ করত।

জহরবাবুর প্রসঙ্গ বিশেষভাবে এসেছিল রাধা ফিল্মসের যুগেই। তখন তিনি ছিলেন প্রাণচঞ্চল তরুণ। এখন পরিণত বয়সে দেখলাম ওঁর পরিণত পরিবর্তন। আগেকার হাসিখুশী ভাব ছিল। কিন্তু তার আড়ালে কাজ করত এক সংবেদনশীল কোমল মন। যেদিন স্যুটিং থাকত আমরা দুজনে সবচেয়ে আগে স্টুডিওতে যেতাম। ইউনিটের আর সবাই নিজেদের কাজকর্ম অনুযায়ী আগে ও পরে আসতেন। একদিন গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছেন। এত সকালে স্টুডিওতে কে এলেন? আমি আর আমার স্বামী দুজনেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

কাছে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আর কেউ নন, স্বয়ং জহরবাবু। আমাদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ লাল, মুখখানা শুক্‌নো। সর্বাঙ্গে একটা ক্লান্তির ছাপ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি হোলো জহরবাবু? আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? আর এত সকালেই বা এলেন কেন? আপনার টেক্‌ ত সেই লাঞ্চের পর।"

উনি বললেন, "কাল রাত্রে একটা বড় মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেছে। আমাদের পাড়ায় একটি ছেলে ছিল। তাকে আমার সন্তানতুল্য কেন, একেবারে সন্তানই বলা যায়। কাল তাকে হারালাম। সারারাত শ্মশানে ছিলাম। কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছি। দেখলাম একবার যদি শুয়ে পড়ি সারাদিন আর চোখ খুলতে পারব না। তাই বিছানায় না গিয়ে একেবারে স্টুডিওতেই চলে এলাম।"

পরে অন্যের মুখে শুনেছি এই ছেলেটিকে জহরবাবু শুধু আপন সন্তানের মত স্নেহই করতেন না, অভিভাবকের মতই তার পড়াশোনা ও যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন। কিন্তু তার জন্য কোনো জাহিরীপনা অথবা শোকপ্রকাশের আতিশয্য নেই। এ হারানোর ব্যথা তাঁকে যে কতখানি বেজেছে তারই স্বাক্ষর বহন করছে তার ব্যথিত বিষণ্ণ চেহারা।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। ওর ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছিল। তবু স্যুটিংএ এসেছেন। উনি জ্বরকে আমল না দিলেও চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কি আন্দাজ কাবেল হয়ে পড়েছেন। আমি খুব রাগ করে বললাম, "এত শরীর খারাপ নিয়ে আসবার কি দরকার ছিল? একটা ফোন করে দিলেই ত হোতো। আপনার সবভাতেই বাড়াবাড়ি।"

উনি সেই পরিচিত ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গীতে বললেন, "আহাহা! তুমি ব্যাপারটা বুঝছ না। এটা তো শুধু তোমার, আমার অথবা ভট্টাচায্যির ব্যাপার নয়। অনেকজনকে নিয়ে কাজকারবার। একজন না এলে হোল সেটটাই যে আপসেট হয়ে পড়বে। জ্বর ত কি হয়েছে? স্যুটিং সে-এ-রে বাড়ি গিয়ে মৌজ করে আদা দিয়ে এক কাপ চা খে-এ-রে আর মাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ব। কাল সকালে উঠে দেখব, জ্বর ত জ্বর—জ্বরের বাবা দেশ ছেড়ে পালাবে।"

ওর কথা শুনে না হেসে পারা যায়? হাসতে হাসতেই হঠাৎ মনে পড়ে

গেল এ যুগের ছবিতে কাজ করলেও অহরবাবু সেই যুগেরই মানুষ—যে যুগের মানুষের কাছে কাজটাই ছিল সবচেয়ে বড়। আর এই কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে ওঁরা ছিলেন সদাসচেতন। কোনরকমে কোম্পানীতে একটা খবর পাঠিয়ে আইনতভাবে দায়দায়িত্ব মুক্ত হওয়াটাই এঁদের কাছে মুখ্য নয়। এখানকার অনেক শিল্পী আবার এ-খবর পাঠানোরও প্রয়োজন মনে করেন না। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, স্বল্পকালের জন্য হলেও তার ভালমন্দ, সাফল্য-অসাফল্যের জন্য ভাবাটাও এঁদের মজ্জাগত শুধু নয়—এ ভাবনা তাঁদের কাছে ধর্মের মতই অপরিত্যাজ্য।

এর পরের ছবি নিরুপমা দেবী লিখিত 'দেবত্র'। ওঁরই পরিচালনায়। এটা শরৎবাবুর কাহিনী না হলেও খানিকটা তাঁরই ঘরোয়া উপন্যাসগুলির ধাঁচ বলেই—এ উপন্যাসের আকর্ষণ মন টেনেছিল।

এই ছবির কাজের সময়ই উত্তমকুমারের সঙ্গে পরিচয় হোলো। ওর ভূমিকা ঠিক পুরোপুরি না হলেও অনেকটা নায়কের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ও তখনও 'গুরু' হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরবর্তীকালের নায়ক গোষ্ঠীর পুরোধা হয়ে উঠতে যে আর দেরি নেই সেটা ঐ সামান্য পরিসরেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা দুজন ওর অভিনয় দেখে সেই কথাই আলোচনা করতাম। আজ ও নায়কশীর্ষ। তখনই ওর এই বিরাট সম্ভাবনার কথা আমরা উপলব্ধি করেছিলাম, একথা বললে অনেকেই হয়ত মুখ টিপে হাসবেন, এই ভেবে যে, একথা বলাটাই এখনকার ছকে-বাঁধা গৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সে আলোচনা থেকে বিরত হলাম। উত্তমকুমারের প্রতিভা যে আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি সেই খবরটাই শুধু জানিয়ে দিলাম।

এরপরের ছবি 'আশা' ওঁর পরিচালনা ও জ্ঞানবাবুর (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) সঙ্গীত পরিচালিত এ ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য একেবারেই শূন্য। কিন্তু আমার নিজের কাছে এ ছবি অত্যন্ত আদরের হয়ে উঠেছিল এর সঙ্গীত মাধুর্যের কারণে।

অনেক আগে দিলীপদা আমার কবীর রোডের বাড়িতে আসতেন। তখন গল্পে গানে আসর জমে উঠত। উনি আমায় অনেক গানও শিখিয়েছিলেন। তখন জ্ঞানবাবুও আসতেন, আমার গানের সঙ্গে তবলা বাজাতেন। তখন থেকেই ওঁর অমায়িক, আড়ম্বরহীন ব্যবহারে ওর সঙ্গে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। 'আশা' ছবির কাজের সময় সেই হৃদ্যতাই বন্ধুত্বের পর্যায়ে এল।

আমি এ ছবিতে কিছুতেই গান গাব না। উনিও‌ই ছাড়বেন না। একটি গানে উনি গজলের ঢঙে সুর দিয়েছিলেন। প্রসূন ভারী সুন্দর গেয়েছিলেন। সব গানগুলিই মন দিয়ে শোনবার মতই হয়েছিল। গ্রামোফোন কোম্পানী রেকর্ডও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নানান গণ্ডগোলে হয়ে ওঠেনি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় রেকর্ডগুলি করিয়ে নিলেই হোতো তাহলে গানটা ত অন্ততঃ থেকে যেত আর সেই সঙ্গে আমার গানের স্বপ্নটাও। শ্রীমতী পিকচার্সের সঙ্গীতপ্রধান চিত্র ছিল ঐ একটিই।

এই গানের প্রসঙ্গেই মনে পড়ে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কথা। 'মেজদিদি' ও 'নববিধান' ছবিতে উনি কয়েকটি গান গেয়েছেন। সামান্য অভিনয়ও ছিল। 'মেজদিদি' ছবিতে ওর 'জনম মরণ' গানটি হিট সং হয়ে ওঠে। ধনঞ্জয়বাবুর কণ্ঠ যেমন উদাত্ত গম্ভীর, তেমনই মধুর। তাঁর চিন্তা ও আবেগের বিশেষ ছায়াটিই যেন প্রতিফলিত হয় গাইবার বিশেষ ভঙ্গীতে। ছবিতে গাইবার অবকাশ ছিল সামান্য। কিন্তু ওঁর সঙ্গীতের ঐশ্বর্যসম্ভার যে সামান্য নয়, তারই পরিচয় পাওয়া যেত স্টুডিওতে কাজের অবকাশের অনেক টুকরো মুহূর্তে। ওঁর নাম, সম্মান যথেষ্ট। তবু কেন জানি না মাঝে মাঝে মনে হয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। এখনও যেখানে আছেন—তার চেয়ে অনেক ওপরে আসন পাবার যোগ্যতা উনি রাখেন।

পরের ছবি 'আঁধারে আলো' হিট করে নি। কিন্তু সর্বভারতীয় ছবির ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান পাবার জন্য হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'আঁধারে আলো' রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। একদিকে ক্ষতির বেদনায় মনটা যখন ভারাক্রান্ত হয়, তখনই বুঝি অন্যদিকে দুলে ওঠে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস। বিধাতার এ এক বিচিত্র লীলা।

এ ছবির নায়িকা সুমিত্রার রূপের খ্যাতি তখন চিত্ররসিকদের মুখে মুখে ফিরত। লাস্যময়ী নায়িকার নিষ্ঠুর লীলা, ছলনা ও প্রণয়ের দ্বন্দ্ব সুমিত্রার মধ্যে মূর্ত করে তোলার জন্য ওঁর সেই নিষ্ঠা ও শ্রম দেখার মতই। ওঁর কাজ দেখতে দেখতে কত সময় মনে হয়েছে উনি যেন সুমিত্রাকে ঠিক সেইভাবেই উদ্দীপিত করেছেন যেভাবে আমায় 'বিদ্যাপতি'র অনুরাধার ভূমিকায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন দেবকীবাবু।

'আঁধারে আলো' কার্লোভিভ্যারী (চেকোশ্লোভাকিয়া) ফিল্ম ফেস্টিভেলে দেখানোর জন্য নির্বাচিত হোলো।

এত বিস্তৃত কাজের অধ্যায় আমরা রচনা করে গেছি রাণার জন্য চিন্তা ও উদ্বেগ বুকে নিয়ে। এইসময় মিঃ ও মিসেস ম্যানিং আমাদের টেন্যান্ট ছিলেন। কিন্তু ল্যাণ্ডলেডী ও টেন্যান্ট শিপ-এর সীমা ছাড়িয়েও অনেক-দূর এগিয়েছিল আমাদের পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। এইসময় ডেনমার্ক থেকে এক হার্ট স্পেশালিস্ট এসেছিলেন। তাঁর কাছেও রাণাকে নিয়ে যাওয়া হোলো। তিনিও ঐ একই রায় দিলেন।

ঠিক এই সময়ই 'আঁধারে আলো' বিদেশে দেখাবার জন্য মনোনীত হওয়ায় আমাদের দুজনেরই বিদেশ যাত্রার আমন্ত্রণ এল ছবিটির প্রযোজিকা ও পরিচালক হিসাবে। এই সুযোগে রাণাকেও সঙ্গে নিলাম ওখানের বিশেষজ্ঞদের দেখাবার জন্য।

এই ফেস্টিভ্যালেই জুরীদের অন্যতম ছিলেন নির্মলবাবু (সুবিখ্যাত এন. কে. জি.)। উনি আমাদের বন্ধুস্থানীয়। ওঁকে সঙ্গী পেয়ে একাধারে যাত্রা, ও প্রবাস-ব্যস্ত সময়ের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কেটেছে। বিদেশে স্ব-দেশীয়র সঙ্গমাধুর্য যে কি মনোরম সে কথা ভুক্তভোগী ছাড়া কেই বা উপলব্ধি করতে পারে?

এই সময় রাণাকে দেখানো হোলো। ওখানের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বিশেষ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে একেবারে সুনিশ্চিতভাবেই জানালেন,—অবস্থা সিরিয়াস, ইমিডিয়েট অপারেশন প্রয়োজন।

আমি তখনই একেবারে অপারেশন করিয়ে আনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। কিন্তু উনি কিছুতেই মনস্থির করতে পারলেন না। বললেন, 'একবারটি দেশে ঘুরে আসি চল। মা বাবাকে বুঝিয়ে বলি, দেখি তাঁরা কি বলেন।'

এই প্রথম দেখলাম ওঁকে এত দুর্বল হয়ে পড়তে।

যাইহোক, অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন মন নিয়ে দেশে ফিরলাম। এবারে রোম, বুডাপেস্ট, সুইজারল্যাণ্ড আরো কত দেশ ঘুরলাম। কিন্তু বিদেশ ভ্রমণের অনেকখানি আনন্দই ম্লান হয়ে গিয়েছিল ঐ একটি উদ্বেগে।

দেশে ফেরার পরও অপারেশন ব্যাপারে উনি দোদুল্যমানচিত্ত। শ্বশুর-শাশুড়ীরও মত নেই।

ম্যানিং দম্পতি আমায় বললেন, 'করছ কি তোমরা? ছেলেটাকে

কি ইনভ্যালিড করে রাখবে? আর দেরি করলে কিন্তু সত্যিই দেরি হয়ে যাবে।'

কি করা যায়? এদিকে আবার অর্থবিভ্রাট। স্টার্লিং-এর সঙ্কট। কোথা পাব? এত ডাক্তার ও পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কতদিনের কত ব্যাপক পরিচয়। কিন্তু কেউ এ বিষয়ে কোনো সাহায্যে এগিয়ে ত এলেনই না, উপরন্তু এ সমস্যার সমাধানকে 'অসম্ভব'-এর এলাকায় ফেলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখলাম। তবে কি আমার রাণার চিকিৎসা ঐ সামান্য একটা কারণের জন্য আটকে থাকবে?

মিঃ ম্যানিংই বুদ্ধি দিলেন, 'ডাঃ রায়কে (বিধানচন্দ্র রায়) জানাও। তুমি ক্যানসার হসপিটাল, দুর্ভিক্ষ, আরো কত চ্যারিটিতে দেশের জন্য হাজার হাজার টাকা গভর্নমেণ্ট ফাণ্ডে দিয়েছ। আর তোমারই একমাত্র শিশু-সন্তানের জীবন বিপন্ন। তারজন্য তিনি তোমায় এতটুকু সাহায্য করবেন না?'

আমার তখন ভাববার শক্তি নেই। মিঃ ম্যানিংই চিঠি ড্র্যাফ্‌ট করে দিলেন। আমার স্বামীকে না জানিয়েই সে চিঠি এবং ওদেশের ডাক্তারের রিপোর্ট ডাঃ রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

দু-এক দিনের মধ্যেই জবাব এসে গেল। আমার প্রার্থনা তিনি সানন্দে মঞ্জুর করেছেন। প্রয়োজনীয় স্টার্লিং-এর ব্যবস্থা উনি করেই দিয়েছেন। আমি যেন অবিলম্বে রাণাকে নিয়ে বিদেশযাত্রা করি। ডাক্তারের কর্তব্য ও শুভানুধ্যায়ীর সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে তিনি রাণার আরোগ্য কামনা করেছেন।

এমনিভাবে যতবারই দুঃখে-কষ্টে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে, শোকেতাপে আমার হৃদয়ে আঁধার নেমে এসেছে তখনই পেয়েছি ঈশ্বরের আশ্বাসের আলো-ভরসা, করুণার নিত্য পাথেয়।

এ চিঠি আসার পর ওঁকে সব কথা বললাম। ডাঃ রায়ের চিঠিটাও দেখালাম। আমার কাতরতা ও মরীয়া প্রয়াস দেখে উনি আর আপত্তি করলেন না।

সুদিন, সু-সময় দেখে সকলের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে রাণাসহ আমরা যাত্রা করলাম। যাবার সময় বারবার মনে শঙ্কা জেগেছে তিনজনে ত যাচ্ছি। তিনজনেই ফিরতে পারব ত?

ওখানে গিয়েই রাণাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলাম। অপারেশনের তারিখ, ডাক্তার ও বেড আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

রাণাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার আগে ডাক্তার আমাকে ও রাণার বাবাকে বণ্ড সই করতে বললেন। সে কি ? বণ্ড সই করতে হবে ? তবে যে শুনেছিলাম এতে কোনো রিস্ক্ নেই ?

"Who says that ? At least the doctors cannot. Of course it is a risky operation. But in most cases the failure is almost nil."

সই করতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছিল। ডাক্তার হেসে বললেন,

"Be quiet. We will try our level best to make the operation successful."

কণ্ঠ তখন রুদ্ধ। তবু ডাক্তারের দুটি হাত ধরে কম্পিত কণ্ঠেই বলেছিলাম, 'আমার ছেলেকে তোমার হাতেই সঁপে দিচ্ছি ডাক্তার। আশাকরি তুমি তাকে আবার আমায় ফিরিয়ে দেবে।'

রাণাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। আমার সকল চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে পৃথিবীর সকল আলোকে নিভিয়ে দিয়েই যেন মনে জেগেছিল শুধু একটি জিজ্ঞাসা 'রাণাকে আবার ফিরে পাব ত' ?

পলকে সেদিন মনে ঝলকে উঠেছিল একটি ধ্যানের কথা। অর্জুন কি বলতে চেয়েছিলেন মাছের চোখকে লক্ষ্যবিদ্ধ করার মুহূর্তে ? দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'অর্জুন' তুমি কি দেখছ ?' অর্জুন বললেন, 'আমি দেখছি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লীন হয়ে গেছে মাছের ঐ একটি চোখে। শুধু ঐ চোখই আমার কাছে হয়ে উঠেছে সিন্ধুনিখিল ?

আমার জগৎ, আমার সকল সত্তাও সেদিন লীন হয়ে গিয়েছিল ঐ একটি জিজ্ঞাসায় 'রাণাকে ফিরে পাব ত' ?

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। এক সময় দেখি আমার স্বামী হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার পাশে উজ্জল চোখে ডাক্তার দাঁড়িয়ে। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

"Madam, I am happy to declare that your son is perfectly alright now."

চোখের জল আর বাধা মানেনি। ডাক্তারকে সেদিন মনে হয়েছিল দেবদূত। আর জীবনদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় উপচেপড়া সেই নিটোল মুহূর্তে মনে হয়েছিলো এরচেয়ে আনন্দের সংবাদ জীবনে আর কি এসেছে ?

রাণা সুস্থ হয়ে হেসেখেলে বেড়িয়ে চারদিকের নানা বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সবকিছু জানা ও চেনার ঔৎসুক্য প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী যেন আবার আলোয় হেসে উঠল। এইসময়ই অনুভব করেছিলাম আকাশ, পৃথিবী, চাঁদের স্বপ্নমাখা আলো সবাই যেন এক আনন্দধারার গতিসূত্রে চলেছে। হাওয়ার গন্ধে, তারার চাউনিতে, চাঁদের ঝরনায় যেন সেই আনন্দময়ের মঙ্গলস্পর্শ ছড়ানো, যিনি দূরে থেকেও সব-চেয়ে আপন, আড়ালে থেকেও সকলের চেয়ে বাস্তব।

সারা চেতনাকে প্লাবিত করে হৃদয়ে নেমেছিল একটা অপার্থিব আনন্দের ঢল,—একটা বরাভয়ের আশ্বাস—আমার প্রতি কাজে, চিন্তায়, ঝঞ্ঝায়, বিপদে, শঙ্কায় তিনি আছেন আমার পাশেই। যেই ভাবা অমনই মনে হোল যে তিনি শুধু আমাদের সবার সাথী নন। তিনি আছেন বলেই আকাশের প্রতি তারা আমার সাথী। চাঁদ আমার সাথী। ঐ পাহাড়, নদী, হাজারো তৃণ, লতা, ফুল, কে সাথী নয়? এ সংসারে একলা কে? ঐ যে চাঁদ, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ সবাই একলা পথে চলেছে বলে কি বলব ওরা নিঃসঙ্গ? কত অদৃশ্য আকর্ষণ, বিকর্ষণ ওদের ধরে রয়েছে তাই না ওরা চলে? স্পষ্ট অনুভব করলাম যে শূন্যের পিছনে এক পরম অবলম্বন সদা সজাগ। নৈলে এ নিরাকারে এত আকারের সমারোহ এল কোথা থেকে। সেদিন মনের তারে বারবারই বেজে উঠতে লাগল বহু উপলব্ধ একটি অনুভূতির সুর—যখন আমাদের চলার পথে মনের মুখর প্রদীপ আর কাজে আসে না—তখনই জ্বলে ওঠে হৃদয়ের তল থেকে সেই মৌন আলো, যে শুধু দেখায় না, দেখে। যে শুধু শোনায় না, শোনে।

এ উপলব্ধির আলো থাকে সুপ্ত। হাজার শিখায় জ্বলে ওঠে তখনই যখন সঙ্কটের আঁধারে ভুবন ঢেকে যায়। আর এসব নিয়ে অন্যের সঙ্গে তর্ক করার মত বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। কারণ এ অনুভব যার হয়নি—আর যার হয়েছে তাদের মধ্যে প্রকাশের এমন কোনো ভাবমাধ্যম নেই যা দিয়ে ভাববিনিময় হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে বিছিয়ে গেল এক গভীর শান্তি এই ভেবে যে বিশ্বভুবনে সবাই যদি আমার এ অনুভবকে অস্বীকার করে তাহলেই বা কি আসে যায়? যার হৃদয়ে এ আলো একবারও জ্বলেছে সেই বোঝে এ আলোর ক্ষণআবির্ভাবেও যুগান্তরের তামস কেটে

যায়. এক লহমায়, যেমন করে পরমহংসদেবের ভাষায় হাজার বছরের অন্ধকার কাটে চকমকির একটি ঝলকে।

রাণাই আমার জীবনে এমন দিব্য অনুভূতির স্বাদ এনে দিয়েছে। তাই বারবারই মনে হয়েছিল ও শুধু আমার সন্তানই নয়, স্বয়ং বালগোপাল আমার ঘরে এসেছেন রাণারই রূপ ধরে। নাহলে এতটুকু শিশু কেমন করে আমার চোখের সামনে এতবড় আনন্দলোকের দ্বার খুলে দিতে পারল?

গত তিনবারের বিদেশভ্রমণে আনন্দের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু এবারের আনন্দ যেন আমার চেতনার জগতে মস্ত একটা রূপান্তর ঘটালো। তাই এ ভ্রমণস্মৃতি শুধু আমার হৃদয়ের পরম সম্পদই নয়, জীবনের ধ্রুবতারা। এরপর যখনই সংশয়ে মন আচ্ছন্ন হয়েছে, বিপদের ভ্রূকুটিতে চোখের সামনে নেমে এসেছে অন্ধকার, তখনই মনে হয়েছে, তিনি ত আছেন—যিনি চরম সঙ্কটের সীমা থেকে আমার রাণাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে আর ভয় কাকে?

ফেরার পথে বোম্বে হয়ে এলাম। বোম্বেতে অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছিলো। এখানের চিত্রজগতে বহির্মুখী চটক, মত্ততার প্রাবল্য ও উত্তেজনার চমকের প্রখরতা আছে মানি। মানি—এখানের চিত্রে কোনো বড় স্বপ্ন অথবা তপস্যার প্রশান্তির দৈন্য। কিন্তু সব মেনেও একটা কথা না মেনে পারি না যে এখানের অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীরা দেহসৌষ্ঠবকে অনাহত রাখবার জন্য যে অনলস পরিশ্রম করেন তার একাগ্রতাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। দেহলাবণ্যর একটা মূল্য আছেই। চোখকে উপবাসী রেখেও মনের দ্বারে নাড়া দেবার মত ব্যক্তিত্ব ত 'কোটিকে গোটিক'। গড়পড়তা জীবনে রূপের রাজাসন অস্বীকার করতে পারে কে? পাশ্চাত্যের কোন এক কবি যেন বলেছিলেন যার রূপ আছে তার অন্য কিছু না থাকলেও চলে। এতটা রূপপ্রশস্তি অবশ্যই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। তবু রূপসী নারী অথবা রূপবান পুরুষ সৌন্দর্যপিপাসুকে আকর্ষণ করেই।

এই রূপকে অচঞ্চল রাখতে হলে যে মূল্য দিতে হয় তা দিতে পেছপা নয় বলেই বোম্বাই তারকারা এত মনোহারিণী। ব্যায়াম, সাঁতার, রাইডিং, নৃত্য, আসন ওদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যকর্তব্য তালিকার মধ্যেই পড়ে। এই প্রাণচাঞ্চল্যের দিকটি আমার ভারী ভাল লাগে। বাংলাদেশের শিল্পীদের এদিকে একটু তৎপর হওয়া দরকার।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে চিত্রজীবনের প্রথমের দিকে আমি এদিকটায়

শৈথিল্য করিনি। নিয়মিত ঘোড়ায় চড়া, সুইমিং, ড্রাইভিং—আমারও নিত্যকর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'রাইডিং এক্সপার্ট' আখ্যাও পেয়েছিলাম। কত অনায়াসে, কত উঁচু উঁচু হার্ডলজাম্প করতে পারতাম। একবার একটি আনকোরা নতুন ঘোড়া নিয়ে হার্ডলজাম্প করবার সময় ঘোড়াটি আমায় ফেলে দেওয়ায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়ি। জ্ঞান হতে দেখি বাড়িতে শুয়ে। চারপাশে ডাক্তার-নার্স। ডাক্তার বললেন—স্পাইন্যাল কর্ড ফ্রাকচার্ড্। সেই থেকে রাইডিং ছেড়ে দিতে হোল।

'সাথী'তে অভিনয় করবার সময় কিছুদিন নাচ শিখেছিলাম, শম্ভু মহারাজের কাছে। উনি জানতেন ছবির প্রয়োজনেই অল্প কদিনের জন্য নাচ শিখ্ছি। তবু স্বল্পকালীন শিক্ষাদানেও ওঁর কোথাও এতটুকু শৈথিল্য দেখিনি। ঠিক তেমনই স্নেহে, যত্নে ও সস্নেহ পর্যবেক্ষণে পণ্ডিতজী শেখাতেন প্রতিটি তোড়া, ভাও, পদক্ষেপণ, যেমন করে আশ্রমের গুরুরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাদের নাড়া-বাঁধা শিষ্য-শিষ্যাদের। পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও সরল বিনয়ের এক পরিণত চিত্র যেন শম্ভু মহারাজ। আমাকে উনি বলেছিলেন, 'নাচ ছেড়ো না। এ নাই বা হোল তোমার পেশা। নাচের আনন্দ তোমার ভাবনায়, চলনে একটা ছন্দের মাধুর্য এনে দেবে, সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল ভরিয়ে রাখবে। তোমার এমন পদ্মফুলের মত চোখ, নমনীয় দেহ নাচেরই উপযুক্ত আধার। ভগবান সকলকে কি এ জিনিস দেন?'

নাচতে আমারও খুব ভাল লাগত। কিন্তু অনেকেই তখন বলেছিলেন নাচলে গানের গলা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই নিয়মিতভাবে নৃত্যের রেওয়াজ রাখা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু নাচ যে কি তীব্র আনন্দ শিহরণের দোল জাগাত দেহমনে! মনে পড়ে 'সাথী'তে নাচের দৃশ্য স্যুটিং-এর আগে ক্রমাগত আট ঘণ্টা রেওয়াজ করে চলেছি, একটুও না থেমে। সবাই বললেন, এত পরিশ্রম হোল, সেদিনটা না হয় 'টেক' মুলতুবী থাক। পরের দিন হবে। আমি বললাম, 'থামলে আর পারব না। যত রাতই হোক সেদিনই ফাইনাল 'টেক' হওয়া চাই।' তারপর দেখা গেল রাত রাতই থেকে গেল। একদিন বেলা একটা থেকে পরদিন সকাল নটা অবধি স্যুটিং চলেছিল।

পরদিন গা হাত পায়েই শুধু প্রচণ্ড ব্যথা নয়, পা ভীষণভাবে ফুলে গিয়েছিলো আর সে ফোলা কমতে সাত দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু সক

ব্যথা ভুলে গিয়াছিলাম একটি আনন্দের অনুভূতিতে, 'টেকটা' ত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে।

আজ ভাবি, তখন প্রতিটি কাজের মূলে ছিল কত পরিশ্রম, কত উৎসুক প্রতীক্ষা কিন্তু এতটুকুও ক্লান্তিকর মনে হয়নি ত। উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করেছি পরের মুহূর্তের ফলাফল দেখবার জন্য। সে রোমাঞ্চের অভিনব স্বাদ আজকের শিল্পীরা কল্পনা করতে পারবেন ?

যাই হোক, দেশে ফিরলাম খুব উৎফুল্ল মন নিয়েই। ওদেশে যাবার আগেই 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' এবং 'শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি'র কাজ সমাপ্ত হ'য়ে গিয়েছিলো এবং 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' মুক্তিপ্রাপ্তও হয় এবং হিট্ পিকচার্সের তালিকাভুক্ত হয়। বলা বাহুল্য দুটি ছবিরই পরিচালক ছিলেন হরিদাস ভট্টাচার্য।

'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত'র নায়ক-নায়িকা ছিলেন সুচিত্রা ও উত্তম—বাংলা চিত্র জগতের অত্যন্ত আকর্ষণীয় জোড়।

আগে সুচিত্রার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। মনে আছে সুচিত্রার পর পর কয়েকটি ছবি হিট করার পর ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিরই একজন এসে বললেন, 'সত্যিকারের একজন হিরোইন ফিল্ডে এসেছেন ম্যাডাম। শিগ্‌গির সব ক্যাপচার করলেন বলে। ঠিক আপনার মতন দেখতে।'

খুব স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহল জেগেছিলো ওর অভিনয় দেখবার। দেখেই মনে হয়েছিলো ছবিতে কাজ করবার সবচেয়ে বড় গুণ যাকে বলে ফটোজিনিক ফেস তাতে ও অতুলনীয়া। এইজন্যই ও চট করে দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে পারে। ওই চেহারার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হোল দুটি চোখ আর হাসি। চাউনির মধ্যে একটা বিস্ময় ও ইনোসেন্স ওকে এমন মায়াময়ী করে তোলে। এইরকম নানান কথা ভেবেছিলাম ওর সম্বন্ধে। ও বড়, আরো অনেক বড় হবে সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিতে এলাম, ওর একটা ছবি দেখেই।

'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত'র কাজের সময় ওকে নতুন করে জানলাম। খুব আনন্দোচ্ছল, প্রাণচঞ্চল স্বভাবের মেয়ে—যাকে বলে স্পোর্টিং। একবার আমার বাড়িতেই কিছুদিন ওর সঙ্গে একত্রে থাকবার সুযোগ ঘটেছিল।

নানান গল্পগুজব করতে করতে একবার ওকে বলেছিলাম, 'সুচিত্রা, তুমি নাম করেছ। আরও অনেক নাম করবে। অনেক বড় হবে। কিন্তু প্লীজ,

টাকার জন্য আজেবাজে রোল এ্যাকসেপ্ট করে নিজের প্রতিভার অপচয় ঘটতে দিও না। এ কাজ আমাদের করতে হয়েছে এবং তার জন্য চিত্তগ্লানির হাত থেকে রেহাই পাইনি। কারণ ওতে নিজের শিল্পীসত্তাকে বিড়ম্বিত করা হয়. সে অধিকার আমাদের একেবারেই নেই। সে সত্য তখন বুঝিনি, আজ বুঝেছি।' ওর মনও একথায় সায় দিয়েছিলো।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। আজ স্থির নক্ষত্রের মতই আপন স্বাতন্ত্র্যে ও আপনি উজ্জ্বল। নিজেকে দুর্লভ রাখতে জানে বলেই আজও ও ফুরিয়ে যায়নি।

আরো একটা কারণে বয়সে ছোট হলেও সুচিত্রার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আমাদের যুগ ছিল ডিকটেটরশিপের যুগ। মন সায় না দিলেও ডিরেকটর, প্রোডিউসরদের অনেক অন্যায় জুলুম আমাদের মানতে হয়েছে। কারণ সে অধ্যায় শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র নয়, কর্তৃপক্ষের অহমিকা বিকাশের যুগ। কিন্তু সুচিত্রা সে যুগ উল্টে দিয়েছে। প্রথম যুগের সকল অবিচার, অত্যাচার, অন্যায়ের প্রতিবাদ,—এক কথায় একটা যুগের বিদ্রোহ ওর মধ্য দিয়ে কথা বলে উঠেছে।

অনেকসময়ই ওর উগ্রতা হয়ত অনেককে অসহিষ্ণু করে তোলে। কিন্তু অনেক পর্বতের বাধা, খাদ, গহ্বর, অসমতল পথ অতিক্রম করে আসা নদীর বেগ দুর্বার দুর্দমনীয়। সুচিত্রাও তাই। প্রচলিত সংস্কার, প্রথার বেড়া ভাঙার বিদ্রোহে উগ্রতা ত থাকবেই। পরে যখন ব্যালান্সড হবে সবই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। যে প্রতিবাদ জানানো নানান কারণে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তা এসেছে ওরই মাঝ দিয়ে। এইখানেই ও অনন্যা। এ.সত্য মানতেই হবে।

ব্যক্তিগতভাবে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই মধুর। কয়েকবছর আগে আমার হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়েই ও খবর নিয়েছে, দেখতে আসতে চেয়েছে। তখন ডাক্তারের অনুমতি ছিল না—তাই আসতে পারেনি। কোলকাতার বাইরে চলে গেছে। এসেই আবার খবর নিয়েছে। ওর এই স্নেহসজল উদ্বেগ আমি সকৃতজ্ঞে স্মরণ রাখব।

পরের ছবি 'ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি'তে অন্নদাদিদির চরিত্রে নিজেকে যেন নতুন করে খুঁজে পেলাম। স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেও অন্নদাদিদি কুলত্যাগিনী, ধর্মভ্রষ্টা। কি বিচিত্র বিধান! বিকাশবাবু অন্নদা-

দিদির স্বামীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছিলনে। ওঁর অভিনয়-প্রতিভার ডাকেই শাহ্‌জী যেন বই-এর পাতা থেকে উঠে এসে পর্দার বুকে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রযোজিকা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে এক কৌতুকবহ অভিজ্ঞতার কথা আজও ভুলতে পারিনি। কোন এক হিরোইন, প্রতিদিন সকালে সাঙ্গপাঙ্গসহ সেটে এসেই অর্ডার করতেন ছ'টা হাফ বয়েলড ডিম, এক পাউণ্ড রুটি আর এক টিন মাখন। লাঞ্চে চাইনীজ হোটেলের ফ্রায়েড রাইস, আমজাদিয়ার চিকেন রোল, আমীনীয়ার চাঁপ, স্কাইরুমের চিকেন টেট্রাজেনী; বিকেলে চাই মুড়ি, গরম তেলেভাজা সমেত দু'পট চা, আঙুর, আপেল, কমলালেবু, কলা, পেঁপে এবং সম্ভব হলে আরো রকমারী ফল।

বলা বাহুল্য, এ সকল চাহিদাই পূর্ণ করতে হয়েছে বিনা বাক্যব্যয়ে, আর মনের পটে ভেসে উঠেছে পাশাপাশি দুটি ছবি। দুটি যুগের। এক যুগের নায়িকাকে সেটে এসে অবধি আপন আসনে ত্রস্ত হয়ে বসে থাকতে হয়েছে প্রতিমুহূর্তে পরিচালক ও কর্তৃবৃন্দের নির্দেশ ও আদেশ তামিলের প্রতীক্ষায়। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর লাঞ্চ হিসাবে কপালে জুটত ডাল, ভাত, একটুকরো মাছ, আর স্পেশ্যাল লাঞ্চ যেদিন থাকত, পাওয়া যেত দু-এক টুকরো রুটি মাংস ও এক টুকরো আলু।

পরের যুগ। চর্ব্যচুষ্য-লেহ্যপেয় দিয়ে কর্তৃপক্ষ হিরোইনদের সেবায় রত, তাঁর তুষ্টি বিধানে ব্যগ্র। তাঁর মুড যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য সদাসন্ত্রস্ত।

নিস্পৃহ দর্শকের দৃষ্টিতে দেখলে এও এক উপভোগ্য অভিজ্ঞতা বইকি।

ওদেশ থেকে রাণাকে নিয়ে আমি ফিরে এলাম। উনি রয়ে গেলেন—ওঁর কিছু কাজ বাকী ছিল বলে।

ছবির কাজের চাপ একটু কমল, রাণা সুস্থ হোলো, বিদেশ ভ্রমণও সাঙ্গ হোলো। দীর্ঘদিনের ব্যস্ততা ও অনবকাশের পর এল সেই শান্ত লগ্ন—যখন মনের কোণে সঞ্চিত ইচ্ছেগুলোর দিকে তাকাবার সময় পাওয়া গেল।

বহুদিন আগে। একবার স্টুডিও থেকে বাড়ি ফেরবার সময় গাড়িতে উঠতে যাব, এমন সময় ঘোমটায় সারা মুখ ঢাকা এক মহিলা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডান হাতটি মেলে ধরলেন। ফর্সা হাত; শীর্ণ হাতের শিরাগুলো

বড় বেশী স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন ব্যাগে বিশেষ কিছুই ছিল না। সব মিলিয়ে হয়ত গোটা পাঁচেক টাকা, কি তাও হবে কিনা সন্দেহ, তাঁর হাতে দিলাম।

স্টুডিওর কয়েকজনের কাছে শুনলাম ইনি এককালের নামকরা শিল্পী। আজ অবস্থার ফেরে এই দশা। আর একটি ঘটনার কথা শুনেছিলাম। এক ভারতখ্যাত অভিনেতাকে স্টুডিও-ফ্লোরে একজন গিয়ে খবর দিল এক ভিখারিণী শ্রেণীর মহিলা (ঘোমটায় তার মুখ ঢাকা) শুধু উক্ত-শিল্পীর কাছেই তাঁর বক্তব্য নিবেদন করবেন। উক্ত অভিনেতা সাহায্যপ্রার্থিনী সেই মহিলার সঙ্গে দেখা হতেই চমকে উঠলেন। আরে! ইনিই ত সেই মহিলা যিনি তাঁকে প্রথম অভিনয়জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেন।

যাই হোক, সেদিন ঐ ঘটনার পর থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে মনটা খুবই বিচলিত হয়ে রইল। সকল কাজের মাঝখানে চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো দুটি দৃশ্য। একটি ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে ঝলমলে নায়িকা, যাঁর একটি কটাক্ষ ও হাসির জন্য সমাজের গুণীমানী ব্যক্তি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। আর একটি ঘোমটায় মুখঢাকা মলিনবসনা এক দুর্ভাগিনীর শীর্ণ হাতখানি মেলে ধরার করুণ ছবিখানি। আজ যে লক্ষ লক্ষ লোকের নয়নমণি কাল তার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের ভয়াবহ পরিণতিতে 'আহা' বলবারও কেউ নেই। এ মুহূর্ত ত যে কোনো শিল্পীর জীবনেই আসতে পারে। সাধারণ মানুষের ধারণা শিল্পীরা বাস করেন এক ইন্দ্রধনু ঘেরা স্বপ্নলোকে। প্রাত্যহিক জীবনের অভাব-দৈন্যের গ্লানিমা সেখানে ছায়াপাত করতে পারে না।

এ সত্য স্বল্প কয়েকজন শিল্পীর জীবনে সত্য হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ শিল্পীর জীবনের প্রসঙ্গে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের দুটি চরণই প্রযোজ্য –'দেহপট সনে নট সকলই হারায়—'।

কিন্তু আমরা যদি হারাতে না দিই? মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন হঠাৎ জলে ওঠা নতুন পথের একটা আলোরেখা দেখতে পেলাম। বাংলা-দেশের মহিলাশিল্পীরা মিলে একটা সংস্থা গড়ে তুললে কেমন হয়? তারপর অবসর সময়ে নাটক মঞ্চস্থ করে—তারই সঞ্চিত অর্থে একটা বাড়ি তুলে শিল্পী-বোনেদের দুর্দিনের আশ্রয়ের সংস্থান করি? মলিনা, সরযু, সুনন্দা,

চন্দ্রা, রেণুকা প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে এই পরিকল্পনার কথা বলতে ওরাও খুব উৎসাহিত হোলো।

কিন্তু তারপরই মনে ঘনাল সংশয়ের ছায়া। এও কি সম্ভব? সামান্য কজন মহিলা মিলে এতবড় ব্যাপার? দূর! সবই যদি শেষকালে ছায়াবাজি হয়ে দাঁড়ায়? লোকে হাসবে না?

কিন্তু যদি সফল হই? তাহলে ত সারা, ভারতবর্ষে আমরা এই আদর্শ রেখে যেতে পারব যে দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত মহিলাশিল্পীদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছেন মহিলাশিল্পীরাই। আর স্বপ্ন যদি স্বপ্নই থেকে যায় তাতেই বা দুঃখ কিসের? মন্ত্রের সাধন যদি সিদ্ধ নাই হয় সাধনাটা ত মিথ্যে নয়?

আমরা সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগলাম। ফিল্ম ও মঞ্চের নামকরা অভিনেত্রীরা ছাড়াও বহু অতিথি ও এ্যামেচার শিল্পী আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দল ভারী করলেন।

প্রথমে আমাদের মিলনসভার কোনো নির্দিষ্ট গৃহ না থাকায় কোনোদিন আমার বাড়ি, কোনোদিন চন্দ্রার বাড়ি, কোনোদিন মলিনার বাড়ি, কোনোদিন বা সুনন্দার বাড়ি এইভাবে পালাপালি করেই অধিবেশনের কাজ চলছিল। অবশেষে সামান্য দক্ষিণায় নৃত্যভারতীর ঘরটি ব্যবহার করতে দিয়ে প্রহ্লাদ দাস ও নীলিমা দাস আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এছাড়া সারা দেশবাসীর দেওয়া উৎসাহ ও প্রেরণাও ভোলবার নয়। সাংবাদিক মহলের ঋণ ত শোধ হবার নয়।

প্রথমবার নাটক দেখাবার পর যা টাকা উঠেছিল সেটা আশার অতিরিক্ত। তারপর ধীরে ধীরে মহিলাশিল্পীমহলের নাটক এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে কোলকাতার বাইরে থেকেও প্রচুর আমন্ত্রণ আসতে লাগল। এমনই করে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হোলো। আমরা গরচা রোডের বাড়িটি কিনলাম।

সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারিনি। এও সম্ভব হোলো? কোনো সরকারী বা অন্য কোনো সাহায্য ছাড়াই বাড়ি উঠে গেল? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সুনন্দা পট্টনায়ক, মহম্মদ সগীরুদ্দিন ও ওস্তাদ কে মিতুল্লা খাঁন আমাদের মহিলাশিল্পীমহলের 'শো'-এর সময় বিনা দক্ষিণায় একটি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে আমাদের অর্থসংগ্রহে সহায়তা করেছেন। শিল্পী

মহলের পক্ষ থেকে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, সুচিত্রা সেন ও সুনন্দা পট্টনায়ক আরও বেশ কয়েকজন ডোনেশন দিয়ে আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

উদ্বোধন উৎসবের পুণ্যদিনটি মনে পড়ে। সেদিন ছিল চন্দ্রলোকচারীদের চাঁদে পৌঁছানোর দিন। সেদিন সকালে উঠেই মনে হয়েছিল আমাদের এই জয় চাঁদে পৌঁছানোর চেয়ে কি কিছু কম রোমাঞ্চকর?

ডঃ রমা চৌধুরী উৎসব-সভা উদ্বোধন করে বলেছিলেন, 'অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু'—আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই প্রতিটি কথা ধ্বনিত হয়েছিলো আর প্রতি রক্তকণায় এই প্রার্থনাই বেজে উঠেছিলো এ বাণী যেন আমাদের মহিলাশিল্পীদের কাজে ও জীবনে সত্য হয়ে ওঠে?

রাধামোহনবাবু পঞ্চাশ টাকার একটি চেক পাঠিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেইদিনই সুকমলকান্তিবাবু প্রথম আমাদের মহিলাশিল্পী-মহলে এলেন। বাড়ি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন 'করেছেন কি! মাত্র কয়েকজন মহিলা মিলে এতবড় কাণ্ড করেছেন?' শুধু তাই নয়। ভবিষ্যতে উনি সর্বরকমে মহিলাশিল্পীমহলকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে এসেছেন।

সাংবাদিকমহল, শিল্পীমহল এবং সাহিত্যিকমহলেরও অনেকের পদধূলি পড়েছিল আমাদের মহিলাশিল্পীমহলের গৃহপ্রবেশের পুণ্য উৎসবে। সকলের মুখে ঐ একই কথা 'আপনারা ত পুরুষদেরও লজ্জা দিলেন। সারা বাংলাদেশে এত প্রতিষ্ঠান এত কর্মকেন্দ্র কিন্তু শুধুমাত্র নাটক মঞ্চস্থ করার অর্থ দিয়ে বাড়ি করতে কাউকে দেখিনি।'

পরের দিন প্রায় সব কাগজেরই ছিল ঐ একই বক্তব্য: 'First of its kind in India' –একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন তারা।

অনেকেই আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'কথায় বলে তিনজনে একসঙ্গে কাজ করলেই কলহ। কিন্তু আপনারা এতজন একসঙ্গে কাজ করেন, কোনো কলহ হয় না? এতগুলি লোকের একপ্রাণ হয়ে চলা কি সম্ভব যেখানে এতজন নামী শিল্পী আছেন? এঁদের মধ্যে চিত্রপরিচালিকা প্রযোজিকাও আছেন। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এড়ানো কি সম্ভব?'

এর উত্তরে এই কথাই বলব—এটা সত্যিই অসম্ভবের এলাকাতেই

পড়ে। কিন্তু আমরা কোনো কিছুকে এড়িয়ে চলতে চাই না। সবসময় সত্যের মুখোমুখিই দাঁড়াতে চাই সে সত্য যতই নিদারুণ হোক না কেন। মতান্তর, মনান্তর, মাঝে মাঝে হয় নিশ্চয়। কিন্তু সেসব নেই কোথায়? বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীতে, ভাই-বোনে, মা-বাবার মধ্যে মতবিরোধ হয় না? কিন্তু সে কি চিরস্থায়ী হয়? না, হতে পারে?

এখানেও আমরা একটা বিরাট পরিবারের মত। সবার মধ্যের স্বাতন্ত্র্য সত্বেও উদ্দেশ্যের সততার প্রতি সকলেরই এমন একটা আন্তরিক ভালবাসা আছে যে তারই টানে আমরা যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা আছি।

মহিলাশিল্পীমহলের সার্থকতা আমায় যতটা আনন্দ দিয়েছে এমন অনাবিল আনন্দ জীবনে কমই পেয়েছি। আমার ওপর সকলের ভালবাসা, নির্ভরতা প্রতি মুহূর্তে আমায় কর্মে উদ্দীপ্ত করেছে। মলিনা, সরযূ, মঞ্জু, অনুভা, নমিতা, সাধনা এবং আরো কত নামকরা শিল্পী যাঁদের কত নাম, যশ, সম্মান। কিন্তু সব দায়িত্বভার শিশুর মত নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় এঁরা আমায় সঁপে দিয়েছেন। হৃদয়ের কতখানি প্রসারতা থাকলে তবে এটা সম্ভব একথা ত সারাজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝি।

সব সময় ক্ষমতাকে একচেটিয়া করে রাখলে আখেরে লাভের চেয়ে ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশী। সেই কথা ভেবেই একবার আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম প্রতিবারই মলিনা, সরযূ, মঞ্জুর পরিচালনায় 'মিশরকুমারী' এবং অন্যান্য নাটকের সার্থকতা ত ট্রায়েড। একবার কম বয়েসীদের সুযোগ দিয়ে তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা হোক না। ছন্দার পরিচালনায় 'মঞ্জরী অপেরা' মঞ্চস্থ হোলো এবং রসিকমহল তা সাদরে গ্রহণ করেছেন।

আর একটা কথা ভোলবার নয়। মহিলাশিল্পীমহলের বাড়ি হওয়ার পর আমাদের টাকায় টান পড়ে। তখন সভ্যদের মধ্যে অনেকেই সাধ্যমত ঋণ দিয়ে সংঘকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমাদের এই মহিলাশিল্পীমহলেরই একটি মেয়ে, বেচারা থিয়েটার ছাড়াও যাত্রা ইত্যাদিতে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করে, সে যখন পঞ্চাশটি টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দিদি' এটা তোমার কাজে লাগলে খুশী হব। এ টাকা আর আমি ফেরত চাই না।' চোখের জল আর রাখতে পারিনি। ঐ পঞ্চাশ টাকাই সেদিন আমার কাছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সমান মনে হয়েছে।

কিন্তু এমন আনন্দের হাটে বসেও কোন নিরালা মুহূর্তে বিষণ্ণতার সুক্ষ্ম

কি প্রাণে বাজেনি? যে মহিলাশিল্পীমহল আমার প্রাণ, এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সত্যের সাধনার পীঠস্থান, সেই মহিলাশিল্পীমহলের সকলের প্রাণের সুর—আমার সুরের সঙ্গে সমতালে বাজবে এইটেই আমার মর্মের একান্ত বাসনা। অনেক সময়ই তা বেজেছে। কিন্তু সুরে বাঁধা বীণার তার কখনই ছিঁড়ে যায়নি এমন কথাও বলা যায় না।

নানাদিক থেকে এমন ইঙ্গিত কি কখনও আসেনি যে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য আমার প্রাণঢালা পরিশ্রম নিখাদ, নিঃস্বার্থ আদর্শের খাতেই চলেনি। আমার ক্ষমতালিপ্সু মনের গোপন তাগিদেই আমি একাজ করেছি? নিজের নামটা চিরদিনের জন্য স্বার্থত্যাগী কর্মব্রতীর পুরোভাগে রাখবার আকাঙ্খা নেই এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। ভেবে দেখবার মতই। অবসর সময়ে নির্জনে বসে নিজের সমস্ত দোষ-ত্রুটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিজের দুর্বলতাকে চিনে নেওয়া এবং তাকে জয় করবার চেষ্টাও মানুষের অবশ্য পালনীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলেই মনে করি। এ কাজে আমি হেলা করিনি। আর চিত্তশুদ্ধির নির্মম আলোয় বার বার হৃদয় ভরে গেছে এই পথেই।

মহিলাশিল্পীমহল ও তাদের অবদান দুঃস্থ শিল্পীদের গৃহনির্মাণ আমার সার্থক কর্মজীবনের অন্যতম ফসল হয়ে থাক—এটা আমি চাইনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

কিন্তু অনেক ভেবে এইটুকুই বোঝার কিনারায় এসেছি যে সংসারে ছোট জিনিস যেমন স্বার্থকেন্দ্রী বড় জিনিসও তাই। মানুষের ছোট আদর্শ যেমন তার স্বার্থ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, বড় আদর্শও তেমনই উদারতার স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বড় স্বার্থ তার সার্থকতার জন্য অন্য পাঁচজনকেও কমবেশী সার্থক করে তোলে, যেখানে ছোট স্বার্থ তার পরিসরের সঙ্কীর্ণতার দরুন এরকম কোনো গভীর আনন্দের পরশ পায় না।

একই নিঃশ্বাসে দুটো নাম উচ্চারণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে এখানে বিটোফেনের প্রসঙ্গ আনছি শুধু আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য। বিটোফেন তাঁর মুনলাইট সোনাটা অথবা নাইনথ সিম্ফনি রচনা করেছিলেন মূলতঃ তাঁর সৃষ্টির প্রেরণায়। তাই এ প্রেরণার উৎসে যে প্রকাশ-প্রবৃত্তির

চরিতার্থতার স্পর্শ আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে জীবনের মধ্যে একটা গভীর মিলের সুর আছে বলেই বিটোফেনের অনুপম সঙ্গীত সৃষ্টিতে শুধু তাঁর স্বার্থের সার্থকতাই মেলেনি, মানুষ এর মধ্যে একটা অভিনব রসনির্ঝরের সন্ধানও পেয়েছে। জীবনের অশেষ দ্বন্দ্বদৈন্যের মাঝখানে এ মিলের সুরের রেশটি পরম পবিত্র।

তাই ভাবছিলাম মহিলাশিল্পীমহল যদি আমার কীর্তিপ্রকাশের উদ্দেশ্যেও সৃষ্টি হয়ে থাকে, এর সঙ্গে যুক্ত সকলেরই তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভটাই কি বড় হয়ে ওঠেনি?

আজকের এই দ্রুত কর্মব্যস্ত জীবন ও যুগে যে যার আপন কাজে ও স্বার্থে সীমিত। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও ত সবাই লাভের গণ্ডী ছেড়ে বিনা-লাভের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে মিলেছি। প্রত্যেকেই সাধ্যমত সময়, পরিশ্রম ও প্রতিভার মূল্য দিয়ে এমন একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পেরেছি যা সারা ভারতে দ্বিতীয় রহিত। গৃহনির্মাণের পর যদি একটি শিল্পীও তাঁর শেষ জীবনে দীনবেশে, জীর্ণশয্যায়, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়, ব্যাকুলচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর যাপন করার অভিশপ্ত মুহূর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন, যদি নিশ্চিন্ত নির্ভর চিত্তে এইটুকু সুখস্মৃতি নিয়ে যেতে পারেন যে তাঁর কর্মজীবনের শেষে রিক্ত ডালি ভরে উঠেছিলো, শিল্পী বোনদের স্নেহে, যত্নে, সেবায়, আদরে, তবে সেই দুর্লভ আনন্দটুকু বড় করে দেখে নিজেদের সার্থক মনে করব না, কল্পিত জমা-খরচের খাতা খুলে গম্ভীর মুখে এই হিসেব করে মন কালো করব যে এর মধ্যে পরিকল্পনাকারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনাই বড় আর সব মিথ্যা।

যে মেয়েটি নিজের অনেক বাস্তব ক্ষতিকে স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করে বহু আয়াস-সাধ্যিত অর্থের অনেকখানি সামতিকে দিয়ে ফেলল সে কি একাজ পারত যদি প্রতিদিনের অভ্যস্ত সীমায় বাঁধা থাকত? আপনাকে অতিক্রম করার এই মহৎ আবেগ, কি তার জীবনের অন্য একটা পরিণতির আভাস দেয় না?

মানুষের জীবনের এই পরিণতির স্বপ্নই আমি চিরকাল দেখে এসেছি আর এই স্বপ্নকেই বাস্তবসত্যের মত প্রত্যক্ষ করলাম আমার চারপাশের মানুষের জীবনে। মহত্ত্বের স্পর্শটুকুই আমার কাছে বড়, মানুষের ছোটখাটো দীনতা ও ক্ষুদ্রতার চেয়ে।

যদি এমন দিন আসে, এত সাধের মহিলাশিল্পীমহল আমায় ছেড়ে চলে

যেতে হয়, তার জন্যও বিধাতার কাছে এতটুকুও নালিশ জানাবো না। যিনি আমার জীবনপাত্র অকৃপণ দানে ভরে দিয়েছেন তাঁর নির্দেশই দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেব। শুধু এই মধুর স্মৃতিটুকুই মনের দিগন্ত রাঙিয়ে রাখবে যে আমরা মিলেছিলাম। আমাদের অনেক অসাম্য, অনেক বিরোধিতা অনেক অসম্পূর্ণতার বাধাকে অতিক্রম করে আমরা এক হয়েছিলাম, আমাদের স্বপ্নে, আদর্শে, উদার বিস্তৃতিতে, এবং এ মিলনে কোনো খাদ ছিল না। আর ছিল না বলেই আমরা গৃহ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে এক বিদেশী উপকথার গল্প।

এক নিঃসঙ্গ দরিদ্র ছেলে—পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে দেশের রাজকুমারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল রাজপ্রাসাদের অলিন্দদ্বার থেকে। রূপসী রাজকন্যা তাঁকে অন্তরঙ্গ দাসী মারফত ডেকে নেন—আপন প্রাসাদে। রাজকন্যার রূপ দেখে কিশোরের চোখের পলক পড়ে না। মানুষের দেহে এত রূপ সম্ভব? রাজকন্যাও মুগ্ধ তার বিস্ময়ভরা নিষ্পাপ দৃষ্টি ও কিশোর লাবণ্য দেখে। দুজনের বিবাহ হয়ে গেল।

নিত্য নতুন রংবাহারের আলোকিত রাতে শিল্পিত কক্ষে, সুরভিত বসনভূষণে স্বপ্নের মত কাটে তাদের দিন। একদিন কিশোর গেছে বেড়াতে। তখন রাজকন্যার ওপর আসক্ত—তার প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করে রাজকন্যাসহ রাজপ্রাসাদ অদৃশ্য করে নিয়ে গেল আপন দেশে। কিশোরটি ফিরে দেখে ধুধু করছে প্রান্তর। রাজপ্রাসাদ নেই, নেই সেই নানারঙা ফুলের স্বর্গোদ্যান। আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি, কোথায় সেই রূপময়ী, প্রেমময়ী রাজকন্যা যাকে দেখলেই মনের মধ্যে আলোর নূপুর বেজে উঠত? তবে কি সবই মায়া?

সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি পড়ে আঙুলে রাজকন্যার আপনহাতে পরানো লাল মণিবসানো আংটির দিকে। লাল মণিটি ত ঠিকই জ্বলছে তাদের রাঙা হৃদয়ের ভালবাসার মত। সবই যদি মায়া তবে এ মণির কায়া রইল কেমন করে? আংটিশুদ্ধ আঙুল গালে চেপে ধরে। চোখের জল টপটপ করে পড়ে ঐ অঙ্গুরীয়কের মণির পরে।

বহু পরিচিত ব্যক্তির বিস্ময় এবং অপরিচিতের চিঠিতে থাকে একটি প্রশ্ন—কেন আমি অভিনয় ছেড়ে দিলাম? অন্নদাদিদি অথবা রেজিয়াবিবির

চরিত্রাভিনয় কি এই সত্যকেই পরিস্ফুট করেনি যে, আজও আমার অভিনয়-ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি? তবে কি হিরোইনের রোল ছাড়া অন্য কোনো রোলে অভিনয় করার কথা ভাবতে পারি না বলেই আমি চিত্রজগৎ ত্যাগ করলাম?

হয়তো তাঁদের কথা মিথ্যে নয়। হয়ত উপযুক্ত রোল পেলে আমার অভিনয় আজও ব্যর্থ নাও হতে পারে। হয়ত আমার অভিনয়-ক্ষমতার কিছু অবশিষ্ট আজও আছে। কিন্তু ঐখানেই ত যত গোল।

আপনাপন ক্ষেত্রে কোনো শিল্পীর ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলে সকলের করুণার পাত্র অথবা পাত্রী হয়ে অবসন্ন দেহ ও মন নিয়ে তবে তিনি ফিরে আসবেন—এর চেয়ে অশিল্পীজনোচিত আচরণ আর কিছু হতে পারে না। সকল বৈভবে উদ্ভাসিত তার যে ব্যক্তিত্ব শিল্পরসিক শ্রদ্ধায় আদরে বরণ করে নেন, সেই অপরূপ সুষমার ছবিটি তাঁদের স্মরণপটে চিরদিন জাগিয়ে রাখার সূক্ষ্ম সুকুমার বোধও শিল্পীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলেই আমি মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমার এক বান্ধবীর কাছে শোনা একটি কথার উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে। সে বলে বেসরকারী অফিসে ক্ষমতালিপ্সু মানুষের চেয়ারের আসক্তি এমনই সীমাছাড়ানো যে, কাজ করবার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবার পরও তরুণদের জন্য চেয়ার ছেড়ে দিতে তারা নারাজ। একেবারে অপারগ অবস্থায় ইনভ্যালিড চেয়ারে করে সরানো না হলে তাঁরা সরেন না।

কথাটি কৌতুকা : হলেও এর অন্তরের ভয়াবহতা ও কারুণ্য হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি জীবনের শেষদিন অবধি নিজের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার মত বোধ ও বুদ্ধি তিনি যেন কেড়ে না নেন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ভারসাম্য হারিয়ে নিজেকে অপরের হাসি অথবা করুণার পাত্রী করে না তুলি। জীবনে এগিয়ে চলার দুর্দমনীয় অবেগ যতখানি প্রয়োজন, ঠিক ততখানি প্রয়োজন আছে ঠিক জায়গায় থামতে জানার। এই দিকে ভুল হওয়াটা গান হওয়ার পরও সমে-পৌছতে না পারার মতই অপরাধ। কবিগুরুর 'যাবার সময় হলে যেও সহজেই'—কথাটিতে আমি ভারী বিশ্বাস করি।

তা বলে কাজ কি থেমে থাকবে? কর্মবিরতি মানেই ত মৃত্যু। নদীর গতিপথের মতই কাজের ধারারও পরিবর্তন ঘটবে। নূতন কাজের ক্ষেত্র

তৈরী করে নিতে হবে। জীবনের সকল চিন্তা, আবেগ ও কর্মশক্তি দিয়ে সেই নুতন কাজের জগৎকেই সার্থক করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সার্থক হওয়া অথবা না হওয়াটা আমাদের হাতে নয়। কিন্তু উত্তমটাকে নিভতে দিলে চলবে না। অসংখ্য কর্ম ও বন্ধনেই জীবনে আনন্দ,—তবে লক্ষ্য রাখতে হবে বন্ধনটা যেন মানুষের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাজাত ভালবাসার বন্ধন হয়। এ যেন শৃঙ্খল হয়ে উঠে জীবনের গতিপথ রুদ্ধ না করে।

শিল্পীদের, বিশেষ করে চিত্রশিল্পীদের জীবনের যে জিনিসটি আমায় বরাবরই পীড়া দিয়েছে, সে হোলো একটা তথাকথিত অর্থহীন গ্ল্যামারের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আপনাদের সীমাবদ্ধ করে রাখা। স্টুডিওর কাজ এবং কাজ শেষ হলে কয়েকজনের সেই একঘেঁয়ে সঙ্গ, তোষামোদ, একই ধরনের রঙ্গরসিকতা, ড্রিঙ্কস, লঘু ও অসার আমোদ-পরিহাস জীবনে শ্রান্তি আনে, এগিয়ে চলার উদ্দীপনাকে স্তিমিত করে এবং মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক-গুলি অনুদ্ঘাটিত থাকার জন্য জীবনবোধও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারই জন্য অনেক সত্যিকারের প্রতিভার অধিকারীর জীবনে ও শিল্পকর্মে সে বিকাশ ঘটতে পারে না যে-বিকাশ ঘটতে পারত ঐ একটুখানি সীমিত জীবনের বাইরের জীবনযোগ করলে।

কথাটা বোধহয় আরও একটু প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে বলা দরকার।

ধরা যাক খ্যাতির মধ্যগগনে আসীন কোনো এক তারকা। স্টুডিও-ফ্লোরে স্যুটি-এর পর ফিরলেন আপন আবাসে। তারপর বসলেন মহার্ঘ পানীয় নিয়ে। সঙ্গে জুটলেন স্তাবক ও মোসাহেবের দল, যাঁরা উক্ত তারকার ব্যয়ে সেইসব পানীয় পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যান, যে সব পানীয়ের স্বাদ পাওয়া তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। তারপর রাত হলে কোনো অভিজাত হোটেলে অথবা বাড়িতেই দেশী-বিদেশী নানা খাদ্যে এইসব মোসাহেবদের আপ্যায়িত করে অনেক রাতে যখন উঠে দাঁড়ান, তখন স্থির হয়ে দাঁড়াবার মত কর্তৃত্ব তাঁদের চরণযুগলের ওপর থাকে না।

কি পান তাঁরা এইসব অনুগত স্তাবকদের কাছে? এই স্তুতিগানেই তাঁদের কর্ণকুহর ভরে থাকে যে তাঁদের রূপযৌবন অন্তহীন। তাঁদের দেহতারুণ্যের কাছে স্কুলের কিশোর-কিশোরীদের পিতামহ, পিতামহী মনে হয়। যশ ও খ্যাতির অমরাবতী তাঁদের দুয়ারে বাঁধা। জগতের চোখে এরা নন্দনকাননের বাসিন্দা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব স্তবস্তুতি শিল্পীকে বিভ্রান্ত করে তোলে এবং নিজের সম্বন্ধে তাঁদের নিজেরই একটা মোহগ্রস্ত ধারণা জন্মে যায়। এমনকি মানুষকে পর্য্যন্ত তাঁরা সম্মান করতে ভুলে যান। হয়তো ভাবেন এক পেগের মূল্যেই যাদের স্তবস্তুতি কেনা যায় অন্য কোনো মূল্য তাঁদের দেবার প্রয়োজনটা কি? বলা বাহুল্য ক্যানিউটের মত স্বচ্ছ দৃষ্টি এঁদের কাছে আশা করা মূঢ়তা।

যাই হোক এই রকম জীবনযাপনে ছবির কাজ চলে গেলেও আত্ম-বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শিল্পীও মানুষ। আর মনুষ্যত্বকে একটা মহৎ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তার আছেই। এ-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াটা পলায়নী মনোবৃত্তি বলেই আমি মনে করি।

ঈশ্বরের করুণায় চিত্রজগতের বাইরের বিরাট জগৎকে জানবার, দেখবার, বিভিন্ন চরিত্রের অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ভাল মন্দ, সম্পূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা দোষগুণে মেশানো মানুষের সংস্পর্শ আমার জীবনে অন্ততঃ সেটুকু প্রসারতা এনে দিয়েছে যেটুকু প্রসারতা থাকলে জীবনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার আগ্রহ জন্মায়।

কর্মজীবনের সামান্যতম প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেও মনে হয়েছে আমার জীবনের অর্থ, যশ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম সবই ত আমার দেশের জনসাধারণের দান। তাঁরা স্বীকৃতি না দিলে আমার গান, অভিনয় কোনো কিছুই মূল্য পেত না। তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা না পেলে নিজেকে মেলে ধরবার এমন অনুপ্রেরণা জাগত না। তাঁরা বহু আয়াসে অর্জিত অর্থ ব্যয় করে আমাদের ছবি না দেখলে আমার অদৃষ্টে এমন মনোরম অট্টালিকা, গাড়ি এবং বিরাট পরিবার প্রতিপালনের আনন্দ জুটত না। তাই ত জীবনের চরম গৌরবের মুহূর্তেও এঁদেরই আমি দেবতার মত পূজ্য বলে মনে করেছি। দেবতার প্রসন্ন হৃদয়ের বরদান ত এসেছে এঁদেরই মাঝ দিয়ে। সহৃদয় পাঠক আমার বক্তব্যকে আত্মবিজ্ঞপ্তির ঢাক-পেটানো ভেবে ভুল বুঝবেন না, এ-বিশ্বাস সত্ত্বেও সসঙ্কোচেই বলছি—আমার কাছে এসেছে ক্যান্সার হসপিটালে বেড করে দেওয়া, গভর্নমেণ্টের তহবিলে বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির জন্য ডোনেশন দেওয়া অথবা মহিলা শিল্পীমহল গড়া—এসবই হোলো আমার মহত্ত্বের ভান, উদারতার সুগারকোটিং। আসলে আমি যশলোলুপ, ক্ষমতাপ্রিয় ইত্যাদি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে জানাই যখনই জীবনে প্রাচুর্য এসেছে তখনই মনে প্রশ্ন

জেগেছে তাঁদের জন্ত আমি কি করলাম যাঁরা আমাকে এই সমৃদ্ধির অধিকারিণী করেছেন? আমি, আমার পরিবারবর্গ চব্যচুষ্য ভোজন করে, সুসজ্জিত হয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি যখন আমার দেশের অগণিত নরনারী অনাহারে, জীর্ণবাসে, বিনা চিকিৎসায় অকালমৃত্যু বরণ করছেন। তাঁরাও ত আমারই মা, বাবা, ভাইবোন ও সন্তানতুল্য। এঁদের জন্য বুকটা ফেটে যায়। কিন্তু কি করতে পারি? কতটুকু করার সাধ্য আমার আছে? যেটুকু করতে পারব তা হয়ত তাঁদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব এই ভেবে যে দরিদ্র দেশের মানুষের এছাড়া উপায়ই বা কি? রামায়ণে রামচন্দ্রের জন্যে কাঠবিড়ালীর সাহায্য করার গল্পটি আমায় এঁদের সামান্যতম কাজে লাগবার প্রচেষ্টায় উদ্দীপিত করেছে।

আর ভান? সেই ভস্মমাখা ভণ্ড সাধুর গল্প ত সকলেরই জানা। যে চুরি করে পালাতে গিয়েও আক্রমণকারীদের এড়াতে না পেরে ছাই মেখে সাধু সেজে বসল। তখন তাকেই সত্যকার সাধু ভেবে দণ্ডদাতারা দণ্ডবৎ করে চলে গেলেন। চোরের তখন চেতনা হোলো—তাই ত! যার ভেক দেখেই এরা মুগ্ধ, যদি সত্যি করেই তাই হওয়া যায়, তবে এরা আমায় নিয়ে কি করবে? এ উপলব্ধি জাগার সঙ্গে সঙ্গেই হীন তস্করের সত্যিকারের সাধুতে রূপান্তর ঘটল।

এতবড় মহৎ রূপান্তর জীবনে ঘটবার মত কোনো পুণ্য কাজই আমি করিনি। তবে নানা মানুষের সংসগে এসে চেতনার দিব্যদৃষ্টি একটু-আধটুও মেলেনি কি আর? এই দৃষ্টির প্রসাদেই ত মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি তার আপাত-ক্ষুদ্রতা ছাপানো দেবত্বকে। একবার নয়। বহুবার। দেখেছি তার হিংসায়, দেখেছি তার উদারতায়, দেখেছি তার নীচতায়, দেখেছি তার মহত্বে। অন্যের নীচতা ও ঈর্ষায় নিজেরই অনেক শক্তিকে চিনিয়ে দিয়েছে যা আগে চিনিনি। এদের মহত্ত্ব ও উদারতা আমার এই উপলব্ধির দ্বার খুলে দিয়েছে যে, ক্ষুদ্রতাই মানুষের সম্বন্ধে শেষ কথা নয়।

মনে আছে, একবার এক সতীর্থা আমায় অভিযোগ করেছিলেন, আমি তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হয়েই শরৎবাবুর বইগুলো অধিকার করে বসে আছি এবং এর স্বত্বাধিকারীদের তাঁকে দেওয়ার সদিচ্ছায় বাধা ঘটাচ্ছি আমিই। বহুদিন ধরে এ-অভিযোগ শুনেও গুরুত্ব দিইনি। হেসে উড়িয়ে দেবার

চেষ্টা করেছি। একদিন এমনই অসহ্য অবস্থায় ব্যাপারটা পৌঁছুলো যে, সে-পর্যায়কে আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া গেল না।

প্রমাণ হয়ে গেল, তার ধারণা ভুল। আমি তাকে বঞ্চিত করিনি। এর মূলে অন্য কারণ ছিল। তখন তাকে আঘাত করবার জন্য নয়, ভুল ভেঙে দেবার অভিপ্রায়েই বুঝিয়ে বলেছিলাম, 'এটা তুমি কেন বোঝো না যে, মানুষ ঈর্ষা করে তাকেই যে সমান অথবা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতার অধিকারী হয়েও বেশী এমন অনেক সুবিধা-সুযোগ পাচ্ছে যা তার পাওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের কারোরই, সেরকম কোনো ক্ষোভ থাকার কারণ নেই।

প্রথমত তুমি যদি একটা প্রোডাকসন করে থাক, আমি করেছি দশটা। তোমার যদি অল বেঙ্গল ফেম থাকে, আমার আছে অল ইণ্ডিয়া ফেম। অভিনয়ে কে শ্রেষ্ঠ জানি না, তবে আমার গানেরও সামান্য খ্যাতি আছে যা তোমার নেই। তোমার একটা বাড়ি, আমার তিনটে। রূপের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। কারণ সেটা বিধাতার দান। কিন্তু এ-দানেও বিধাতা আমার প্রতি অকৃপণ। এখানে তোমাকে আমি ঈর্ষা করতে পারি কি কারণে?'

বান্ধবী নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন, কিছু ক্ষুব্ধও। পরে মনে হয়েছিলো এতটা উত্তেজিত হয়ে এমন তীব্রভাবে না বললেও হোতো। এ যেন খানিকটা ছেলেমানুষের ঝগড়ার মত হয়ে গেল। কিন্তু আজ মনে হয় ভুল করিনি। নিজের সম্বন্ধে অত্যুক্তির অহংকার করা যতখানি মূর্খতা, ঠিক ততখানিই অন্যায় অকারণ এবং অতিবিনয়ে আপনাকে অযোগ্যের কাছে ছোটো করা। একের মর্যাদা অন্য সহ্য করতে পারে না তারই অহেতুক উত্তেজনা ওর নীচতার মাঝে। এ নীচতার প্রতিবাদ না করাটা শুধু নিজের প্রতিই অবিচার করা নয়—সেই ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হওয়া যে ঈশ্বর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলবার মত সকল সম্পদই আমায় মুক্ত হাতে দিয়েছেন।

অহমিকার ফেরে পরিণতমান, বিদগ্ধ মানুষও যে কত ক্ষুদ্র হয়ে উঠতে পারে সে অভিজ্ঞতাও আমায় বিচলিত করেছে বহুবার। মনে পড়ে আমারই আত্মীয়া এক বিদগ্ধা মহিলার কথা যাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কল্পনাও কোনো দিন করিনি। অনিবার্য ঘটনার সংঘাতে তাঁর সঙ্গে

পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তিনি চেয়ে পাঠালেন সেই শাড়িটি যে শাড়িটি এক বিশেষ আনন্দের দিনে তিনি আমায় উপহার দিয়েছিলেন। শাড়িটি যে খুব মূল্যবান তা নয়। সে শাড়ি হারানোটাও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু সেই শাড়িটির সঙ্গে হারাতে হোলে যে বস্তুটি তা আমার পক্ষে সত্যিই বড় মর্মান্তিক। সে হোলো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। মানুষ যখন কারো প্রতি শ্রদ্ধা হারায় সে হারানো শ্রদ্ধার পাত্রকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে জানি না, কিন্তু যে হারায় তার ক্ষতির পরিমাপ জীবনের গড়পড়তা হিসেবের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা যায় না। কারণ এ শ্রদ্ধা হারানো মানেই হৃদয়ের নিভৃত কোণে সঞ্চিত রসের পাত্রে টান পড়া। রূপসমৃদ্ধ পৃথিবীর রঙ ফিকে হয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে তাই মনে হয় মিথ্যে অহমিকার অসংযমের কাছে মানুষ কত অসহায়। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, সংস্কৃতি, সবই বুঝি হার মেনে যায় সেই দানবীয় শক্তির কাছে।

এই প্রসঙ্গেই মনে আসে বহুবার সাধ্য মত অর্থ সাহায্যে করেছি এমন এক বন্ধুকে মাত্র একবারই ফিরিয়ে দিতে হয়েছিলো তখন আমি নিজেই অর্থ সমস্যায় বিব্রত ছিলাম বলে। এ অমার্জনীয় অপরাধে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আমার সম্বন্ধে যেসব অপবাদ তিনি রটনা করেছেন তা আমায় যতখানি বেদনা দিয়েছে বিস্মিত করেছে তার চেয়েও বেশী।

রাত বারটায় আমার বাড়িতে ঢুকতে চেয়ে যাদের গেট থেকেই ফিরে যেতে হয়েছে, নানান কাগজে সেইসব নীতিবাদীদের প্রচারিত কুৎসার হলাহলও আমি নির্বিকার চিত্তে পান করেছি। জীবন ভরে এমনই কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধ্যায় চলেছে। কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে উঠেছিলো একটি সীমাহীন নীচতার কাহিনী। এ কাহিনী যেমন নির্দয় তেমনই মর্মন্তুদ। বহুদিন আগের ঘটনা। আমি নিয়মিত পেট্রোল কিনতে যেতাম একটি দোকানে। বিক্রেতার আসনে দেখতাম এক তরুণকে। যেদিন লোক না থাকত নিজেই ছুটে এসে পেট্রোল ভরে দিয়ে যেত। চেহারাটা ভারী মিষ্টি। হাসি মুখ, নম্রস্বভাব, স্বল্পভাষী ছেলেটি প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। কথা বলার খুব বেশী দরকার হোতো না। কিন্তু সামান্য কথাবার্তার মধ্যেও তার মুখে 'মা' সম্ভাষণ আমার ভারী ভালো লাগত। অজান্তে তার ওপর একটা মায়াও পড়ে গিয়েছিলো।

এমনি ভাবেই চলছিলো। হঠাৎ একদিন গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। সেদিন মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এরপর বেশ কয়েকদিন উপরি-উপরি গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে খবর নিয়ে জানলাম, অরুণ খুব অসুস্থ। টাইফয়েড হয়েছে। বাড়ি কোথায়? খোঁজ নিয়ে জানলাম, এখানে তার বাড়িঘর বলতে যা বোঝায় তা নেই। সেবা বা দেখাশোনা করবার মত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউই কাছে নেই। মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই খবর করে সে যেখানে থাকে চলে গিয়ে দেখি প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। ওষুধ-পথ্য ত দূরের কথা, তেষ্টা পেলে একফোঁটা জল মুখে দেবারও কেউ নেই। আমি লোকজন দিয়ে তাকে গাড়িতে তুলে একেবারে বাড়ি নিয়ে এলাম। দু-চারদিন চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার পর জ্ঞান হতে তারই কাছে ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে খবর দিলাম।

বেশ কিছুদিন বাদে আত্মীয়স্বজনরা এলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে। কারণ? মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে অরুণকে বাড়ি নিয়ে এলাম—এ দায়িত্ব গ্রহণ আমার অধিকারের এলাকায় পড়ে না। এতবড় অন্যায় করার দুঃসাহস শাস্তির যোগ্য।

যাই হোক, একটু সুস্থ হতেই অরুণকে তাঁরা নিয়ে গেলেন। কিন্তু কদিন যেতে-না-যেতেই টাইফয়েড রিল্যাপস্ করে বাঁকা দিকে মোড় নিল। রোগী ডিলিরিয়ম-এর স্টেজে চলে যেয়ে সর্বক্ষণই কেবল 'মা' 'মা' করে আমাকেই দেখতে চাইত (অরুণের মা ছিলো না)। যে ডাক্তার দেখছিলেন, তিনিই খন বললেন, 'রোগী যাকে দেখতে চাইছে শীগ্গির তাকে খবর দিয়ে আনান, নইলে একে বাঁচানো মুস্কিল হবে।'

তখন তাঁরা এসে পূর্বকৃত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আমায় নিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, যাক, এঁদের মন যদি গ্লানিমুক্ত হয়ে থাকে, তবে সেইটাই পরম লাভ। অরুণকে আমি সারিয়ে তুলবই। তারপর দিনের বিশ্রাম, রাতের ঘুম ত্যাগ করে আমি ওর রোগশয্যার পাশে জেগে থেকেছি।

একদিন রাতের ঘটনা বলছি। অরুণ ঘুমোচ্ছে। আমি খাটের ওপর ওর কাছেই আধশোওয়া হয়ে আছি। হঠাৎ মনে হোলো খাটের তলায় কারা যেন নড়ে ওঠায় খাটটা দুলে উঠল। মানুষের নীচতা সম্বন্ধে তখনও পুরোপুরি অভিজ্ঞতা না থাকায় ভাবলাম আমারই ভুল। খাটের তলায়

আবার কে থাকবে? কিন্তু Truth is stranger than fiction. পরে জেনেছিলাম, অরুণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে ওরা কর্দর্য সন্দেহমুক্ত নয়। এবং রাতের পর রাত দুরন্ত কৌতূহলে ওরাই খাটের তলায় লুকিয়ে থেকেছে। কেন—সে-কথা বলতেও প্রবৃত্তি হয় না।

যাই হোক, অরুণ সুস্থ হয়ে উঠলো। বলতে ভুলেছি, এই অরুণ হোলো বোম্বাইএর নায়ক অশোককুমারের মাসতুতো ভাই। এমন উঁচু মন, নির্মল চরিত্র ও মধুর স্বভাবের ছেলে আমি খুব বেশী দেখিনি। শুধু মুখেই সে আমায় 'মা' বলেনি। অন্তরের সবটুকু স্নেহ ও শ্রদ্ধা দিয়েই 'মা'-র আসনেই বসিয়েছে। ওর স্ত্রীকে (মেরী মুখার্জি নামেই বোম্বাই ও কোলকাতা শিল্পীমহলে জনপ্রিয়) আমি 'বৌমা' বলি। তার কাছেও আমি ঠিক সেই শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছি যা আশা করতে পারি আমার আপন পুত্রবধূর কাছে। রাণার পৈতে, বিয়ে আরো কত দুর্দিনে ও যেভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার সংসার সামলেছে, সে সহৃদয়তা নিকট আত্মীয়ের কাছেও মেলে না। অরুণ খুব অল্প বয়সেই আমাদের ছেড়ে চলে গেল। বোম্বেতে ও বহু ছবির সঙ্গীত-পরিচালকরূপে নাম করেছিলো। একদিন ওর দুটি মেয়েকে নিয়ে দাদা অশোককুমারের সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলো। ফেরবার পথে গাড়িতেই দাদার কোলে মাথা রেখে চিরদিনের জন্যই চোখ বুঁজল। হঠাৎ হার্টফেলের ব্যাপার।

এমনিতে স্বল্পভাষী হলেও অরুণ ছোটোখাটো রসিকতার আবহাওয়া তৈরি করতে পারত চমৎকার। কর্মজীবনে ওকে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। বৌমা ওর শুধু সহধর্মিণীই ছিলো না, ছিলো সহমর্মিণী। হাসিতে, খুশিতে, অক্লান্ত সংসারের কাজে, সেবায় সকল দুঃখদৈন্যকে এক ঝট্‌কায় উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা যেন ওর হাতের মুঠোয়। ওদের সংসারে তাই শান্তির অভাব কোনোদিন ঘটেনি। জীবনে কোনো কাজের জন্যই আমি কারোর ওপরই নির্ভর করিনি। একমাত্র 'বৌমা' যখন আসে ওর ওপর সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। তাই ওকে বলি আমার 'ডান হাত'।

তারপর যা বলছিলাম। দুঃখকে নিয়ে হা-হুতাশ করা ওদের দুজনেরই ধাতবিরুদ্ধ। রঙ্গ-রহস্যে দুঃখকে ওরা এমন মধুর করে তুলত যেটা উঁচুদরের আর্টের পর্যায়ে পড়ে।

বৌমার কাছে শুনেছি একবার বহুকাল একটানা সংগ্রামের অধ্যায়ে অরুণ ওকে হাসতে হাসতে বলেছে, 'ভালই ত চল্‌ছে। এইবেলা প্রাণভরে দুঃখ-টুক্‌খো যা করবার করে নাও, নইলে প'রে আবার আমায় দোষ দেবে জীবনে দুঃখ কাকে বলে তোমায় জানতেই দিলাম না বলে।' বৌমাই বলে, 'মা, তোমাকে মা বলার জন্য বোম্বের আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে বন্ধুমহল ওকে কিভাবে যে ক্ষ্যাপাত কি বলব। অনেকেই মুখ টিপে হেসে অনুযোগ করত, এত মেয়ে থাকতে বেছে বেছে তোমার সঙ্গেই এ-সম্পর্ক গড়ার এত আগ্রহ কেন? ওর মুখখানা যে তখন কি হয়ে যেত তোমায় কি বলব মা। গুম্‌ হয়ে বসে থাকত। তারপর একটি কথারও জবাব না দিয়ে উঠে চলে যেত। এত শ্রদ্ধা ছিলো তোমার ওপর।' এই প্রসাঙ্গ বলি—অরুণ কোনো সাংসারিক অথবা ব্যবহারিক কারণে আমার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো না। নামের মোহেও না। ওর সঙ্গে যখন পরিচয় তখন আমি 'মাননীয় গার্লস স্কুলের'ও নায়িকাও নই। আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক একেবারে নিখাদ এবং নির্ভেজাল স্নেহের। তাই ওর আত্মীয়-স্বজনের কটূক্তির মুহূর্তেও মনে পড়ে যেত দিলীপদার মুখে শোনা তারই অনুবাদ কোনো এক বিদেশী সিনিকের উক্তি:

'আত্মীয় কারে কয় জানো হায়,
রটায় যে উল্লাসে,
সেই অপবাদ শুনে যাহা,
চিরশত্রুও লাজ বাসে।'

তাই ত মাঝে মাঝে সকল নীচতার বিরুদ্ধে গর্জে-ওঠা মন প্রশ্ন করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের শুচি-শুভ্র সম্পর্কে মানুষই কেন এমন করে কালি ঢেলে দেয়? আমাদের মনের কিরণবিলাসী কুঁড়িগুলিকে যদি অনাদরের আওতায় শুকিয়ে যেতে হয়, তাতে করে জীবনে সুষমার অপচয়ই ঘটে না কি?

অনেক ভেবে দেখেছি এর জন্য দায়ী কতকগুলি বহুল প্রচলিত অর্থহীন শব্দ যার দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রয়োগ মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির পক্ষে অ্যাটম বোমের মতই বিপজ্জনক। এমনিই একটি কথা হোলো ফ্রয়েড ও তাঁর মনস্তত্ত্ব। ফ্রয়েড মাথায় থাকুন তাঁর যথার্থ বক্তব্য সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু তাঁর থিওরী অনেকের চিন্তায় বিকৃতিই শুধু আনেনি, পচন ধরিয়েছে মনের শ্যামল লতার মূলগুলিতে।

হাসি পায় যখন দেখি একটা বিপুল লীলার অতিকায় বৃত্তের একটি মাত্র বিন্দুতে আমাদের ছোট্ট সম্বিৎটুকুকে সংহত করে তার সমগ্র পরিধির কাছে চেয়েছি দিশা। চেয়েছি বামন মানসবুদ্ধির এই সঙ্কুচিত চেতনার অনুবীক্ষণ দিয়ে অগণ্য নীহারিকার আলো মাপতে। কিন্তু কে বলে এই আত্মম্ভরিতা আমাদের পরমতম দিশা দেবেই দেবে? জগতের সকল প্রগলভতার দাপট যখন ম্লান হয়ে আসছে, তখনই উপলব্ধি করি মুষ্টিমের কয়েকজন মানুষের ক্ষুদ্রতার মাঝেই কেন জগৎকে দেখব যখন মহৎ মানুষের জ্যোতির্বিন্দুতে উদ্ভাসিত হবার মত মুহূর্তও জীবনে দুর্লভ নয়? হোক না তা ক্ষণক পলাতক। এই ক্ষণিক দ্যুতিই কি যুগের আঁধারকে মিথ্যে করে দেয় না?

এমনই এক মুহূর্তকে পেয়েছি যখন আমার কবীর রোডের বাড়িতে যামিনী রায় এসেছিলেন। খাটো করে পরা ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর চাদর জড়ানো মানুষটিকে দেখে মনে হয়েছিল যেন সেই ত্রেতাযুগের কোনো তপস্বী তাঁর সাধনার অবকাশে আমায় আশীর্বাদ করতে এসেছেন। কি সম্ভ্রমের আবেগ সেদিন মনে জেগেছিলো বলতে পারি না। মনে আছে টুলের ওপর ওঁকে বসিয়ে যখন পা ধুইয়ে দিচ্ছিলাম—উনি ঠিক সেই হাসি-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে চুপটি করে বসেছিলেন—সে দৃষ্টি দিয়ে পিতা উপভোগ করেন শিশুসন্তানের আদরের আবেগ। মনে হয়েছিলো এমন মানুষকে যদি শ্রদ্ধা জানাতে না পারলাম তবে 'শ্রদ্ধা' কথাটার সৃষ্টি হয়েছিলো কেন?

ওঁর আগে অনেক শিল্পীর স্টুডিওতে গেছি, ছবি কিনেছি। কিছুটা শিল্পের প্রতি অনুরাগবশত, কিছুটা শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে। কিন্তু যামিনীবাবুর স্টুডিওতে গিয়ে শুধু ছবিকেই দেখিনি—এখানে স্পর্শ পেয়েছি তাঁদের অনুপম স্রষ্টার অনাড়ম্বর স্নেহপ্রবণ অন্তরটির। বণ্ডেল রোডের বাড়িতে আসার পরও অনেকবারই তিনি আমায় যেতে বলেছিলেন। নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সে ক্ষোভ মোছবার নয়।

এক পলকের জন্য দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে, স্মৃতির দিগবলয়ে তারার মত ফুটে আছে সে মুহূর্তের ভাবগাঢ়তা। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে উনি এসেছিলেন রেকর্ড করতে। ওঁকে দেখার জন্যই সেখানে নামী অনামী কত লোকের ভিড়। আমি ছিলাম তাদেরই একজন।

ভুলদার (প্রশান্ত মহলানবীশ) ভাই আমায় সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রণাম করতেই চিবুক ধরে মুখ তুলে আদর করে বললেন, 'কি মিষ্টি মুখখানি গো তোমার? তুমি গান গাইতে পার?'—ওখানেই কে একজন বলে উঠলেন, 'গুরুদেব, আপনার একটি-দুটি গান গেয়েই ও চারিদিক মাতিয়ে তুলেছে।' উনি হেসে বললেন, 'তাই নাকি? আমাকে একদিন তোমার গান শোনাও।' তারপর ভুলদার ভাইকে (চন্দ) বললেন, 'একে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেও—খুব ভাল করে ভাব করে নেব তখন।' সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের একটি সস্নেহ চাউনি ও স্পর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো যেন আলোর সমুদ্রে স্নান করছি।

মহাত্মাজীর সঙ্গে দর্শনে মনের মধ্যে বেজেছিলো একটি প্রার্থনার আকুতি—'সব্‌কো সংমতি দে ভগবান।' বীণাই একদিন আমায় জেদ করে বলল, 'মহাত্মাজীকে দেখবে না? সমসাময়িক একজন মহাপুরুষ বেঁচে থাকতেও তাঁকে যদি দর্শন না কর, পরে নিজের সন্তানসন্ততির কাছে কি জবাবদিহি করবে?'

'মহাত্মাজীর দেখা পাওয়া কি আমার মত সামান্য মানুষের পক্ষে সম্ভব?' সসঙ্কোচে বলেছিলাম।

'কেন নয়? উনি ত সোদপুরে এসেছেন। চল দেখে আসি।'

তারপর ও মাখন সেন, সতীশ দাশগুপ্ত এঁদের সহযোগিতায় সোদপুরে আমায় নিয়ে গেল। প্রার্থনাসভায় বসতে পেরেছিলাম মহাত্মাজীর খুব কাছেই। দেখলাম হাতজোড় করা প্রার্থনারত মানুষটি যেন অগণিত মানুষের ভিড়ের মধ্যেও একান্তে বসে অনন্তের সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু আমার এ অনুভবনিবিড়তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যখন দেখলাম কানে এল চারিদিকের ফিসফাস ও গুঞ্জনের মধ্যে আমার নামটা। শুধু অসোয়াস্তিবোধই করিনি, ভারী অপরাধী মনে হচ্ছিলো প্রার্থনাসভার ধ্যানতন্ময়তা ভাঙার জন্য পরোক্ষভাবে নিজেকে দায়ী ভেবে।

ক্ষিতিশবাবুই মহাত্মাজীকে বললেন, 'এর ভারী আগ্রহ আপনাকে দেখার।' অমনই মহাত্মাজীর মুখে ফুটে উঠল সেই অপার্থিব হাসি, যে-হাসির সামনে এসে তাঁর ঘোরতর বিরোধীপন্থীরও সমালোচনার কণ্ঠ আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে যেত—সীমাহীন শ্রদ্ধার আবেগে। প্রণাম করতে দুটি হাত আমার মাথার ওপর চেপে ধরলেন। বিধাতার অভয় মন্ত্রদানের

স্পর্শের আনন্দ যেন প্রবাহিত হোলো সারা দেহে। ফেরবার সময় কানে বাজছিলো সেই সুর 'সব্‌কো সংমতি দে ভগবান'—আমিও সারাক্ষণ যেন সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে মন্ত্রের মত ঐ একটি সুরই গেয়েছি 'সবকো সংমতি দে ভগবান'।

আমার সৌভাগ্যক্রমে ঐখানেই সেদিন ছিলেন সীমান্ত গান্ধী। মহাত্মাজীকে দর্শন করে তাঁর কাছেও গেলাম। কি সীমাহীন স্নেহে তিনি কাছে টানলেন। কথা বেশী হয়নি। মনে হয়েছিল আমি এত ক্ষুদ্র মানুষ, এঁদের সঙ্গে কি কথা বলব? এঁদের কাছে আসতে পেরেই ত জীবন সার্থক। অনেকক্ষণ ছিলাম। কি শিশুর মত সরলতা ওঁর স্বভাবে, ব্যবহারে। সহজ হওয়াটাই কঠিন। কিন্তু মানুষ সহজ হলে তার যে রূপ উদ্ভাসিত হয়, তা শুধু নিজেকেই নয়—তার চারপাশের পরিবেশকেও যেন আলো করে তোলে। আমি ওঁর অনেক ছবি তুললাম। যেখানে, যেভাবে বসতে বলছি বিনা প্রতিবাদে সে-আবদার পূর্ণ করেছেন। সে হৃদয়ভরা স্নেহকেও আস্বাদ করছি প্রাণভরে।

তাই ত ভাবি যাঁদের একটি স্পর্শে, একটি চাউনীতে মানুষের অন্তরকে সুদূরের ধ্যানে বিভোর করতে পারে তাঁদের শক্তির অবধি কোথায়?

ঠিক যুগপুরুষের পর্যায়ে পড়েন না এমন মানুষের স্নেহ ও সৌজন্যের দানও বিচিত্র রাগরাগিণীর মতই হৃদয় ভরে দিয়েছে বারবার।

মানুষের পদবী ও পদমর্যাদার অন্তরালের মানুষের মনের পরশ বারবার অন্তরকে যে পুণ্যস্পর্শে অভিষিক্ত করেছে, সে মহনীয় স্মৃতিকে বিলুপ্ত করবার শক্তি কার? একবার শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে গান শোনানোর সৌভাগ্য হয়েছিলো। গানের পর আমায় জড়িয়ে ধরে ওঁর সেই উচ্ছ্বাস কি ভোলবার? রাজ্যপালদের মধ্যে ডঃ কাটজু, ৺হরেন মুখোপাধ্যায়, পদ্মজা নাইডু, ধরমভীরা—এঁরা কেমন করে এবং কখন যে উচ্চাসনের মর্যাদামণ্ডিত স্তর থেকে নেমে আমার পাশে কাছের মানুষটির মত এসে দাঁড়িয়েছেন অকৃত্রিম স্নেহ ও ঔদার্যে, জানতেই পারিনি।

একটি সন্ধ্যার স্মৃতি মনে বড় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তুষারবাবুর আমন্ত্রণে একবার মহাজাতি সদনে শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুটের পুরস্কার বিতরণী সভায় ধরমভীরা ছিলেন সভাপতি। আমি পুরস্কার বিতরিকা। আমার যেতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো। আমি হলে ঢুকতেই ওঁর

বোনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকা অথবা কি কারণে জানি না 'আইয়ে কানন দেবীজী' বলে ধরমভীরা উঠে দাঁড়ালেন। ওঁকে দেখে তুষারবাবু, সুকমলবাবু এবং মাননীয় আর যাঁরা ছিলেন সবাই উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত লজ্জা পেয়েছিলাম সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়েছিলো, আমরা মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করে শুধু কি তাকেই সম্মানিত করি? না এ সম্মান-জ্ঞাপন করে আমরা সম্মানিত করি নিজের বৈদগ্ধ, শিক্ষা ও মার্জিত রুচিকে?

আমার পরমাত্মীয়া এবং শ্রদ্ধার পাত্রী ৺কুসুমকুমারী মৈত্রর (শ্রীযুক্ত হেরম্ব মৈত্রর স্ত্রী) কাছে পাওয়া স্নেহ, আদর ও সম্মান আজও আমার কাছে এক বিস্ময়। সারা জগৎ যখন আমার প্রতি বিমুখ, আমি বিনা যোগ্যতায় ও বিনা অধিকারে সমাজের এক মূল্যবান সম্পদ আত্মসাৎ করে বসে আছি এমনই একটা ভাব আমার ওপর খড়্গহস্ত ঠিক সেই সময় মাতৃস্নেহের কোমল মাধুর্যে আমায় বুকে টেনে নিলেন আর এক নূতন মা। এই প্রসঙ্গে তার শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে রাণীদির (তার মেয়ে রাণী মহলানবীশ) একটি লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। কারণ তাতেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

"মায়ের বৌ-এর প্রতি ভালবাসাটাও একেবারে আশ্চর্য রকমের ছিলো। তাঁকে 'কন্‌ভেনশনাল' মনে করে বুড়া তাকে বিয়ে ঠিক করার কথা জানাতে কত দ্বিধা করেছিলো। কিন্তু মা এক মুহূর্তে ওদের বুঝিয়ে দিলেন তাঁর ব্যবহার দিয়ে যে তাঁর মনে ওদের প্রতি গভীর ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁর অন্তরের স্নেহসিন্ধু প্রথম মুহূর্তেই এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো বলেই বৌ তার বৌ না হয়ে প্রথম দিনই কোলের মেয়ের মত 'মা' বলে ডাকতে পারলো, আর সেই 'মা' ডাক যে তার কতো সত্য তা যাঁরা তাকে মা'র অসুখের সময় সেবা করতে দেখেছেন তাঁরাই জানেন। শাশুড়ী বৌ-এর এমন মধুর সম্পর্ক খুব কমই চোখে পড়েছে আমার। বৌ একদিন আমাকে চিঠি লিখেছিলো—'মাকে কোনোদিন আমার শাশুড়ী বলে মনে হয়নি, উনিও আমার প্রতি শাশুড়ীর মত ব্যবহার না করে একেবারে মায়ের মতই বুকে টেনে নিয়েছেন। মা আমার বন্ধু, আমার মেয়ে, আমার মা।' কথাটা খুবই সত্য। যা কারো কাছে বলতে না পারে সে কথা মা'র কাছে এসে অনায়াসে বৌ বলে যায়। মাও বন্ধুর মতো করেই সব শোনেন এবং

-পরামর্শ দেন। কী অসীম শ্রদ্ধা বৌয়ের, কি অপার ভালবাসা মায়ের। পরস্পরকে কাছাকাছি দেখে মন আনন্দে তৃপ্ত হয়েছে। মার এই স্নেহের মধ্যে নিজের জন্য কিছুই চাওয়া ছিলো না, কোনোদিন দাবী করেননি যে বৌমা আমার কাছে এসে দুদিন থাকুন। বরং পাছে ছুটির সময় নিজেদের পছন্দমত কোনো জায়গায় না গিয়ে মা একা আছেন বলে গিরিডিতে আসতে চায়, সেইজন্য আগেই চিঠি লিখে দিতেন যে, কোনো বেশী স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে নিজের শরীরটাকে যদি ভালো করো তাহলেই আমি বেশী খুশী হ'ব।...দাবী ছিলো না বলেই বৌর হৃদয়ের ভালোবাসার উৎস এমন সহজে মার দিকে উৎসারিত হয়ে এসেছিলো। দাবীর বোঝা পাথরের মত ভার হয়ে এই উৎস-মুখকে বন্ধ করে দেয়নি। মা একহিসেবে খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন—কারো কাছে কিছু চাইতেন না বলেই সহজেই সকলের কাছ থেকে খাঁটি সোনাটি পেয়ে যেতেন। এইবার অসুখের মধ্যে একদিন, তখন মা মাঝে মাঝে ভুল বকছেন, আবার মাঝে মাঝে মাথাটা একটু পরিষ্কার হচ্ছে যখন, সেইসময় মজা করে মার মুখ দিয়ে অনেকবার বলাতে চেষ্টা করলাম যে ওঁর বৌর চেয়ে আমি ভালো, কিন্তু ভুলে একবারও আমার বলা কথাটি মুখ দিয়ে বার করাতে পারলাম না। কেবলি 'না' বলে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। বৌ ত আনন্দে অস্থির যে আধ অজ্ঞান অবস্থাতেও মার মুখ দিয়ে ওর নিন্দা কেউ বের করতে পারলো না।...আমরা সেদিন সকলেই এটা নিয়ে খুব মজা করেছি। ওঁর এত আদরের পুত্রবধূর প্রতি অনেকের অনাদরটা খুব মনে বেজেছিলো তাই নিজে সেটাকে পূরণ করবার চেষ্টা প্রাণপণে করেছেন, যদিও আমাদের পরিবারের সকলেই এ বিষয়ে মার মতই উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।"

মার অসুখের সময় আমি কিছুদিনের জন্য স্টুডিও থেকে ছুটি নিয়ে গিরিডিতে তাঁর কাছে ছিলাম। ছুটির শেষে স্যুটিংএর ডেট থাকায় আবার কোলকাতায় ফিরে আসতে হোলো। আসবার সময় আমার মনটা খুব বিচলিত ছিলো। মুখে কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারছিলাম মা-ও ভেতরে ভেতরে খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন। এই দিনটার প্রসঙ্গেই রাণীদি লিখছেন:

"বৌ-এর সম্বন্ধে মায়ের মনের বেদনা কতো গভীর তা এবার অসুখের মধ্যে একদিন পরিষ্কার বুঝতে পারলুম। বৌ সেদিন চলে গিয়েছে,

আমি পাশে শুয়ে আছি। রাত তিনটের সময় যেন হঠাৎ মা বললেন—'আজ আমার মা চলে গিয়েছেন। লোকে ত জানে না ও আমার কি হীরের টুকরো মেয়ে। আমি যে প্রথম মুহূর্তেই ওর সত্য রূপটি দেখতে পেয়েছিলাম, তাই তো অমন করে সেদিন বুকে টেনে নিতে পারলাম। আমাকে ত কেউ বলে দেয়নি, আমি যে ওর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ও আমার কেমন মেয়ে।'

আজও সেই আদরের কথা মনে পড়লেই চোখে জল আসে এই ভেবে এমন করে আদর করবার মানুষ সারাজীবনে ত দেখিনি? আমি স্টুডিও থেকে ফিরলে নিজের হাতে আমায় খাইয়ে দিতেন, চুল বেঁধে দিতেন। কতোদিন এমন হয়েছে সারাদিন স্যুটিং করে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুঁজে বসে আছি। হঠাৎ অনুভব করতাম ক্লান্ত দেহে কার স্নেহস্পর্শ। চেয়ে দেখতাম উনি কখন পাশে এসে আস্তে আস্তে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তখন মনে হোতো ঐ স্পর্শ বিধাতার আশিসধারার মত আমার সকল দেহে মনে ছড়িয়ে যাচ্ছে—আর সব ক্লান্তি মুছিয়ে দিয়ে আমার মধ্যে যেন নূতন প্রাণশক্তি সৃষ্টি করছে। সে স্পর্শ আজও ভুলিনি ত। মাঝে মাঝে ভাবি তিনি আমায় বেশী ভালবাসতেন, না আমার নিজের মা?

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় আরো কয়েকজনের কথা—যাঁদের মহত্বে, সৌজন্যে, আন্তরিকতায় হৃদয় ভরে উঠেছে বারবার। আমার জীবনে এঁরা এসেছেন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত। ভুলিয়ে দিয়েছেন অনেক ক্ষয়-ক্ষতির বেদনা।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাস, পণ্ডিতদা, ভাইয়া ও কোকিলার কথা না বললে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অন্নপূর্ণা হলেন সারদা দাসের (কে. সি. দাসের পরিবারের) স্ত্রী।

১৯৩৯ সাল থেকে ওঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আর এ বন্ধুত্ব দুই পরিবারকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধেছে ওঁরই অনাবিল ভালবাসার দাক্ষিণ্যে। নানান দিনের কত খুঁটিনাটি ভাববিনিময়ে, সুখে-দুঃখে এ সম্পর্ক আরো মধুর, আরো গভীর হয়েছে।

আজ সারাজীবনে নানান জনের যাওয়া আসার পরিপ্রেক্ষিতে ভাবছে

আশ্চর্য লাগে যে এই জীবনে কত ভাঙা-গড়া ত চলল, কিন্তু অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোথাও এতটুকু ফাটল ধরল না ত।

কতজনের সঙ্গে কিছুদিনের পরিচয়েই নিবিড় আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেই না মনে উচ্ছ্বাসের জোয়ার লাগল এই ভেবে যে এর চেয়ে বড় বন্ধু বুঝি নেই—আর জীবনের শেষদিন অবধি এমন সীমাহীন ভালোবাসার কোথাও এতটুকুও ক্ষয় ঘটবে না, অমনি দেখি হঠাৎই একদিন কোন অপলকা ছোঁওয়া লাগতে না-লাগতেই সে বন্ধুত্ব ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে যেন খানায় পড়ে গেলো। কোথায় কোন অতলে ক্ষীণস্রোতে ও পক্ষের স্বার্থের ধারা বয়ে চলেছিলো বুঝতেই পারিনি। বুঝলাম,—শুধু বুঝলাম নয়—শুব্ধ বেদনায় এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়ালাম যে স্বার্থে এতটুকু ঘা লাগাটা এ বন্ধুত্ব সহ্য করতে নারাজ।

কিন্তু অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো স্বার্থের খাদ মেশানো নেই বলেই এর অকলংক শুভ্রতায় এতটুকুও মালিন্যের দাগ লাগেনি। ওর সঙ্গে আমার দেখাশোনা বা যাওয়া-আসার খুব যে একটা ঘনঘটা আছে তা নয়, কিন্তু আমাদের একজনের প্রতিদিনের সুখদুঃখের আনন্দ ও সংঘাত অন্যের হৃদয়ে অনুরণন না তুলে পারে না। অনেকদিন হয়ত দুজনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু হঠাৎ ফোন বেজে উঠল সেইদিনই যেদিন আমি খুব অসুস্থ—'বৌদি কেমন আছেন? আমার মনটা কেন জানি না আপনার জন্য আজ বড্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছে।'

এমনই নানা কাজে, নানা ঘটনায় ওঁর স্নেহসজল হৃদয়ের স্পর্শ আমায় অভিভূত করেছে। ওর কথা মনে এলেই 'দেবীত্ব' কথাটা ব্যবহার করবার সাধ জাগে। মা বলতেন, 'অন্নপূর্ণা নামেও অন্নপূর্ণা, কাজেও। এত স্নেহ কি মানুষে সম্ভব?' আমারও তাই মনে হয়।

স্বার্থলেশহীন ভালবাসার আর এক নিদর্শন পণ্ডিতদা। বহুদিন আগে এ্যালেনবেরী কোম্পানীতে একটা গাড়ির অর্ডার দিতে গিয়েই পণ্ডিতদার সঙ্গে আলাপ। সেই পরিচয়ই নানান্ সূত্রে কখন যে আত্মীয়তার পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছে বুঝতেই পারিনি। পুজোর সময় প্রতিবছর আমার ও বাড়ির সকলের পণ্ডিতদার কাছে শাড়ি, জামা, প্যাণ্ট, ধুতি পাওয়া ত বাঁধা। এ ছাড়াও সময়ে অসময়ে ওঁর বাড়ি হানা দিয়ে সপরিবারে বসে হৈ-চৈ করে;

খেতে আমরা এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যেন এ আমাদের বিধিনির্দিষ্ট পাওনা। এর ব্যতিক্রম ভাবাই যায় না।

ভাইয়া আজ নেই। ভাইয়ার পুরো নাম প্রমথনাথ ঘোষ। আমি, আমার স্বামী, দিদি, দাদাবাবু আমরা সবাই আদর করে ডাকতাম 'ভাইয়া'। দিলখোলা, স্নেহকোমল মানুষটি সত্যিই আমাদের 'দাদা' হয়ে উঠেছিলেন আমাদের ওপর তাঁর অকৃত্রিম হৃদ্যতার প্রসাদগুণে।

'ভাইয়া'কে যখন হারালাম সত্যিই মনে হয়েছিলো যথার্থ স্নেহ ও আব্দার করবার মতন একটি মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। আজও প্রতিবছর ভাইফোঁটার সময় পণ্ডিতদাকে ফোঁটা দিতে যাবার সময় ভাইয়ার মুখখানাও বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমার নিজের জন্মদিনের কথা আমি ভুলে গেলেও 'ভাইয়া' কোনোদিন ভুলতেন না।

একবার কোনো এক উৎসবে আলাপ হোলো এক অবাঙালী মেয়ে কোকিলা কাপাদিয়ার সঙ্গে। সে থাকে বোম্বেতে। তখন ঘটনাচক্রে কোলকাতায় ছিল বলেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল। আমার গানের ভক্ত ছিল সে আগেই। দেখা হতেই আমায় এমনভাবে ভালবেসে ফেলল যেন সে আমার জন্মান্তরের সহোদরা। আমাকে চিঠি লেখবার জন্য এবং আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলবার জন্যই সে কত চেষ্টা করে বাংলা শিখেছে। স্বামী-সন্তানসহ সুখসমৃদ্ধা হয়েও আমার প্রতি তার এই আকর্ষণ কি আশ্চর্য নয়? প্রায়ই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ও বোম্বে থেকে ট্রাঙ্ককল করে আমার খবর নেয়। সপ্তাহে একখানা করে চিঠি ত দেয়ই। মাঝে মাঝে তার চেয়েও বেশী। তার আবেগের উত্তাপে-তপ্ত ভাষা পড়তে ভারী মিষ্টি লাগে। বোম্বে থেকে তার চেনা পরিচিত কেউ এলেই তার হাতে আসবেই আসবে কোকিলার দেওয়া কোনো না কোনো উপহার। সুদৃশ্য দেওয়াল ঘড়ি, পান-মশলা রাখবার মস্তবড় রূপোর ঝারি, শিল্পখচিত পেপারওয়েট, ফুলদানী, ল্যাম্প এমনি আরো কত টুকিটাকি জিনিস যা আমার সর্বদা ব্যবহারে লাগতে পারে। ও চায় প্রতি মুহূর্তে ওর দেওয়া জিনিস স্পর্শ করে যেন আমি ওকে মনে করি। এত উপহার নিতে প্রথম প্রথম নিজেরও বাধোবাধো লাগত না কি আর? এ নিয়ে ওকে কত বকেছি, বুঝিয়েছি, মানুষের অন্তরের অনুভূতি অন্তর স্পর্শ করেই। আর আমি ওর মত স্নেহ-কোমলা না হলেও এত কঠিন ধাতু দিয়ে গড়া নই যে, অমন হৃদয়-ভরা

স্নেহকে উপলব্ধি করতে পারব না। কিন্তু বড় ব্যথা পায়। বলে—'তোমাকে যা দিই এর একটি জিনিসও আমার স্বামীর অর্থে কেনা নয়, এ আমার স্বোপার্জিত টাকায় কেনা। আমি দিই কে বলল? তুমি আমায় গ্রহণ করে আনন্দ দাও। এটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না।'—এ কথার পর আর কি বলা যায়?

তাই ভাবছিলাম এত মানুষের এমন নিষ্কলুষ স্নেহ, অন্তহীন মমতা ও নিটোল শ্রদ্ধার স্পর্শের কাছে কোনো ক্ষুদ্রতার আঘাত কেন বাজবে? বাজতে দেওয়া উচিত নয়। আলো যে চিরদিনই ছায়াজয়ী। প্রথমের দিকে বলেছি আশ্রয়প্রার্থী হয়ে গিয়েছিলাম এমন আত্মীয়ের বাড়িতে পরিচারিকার মত শ্রম করেও যেখানে ঠাঁই পাইনি, পাইনি এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়।

উত্তরজীবনে আমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবস্থাবিপর্যয়ে পড়ে তারাই যখন আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন আমি ত তাদের ফিরিয়ে দিতে পারিনি? এই সংযম ও ধৈর্য দিয়েছেন যে বিধাতা তাকে বারবার প্রণাম জানাই।

এই প্রসঙ্গেই জানাই আমার সারা শিল্পীজীবনে প্রণয়িনী সম্বোধিত বহু চিঠি যে পাইনি তা নয়, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী পেয়েছি মাতৃসম্বোধনের চিঠি। তাই বরাবরই কবিগুরুর সেই কবিতার চরণগুলি মনে পড়ে যায় যা বহু দুঃখের লগ্নে হৃদয়কে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ আশ্বাসে যেন আদর করেছে—

"কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে জিত হোলো তার
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন না রেখে
তারাগুলি রহে নির্বিকার।"

আমরা সচরাচর জীবনে চলি একটা বাঁধা পথে। সে পথের একদিকে থাকে বটে অসুবিধা—তার একঘেঁয়েমো। কিন্তু অন্যদিকে ক্ষতিপূরণের অঙ্কটা বেশ মোটা,—তার আরাম নির্বিবাদী। কথায় বলে না, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল? বাঁধা সড়কের মস্ত দান এই স্বস্তি। তার দুঃখ বিপদ নেই এমন কথা বলছি না। কিন্তু তার সঙ্কটের মধ্যেও অভাবনীয়তা

থাকে না,—অন্তত সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রে। জীবনে বাজে বেশী অভাবনীয়তা—তাই আবহমানকাল সংসারে চেনা পথেই যাত্রীর এত ভিড়। হোক না লক্ষ্য মামুলী, নাই বা থাকল তার বড় কোন তৃপ্তি। সে যে চেনা। এর মধ্যেই কি অফুরন্ত ভরসা নেই ?

কিন্তু তবু বিচিত্র এই জীবনের গতিধারা, সে মানতে ব্যগ্র বটে, কিন্তু ভাঙতেও কম তৎপর নয়। চেনা বীথিকা তার মন টানে, কিন্তু অচিন মানসসরোবরও তাকে ডাকেই দূর থেকে। তাই হঠাৎ কোন বড় কিছু করবার পাগলা খেয়ালের দমকা হাওয়ায় সে উধাও হয় অচেনা পথে।

খেয়ালের এই দমকা হাওয়ার প্রেরণাতেই সৃষ্টি হোল আরো ছুটি প্রতিষ্ঠান 'মহেন্দ্র-জ্ঞানদা স্মৃতিসমিতি' ও 'উইমেনস কালচারাল এসোসিয়েশন'। কথাটা আর একটু প্রাঞ্জল করেই বলি।

মহিলা শিল্পীমহলের অকল্পনীয় সাফল্যের পর অনেক প্রতিষ্ঠান থেকেই আমার সাগ্রহ আহ্বান আসতে লাগল পরিচালিকারূপে যুক্ত থেকে তাঁদের কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের সহায়ক হবার জন্ম। সকলেরই কেমন একটা ধারণা হয়ে গেল কাজের তরীতে আমাকে কর্ণধাররূপে পেলে তাঁরা সকল আবর্তকে অতিক্রম করে কূলে পৌছবেনই। কিন্তু তাঁদের ঐ ধারণাই আমায় ভয় পাইয়ে দিল। আমার সকল দোষগুণ ও সীমাবদ্ধতা নিয়েই আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। কোনরকম দেবীত্ব অথবা অতিমানবত্বের ইমেজ থেকে নিজেকে আমি সবসময় মুক্ত রাখবারই চেষ্টা করি। কারণ ওতে নিজের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশী।

যাই হোক, সময়াভাবে অনেককেই ক্ষুণ্ণ করতে হয়েছে। কিন্তু এ শৈথিল্য অনিচ্ছাকৃত। তবু এড়াতে পারিনি ছুটি প্রতিষ্ঠানকে। বীণাদেবী সেনের মা-বাবার নামে করা 'মহেন্দ্র-জ্ঞানদা স্মৃতিসমিতি' এবং সুতারা ঘোষদের 'উইমেনস কালচারাল এসোসিয়েশন'। কোন গ্ল্যামারাস ব্যাপার এখানে নেই। প্রথমটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের অবসর সময়ে কাজকর্ম করার আসর। এখানে গৃহীত চাঁদার অর্থ, শাড়ি ও পরিচ্ছদ অভাবগ্রস্ত পরিবারে বিতরিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফি, বই-খাতা, কন্যাদায়গ্রস্তদের যথাসাধ্য সাহায্যদানে এ প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরের মধ্যেও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। বীণার কাছেই শুনেছি অনেক ভদ্র, ছুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের।

মেয়ে,—হাত পেতে চাওয়া যাদের পক্ষে সহজ নয়, পুরানো শাড়ি, ব্লাউজ, পায়া পেয়ে তাদের মুখে যে কৃতার্থভাব ফুটে ওঠে দেখলে চোখের জল রাখা যায় না।

'উইমেন্স কালচারাল এসোসিয়েশন' কর্মজীবিনী শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতিষ্ঠান। সমিতির সভ্যাদের দেওয়া চাঁদার টাকায় প্রতি বছর এঁরা শহরের শ্রেষ্ঠ নাট্যসঙ্ঘ অথবা শিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান দিয়ে অর্থসংগ্রহ করে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন। এইসব অনুষ্ঠানে নামীদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অজানা, অচেনা প্রতিভাকে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত করবার চেষ্টাও হয়ে থাকে। দুটি প্রতিষ্ঠানই মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে।

অত্যন্ত খুশী হয়েছি দেখে যে, অবসর সময়ে পরচর্চা, পরনিন্দা ও অন্যের অনিষ্টচিন্তায় সময়ের অপব্যয় না করে সময়টাকে এঁরা সত্যিকারের কাজে লাগাচ্ছেন। কাজের পরিধি যত বড়ই হোক, তার একটা আলাদা মূল্য আছেই আছে। দীনতম মানুষের মধ্যেও থাকে একটা হিরো বা হিরোইন। থেকে থেকে অকারণেই সে হাঁক দিয়ে ওঠে। উপযুক্ত কাজের আনুকূল্য পেলে এই অস্থিরতাই অঘটন ঘটাতে পারে। অন্তত মহৎ কাজের প্রবৃত্তিগুলি উদ্দীপিত হতে পারে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষী।

এরই মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীর পত্তন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই অন্যতম ডিরেকটররূপে আমার যুক্ত থাকা। এই প্রেরণার মূলেও ঐ নিউ থিয়েটার্স। আমরা দশজন ডিরেকটার মিলে পুরানো স্মৃতি জড়িত নিউ থিয়েটার্সকে কিনে নিলাম। রূপান্তরিত প্রতিষ্ঠানের নাম হল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারী।

নিউ থিয়েটার্স আমায় ভুললেও আমি তাকে ভুলতে পারলাম কই? তাই এ প্রস্তাব যখন এল, মনে হল ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের হিসেব মাথায় থাক, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীর সঙ্গে জড়িত থাকলে জীবনের শেষ দিন অবধি নিউ থিয়েটার্সের স্মৃতিলোকের বাসিন্দা হয়েই থাকতে পারব ত। এককালে যেখানে আমি ছিলাম শিল্পী সেখানের ডিরেকটর হবার অভিজ্ঞতার স্বাদটাও থাক না।

উনি বিদেশ থেকে ফেরার পর কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতি বছর নানা দেশ বেড়ানোও আমাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত থাকত। এতে শুধু এক-

ঘেঁষে জীবনের ক্লান্তিই কাটে না। নানান দেশ, লোক, দৃশ্য ও ঘটনা অনেক উপলব্ধির দৃষ্টি খুলে দেয় যার অবকাশ রুটিনে-বাঁধা কর্মব্যস্ত জীবনে মেলে না।

এমন অনেক সময়ই হয় যে দুজনেই, দুজনকে স্নেহ করেছে, কিন্তু বরণ করেনি। হঠাৎই হয়ত একদিন আসে বরণের এই পুণ্যলগ্ন। তখন স্নেহাস্পদ হয়ে ওঠে প্রিয়, বন্ধু হয়ে ওঠে বল্লভ। প্রকৃতির বেলায়ও এই কথা। কত সময় কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের ঢেউ ডেকে যায়। কিন্তু পায় না আমাদের মনের নাগাল। কখনও বা এমন হয় যে, চেয়ে, চেয়ে, চেয়েও অপূর্ব দৃশ্যের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় না সেই সুরটি, যে পথ চেনায়, আড়াল ভেঙে ফেলে।

কিন্তু এক একদিন হঠাৎ হয় অন্যরকম। কেন, কেউ জানে না। কিন্তু হয়। অমনই এ বলে আমি এসেছি, ও বলে আমি দেখেছি। সেদিন শাঁখ বেজে ওঠে, বাতি জ্বলে ওঠে, বাঞ্ছিত লগ্ন ওঠে ঝলকে।

দার্জিলিং ভ্রমণ আমার জীবনে এইরকমই এক স্মরণীয় দিন। কারণ ঐদিনই দার্জিলিং-এর সঙ্গে হয়েছিল আমার সত্যিকারের শুভদৃষ্টি, মালাবদল।

বিশেষ করে মনে পড়ে পাহাড়ী রাস্তাগুলির কথা। ঘোরানো রাস্তা উঠেছে ঠিক স্পাইরালের মতন, যেমন অন্য সব পাহাড়েও। এমন শোভা আর দেখিনি। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। বড় বড় চেনার ও পপলারের জটলা, পাখীর ডাক, পাইন, পিয়ার ও কমলালেবুর গাছ—সে অফুরন্ত। সুন্দর রঙচঙে পাখীও দেখলাম বহু। কিন্তু মনকে মজিয়ে দিল সেখানকার হাজারো নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ, লতাপাতার অন্তহীন ঐশ্বর্য্য আর তুষারের সমারোহ। সবুজের দৃশ্যে মনে জেগে উঠল স্নিগ্ধতা, শুভ্রজটা ধ্যানরূপে অন্তর থমকে দাঁড়ালো সম্ভ্রমে। পর্বতের লাখো রূপ আছে। ঋতুচক্রের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে নিত্যনূতন বিস্ময় মঞ্চ উদ্ঘাটিত করে তোলে আনন্দের পাদপ্রদীপে। কিন্তু স্নিগ্ধতার সঙ্গে ভক্তি, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, জিজ্ঞাসার সঙ্গে গ্রন্থিমোচন, উচ্ছলতার সঙ্গে প্রণতির পাশাপাশি রসভোগ এভাবে আর কখনও করিনি। সেইদিনই দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের শিখরমন্দিরের চুড়ায় একটা মেঘের বৃত্ত রয়েছে যেন একটি বিশাল পীতনীলাভ আংটি হয়ে। আকাশ যেন

পরাতে এসেছে মন্দিরের দেবতাকে। সেই বিবাহসভায় পৌঁছতে হবে কোন পথে তারই যেন ইঙ্গিত দিয়েছে ঐ বিজলী আলোর আঁকাবাঁকা সোপান, ধাপে ধাপে। পাশে বরফ-গলা নদীর মৃদু কলধ্বনি তাল দিয়ে চলেছে এই মৌন-রাগিণীর সঙ্গে।

কাশী ভ্রমণের সময় মনে হয়েছে সৃষ্টিকর্তা প্রতি মহিমময় দৃশ্যের মধ্যে নিত্য নব প্রেরণার উৎস এমন বিচিত্র উপায়ে সঞ্চিত করে রাখেন—যার রঙীন পরশ প্রতিজনকে তার অনন্ত আবেগ বিলিয়েও নিঃশেষ হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের রহস্যগভীর চোখে কাশী দেখার কথা শুনেছি। সে দৃষ্টি ত আমাদের নেই। তবু বেনারসে এসে নৌকা বেয়ে ভেসে বেড়াবার সময় মনে হয়েছে আমরা যেন সময়ের তরণীতে এক বিগত যুগের বেলায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে পরিচিত সবকিছুই একটা অজানা-অচেনা নূতনের রঙে অপরূপ মহিমাভূষিত হয়ে উঠেছে। এ এক শান্তরসাশ্রিত সৌন্দর্য্য।

ভেনিসের গণ্ডোলাবিহার মনোরম। ভেনিসের রূপের অবধি নাই। কিন্তু তবু বলব ভেনিস যেন গতিশীলতার প্রতিমূর্তি। আর কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট যেন জগতের সকল আনন্দ উৎসবের অন্তরালের অনিত্যতার এক মধুর বৈরাগ্যের সাক্ষী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেনিস বর্ণের, গতির, লাস্যের, সঙ্গীতের, কাব্যচিত্রের অনুরাগিণী। আর মণিকর্ণিকা ঘাটের তীর ঘেঁষে নৌকাবিহারে মনে হয় কাশী বিগত বৈভবের, লুপ্ত গৌরবের, বাসনার চরম অবসানকেই বড় করে দেখবার প্রয়াসী।

এই নদীর বুকে ভাসতে ভাসতেই মনে প্রশ্ন জেগেছে নদীকে কেন এত আপনার মনে হয়? পর্বতের শোভার মধ্যে সম্ভ্রমের উপাদান যথেষ্ট থাকলেও কেমন যেন পর পর লাগে, এর মধ্যে নেই সে ছন্দ যা নদীর গতিভঙ্গী ও লহরীলীলার মধ্যে পাওয়া যায়। নদীর আপনা বিলানো ভাবের মধ্যে যেন মিশে আছে মানুষের সভ্যতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠার পুলক-পরশ। সর্বপ্রাচীন সভ্যতাও ত গড়ে উঠেছে নদীর উপত্যকারই আশেপাশে। দেখেছি কোনারক ভুবনেশ্বরের মন্দিরশিল্প। আবার তাজমহলও দেখেছি।

হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরের ওপর হৃদয়ভরা শ্রদ্ধা নিয়ে দেখতে গিয়ে বড় হতাশা জেগেছে মন্দিরের অন্তঃপুরের শ্রদ্ধা উবে-যাওয়া অযত্ন দেখে। প্রথমতঃ মন্দিরে ঢোকবার আগেই দস্যুতুল্য পাণ্ডাদের উৎপাতে ভক্তিভাবের

মধুর আবেশ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারপরে বিগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছবার আগে জলকাদা ও নোংরা পিচ্ছিলতায় দেবস্থানের মাহাত্ম্য ভুলে আত্মরক্ষার চিন্তা মনকে অনেকটাই উদ্দেশ্য থেকে কেন্দ্রচ্যুত করে। এছাড়া মন্দিরের চারপাশে, উঠোনে পানের পিক ও অন্যান্য দাগের কথা ত ছেড়েই দিলাম।

দেবস্থানকে অকলঙ্ক শুচি পরিবেশে সুন্দর করে রাখা কি পূজারীদের দেব-সেবার অঙ্গ নয়? তুলনামূলক বিচারে মুসলমানদের সমাধি মন্দির, মসজিদ, গির্জার পরিচ্ছন্নতা এটুকু অন্ততঃ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে এঁদের উপাসকমণ্ডলী তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন নন।

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনুরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মন্দির-শিল্পে সংযমের অভাব দৃষ্টিকেই শুধু নয়—মনকেও বড় পীড়িত করে। প্রস্তরগাত্রে কারুকার্যের আগুনের মুগ্ধকারী গুণ অস্বীকার করতে পারে কে? কিন্তু কোণারক ভুবনেশ্বর বা পুরীর মন্দিরে কারুকার্যের বাহুল্য দেখে ভাবছিলাম এখানে কি শিল্পীদের উদ্দেশ্য ছিল সৌন্দর্যসৃষ্টি করা, না কারিগরীর অসংখ্য নৈপুণ্য দেখিয়ে মানুষকে চমকে দেওয়া? বাহাদুরী দেখানো এক, শিল্পসৃষ্টি আর। ভাবতে বিস্ময় লাগে এতবড় শিল্পদক্ষতার অধিকারী হয়েও সৌন্দর্যের মর্মবাণীটি এরা উপলব্ধি করতে পারেননি।

এসব দেখার পর তাজমহল এবং আরো নানান জায়গায় মোগল আমলের আরো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নমুনা দেখে মনে হয়েছিলো হিন্দু মন্দিরনির্মাতাদের যেন জীবনের একটিমাত্রই উদ্দেশ্য ছিলো। সে উদ্দেশ্য কি? না, কোনো কারুকার্যকে বাদ না দেওয়া। এ যেন অপরিণতবোধ গায়ক-গায়িকার অনবরত তান ও গমকের আতিশয্যে রাগরাগিণীর মূর্তিকে ঢেকে দেবার সাড়ম্বর প্রয়াস। শ্রোতা ও শিল্পীর মধ্যে এক মরমী আনন্দসেতু গড়ে তোলা নয়।

কিন্তু তাজমহল? তার অকলঙ্ক শুভ্রতা নিয়ে যেন 'কালের কপোলতলে একবিন্দু নয়নের জল'-এর মতই শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির রূপবদলের মতই তারও কত রূপ-বৈচিত্র্য। কিন্তু মূল সুর এক—সেই বিরহী অন্তরের বেদনা। ভোরের আলোয় স্নান করে বিরহিণী যেন শুক বিষাদে যমুনার দিকে চেয়ে থাকে। অপরাহ্নে অস্তগামী সূর্যের আলো

স্ফটিকের গায়ে পুরবীর উদাসী বিষণ্ণতার যে অনুরণন তোলে সে আলো যেন দর্শকচিত্তকেও গৈরিক আভায় অনুরঞ্জিত করে।

জ্যোৎস্নারাতে তাহই আবার আর এক রূপ। চাঁদের আবছা আলোয় দূরভাসী ছবিখানির মতই তাজমহলের তলায় বসেই প্রথম অনুভব করি যে চাঁদনী রাত আনন্দমাখা নয়। এর মধ্যে যেন একটা একাকীত্বের বেদনা মাখানো।

এই এক তাজমহলই মনকে কত বিচিত্র রাগিণীর সুরে ভরিয়ে তোলে। কই মন্দিরগাত্রের প্রতিটি ইঙ্গিতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম কারুকার্য পারে না ত মনে সে আবেশের মায়া রচনা করতে?

তাই ত ভাবি কত যুগ যুগ সঞ্চিত সাধনায় তবে শিল্পকলার সৌন্দর্যে সরলতার গুহ্য তত্ত্বটি মানুষ আবিষ্কার করেছে।

কি গানে, কি চিত্রকলায়, ঐ একই সত্যকে অনুভব করা যায়। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর গানে যে তানালাপের সংযম, অলঙ্কারের পরিমিত প্রয়োগ ও সুরের প্রশান্তি মনে বিছিয়ে যায় তার সঙ্গে বাহাদুরীলোলুপ শিল্পীর সার্গামের চরবিবাজির তুলনা করলে দেখি গানের ক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনার পরে সঙ্গীতের আবেদনে, সরলতার দাম দিতে শিখেছে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। রেনেশাঁর আগের যুগের ছবি-গুলিতে রঙের অতিপ্রয়োগ, নরমূর্তির সংখ্যাবাহুল্য, অসংখ্য দেবদেবীর আমদানী দেখতে দেখতে যেন শ্রান্ত মন বুঝতে আরম্ভ করে কেন্দ্রগত বক্তব্যকে উপলক্ষ দিয়ে ঢেকে না ফেলাটাই হোলো সত্যিকারের আর্ট। আর এই সাদা সত্যটা বুঝতেই দাভিঞ্চি, রাফায়েল, মিচেল এঞ্জেলোর মত বিরাট শিল্পীর প্রয়োজন হয়েছিল।

রাজস্থান বেড়ানোর সময়ই রাণা প্রতাপ সিংহের ছবি যেন দেখিয়ে দিয়েছে ক্ষাত্রবীরত্বের মহত্তম অভিব্যক্তি মানুষের প্রতি ভঙ্গিতে কেমন করে ফুটে ওঠে। এমন কি নেপোলিয়নের ছবিও বীরত্বের প্রতি মনে এ সম্ভ্রমবোধ জাগাতে পারেনি।

প্রতাপ সিংহের তেজোদৃপ্ত চাহনী ও বীরত্বব্যঞ্জক ভাবভঙ্গীর পাশে তারই পুত্র অমর সিংহের গোলাপফুলের দিকে চেয়ে থাকা, হীনপ্রভ দৃষ্টি, কুণ্ঠিত গতিতে যেন বিলাসপ্রিয়তার এক অলস রূপ মনকে পীড়িত করে।

…খুব বেশী দেশ ঘোরা হয়নি। কিন্তু যেখানে যতটুকু দেখেছি

টুরিস্টের মত বাস্তবাগীশ চোখ-বোলানোর দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারিনি। প্রতি মানুষের মত প্রতি দেশেরও একটা নিজস্ব সত্তা আছে। আছে তার অন্তরের ভাষা, তার ভাব ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এই অন্তরের ভাষাটিই সবসময় কান পেতে শুনতে চেয়েছি।

•• প্রকৃতির উদার, মুক্ত রূপ আমায় ছোটোবেলা থেকেই বড় টানে। হয়ত সেইজন্যই কবীর রোডের বাড়ি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরী করিয়েও সে বাড়িতে বেশীদিন থাকতে পারিনি। ওখানে থাকতে বারান্দায় বা বাইরে দাড়ানোর উপায় ছিলো না। তখনই মনে হয়েছিলো এমন কোনো জায়গায় নিরালা একটি বাড়ি করা যায় না যেখানে প্রতিবেশী হবে আকাশ, গাছ, আর সঙ্গী হবে ফুল, লতা, ফল ও সব্জির বাগান? সেই কল্পনারই বাস্তব রূপ আমার রিজেন্ট গ্রোভের বাড়ি। এ বাড়ি বোধহয় আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও আকর্ষণীয়।

এই বাড়িতেই রাণাকে পেয়েছি। ও আস্তে আস্তে বড় হোলো, সুস্থ হোলো। ওর বিয়েও দিলাম গত বছর। রাণার বিয়েও আমার জীবনে এক বেদনা-আনন্দভরা ঘটনা। অনেকেই, এমন কি আমার স্বামীও এত অল্পবয়সে (এমন কি গ্র্যাজুয়েশনের আগেই) ছেলের বিয়েটা বড় বাড়াবাড়ি রকমের সেকেলীআনা বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এই সেকেলীআনা যে আমার মজ্জায়। একে ছাড়াটা প্রায় ধর্মত্যাগ করার মতই ভয়াবহ। তবু বলি নিছক সেকেলীআনা মনই এই অপরিণত বয়স ও মনের ছেলের বিবাহ দেবার কারণ নয়।

এর প্রেরণা পেলাম কোথায়? আমারই বাগানের ডালিয়া গাছে এক বছর দেখেছিলাম পাশাপাশি দুটি ফুল ফুটতে। প্রায় একই আকারের, একটু ছোটোবড়। দুটি সাথীফুলের কুঁড়ি থেকে ফুল,—সেই ফুলের পূর্ণ বিকাশ দেখে মনে হোলো আমার রাণারও যদি ছোট্ট একটি সঙ্গী এনে দিই? একসঙ্গে পড়বে, বসবে, বেড়াবে, খেলবে আর লাল ডুরে শাড়িটি পরে সারা বাড়ি আলো করে বেড়াবে? তারপর ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনও যখন পরিণতির পথে এগোবে—দুজনেই দুজনকে প্রতি মুহূর্তে নূতন করে চিনবে, জানবে, মুগ্ধ হবে, ভালবাসবে।

খুব বেশী খুঁজতে হয়নি। বিধাতা আমার কল্পতরু। খুব অল্পদিনের মধ্যেই দেখা পেলাম ফ্রকপরা, ছোট্ট সুন্দর মেয়েটির। আমার সেই চৌত্রিশ

বছরের বন্ধু অন্নপূর্ণার (মিসেস সারদা দাস) সহায়তায়। শুভকাজের আয়োজনে আমি একদিনও দেরি করিনি।

কিন্তু তবু যে দেরি হয়ে গেল। বিয়ের ঠিক আগের দিন রাত্রে। তত্ত্ব সাজানো থেকে শুরু করে সব কাজ সেরে সবাই বিশ্রাম নিতে যাবে এমন সময় মার হঠাৎ প্যালপিটেশন শুরু হোলো। হার্টের রোগী। এরকম প্রায়ই হয়। আবার সেরেও যায়। যথারীতি ডাক্তার এলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল অন্যান্যবারের চেয়ে অবস্থাটা সঙ্গীন। এ সঙ্গীন অবস্থাও কাটল। সুস্থ অবস্থাতেই সামান্য একটু দুধ খাওয়ার পরই হঠাৎ চোখ বুঁজলেন।

তখনও কেউ বুঝিনি মা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বৌমা (অরুণের স্ত্রী) বিবাহ উপলক্ষে এসেছিল। সে কি বুঝল জানি না। হঠাৎ মার কানের কাছে যেয়ে গোপালের নাম শুরু করল। ঐ নাম উচ্চারণের ভঙ্গীতেই যেন মার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। তারপরেই সব শেষ।

এরপর কি হোলো জানি না। আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম বলে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিলো। ঘুম আসেনি। তবে আচ্ছন্ন চেতনা সত্ত্বেও সবই বুঝতে পারছিলাম। রাণার বন্ধুরা, আমার স্বামী, দাদাবাবু (দিদির স্বামী) মিলে সব ব্যবস্থা করেছেন। নিয়ে যাবার আগে আমায় ধরে ওঁরা সবাই মিলে মার সঙ্গে শেষ দেখা করাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি যাইনি। সে দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না বলেই নয়। ছোটবেলা থেকেই মা ও দিদি ছাড়া আপনার বলতে কেউই ছিলো না। মা একাধারে আমার বন্ধু সাথী মা সবই। ছোটবেলায় মার গলা জড়িয়ে বলতাম—'মা, আমরা দুজনে একসঙ্গে মরব'। মা বলতেন—'আচ্ছা'। আমি বলতাম—'তুমি আগে গেলে কিন্তু আমি তোমার মুখ দেখব না'। মা হেসে বলতেন, 'তাই হবে'।

তাই হোলো। ঠিক ঐ সময়ে ঐ কথাটি মনে পড়েছিলো বলেই মাকে শেষ দেখা দেখতে পারিনি। পারিনি আজীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধুর চিরবিদায়ের মুহূর্তে তাঁকে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে যেতে।

সেই রাতেই ভাবী কুটুম্ববাড়ি, পুরোহিত সবাইকে জানানো হোলো। ওঁরা বললেন, দিদিমা পরমাত্মীয় হলেও ভিন্নগোত্রীয়া। এ মৃত্যুতে শুভ কাজ আটকায় না।

ভাবলাম—আমার যা ক্ষতি হোলো তা ত পূর্ণ হবার নয়। তবে আর অন্যকে শুধু শুধু অসুবিধায় ফেলব কেন? ওঁদের আয়োজন সম্পূর্ণ। আত্মীয়কুটুম্বে ঘর ভর্তি। এক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধ করা মানে ওঁদের একরকম বিপদেই ফেলা।

গোপালের দিকে তাকালাম। মনে হোলো নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার বেদনার্ত অন্তরের পানে। দুটি ডাগর চোখ যেন জলে টলমল করছে। আমার গোপালকে খাওয়ানো, স্নান করানো, বেশ পরিবর্তন করার কেউ কেউ আপত্তি করেছিলেন। অশৌচ অবস্থায় দেববিগ্রহ স্পর্শ করতে নেই বলে। আমি সব বিধান মেনেছি। শুধু এই একটি বিধানই মানতে পারিনি। মেনেছি আমার অন্তরের নির্দেশ। আমি যদি অশুচি হয়ে থাকি তবে গোপালকে ছুঁলেই ত শুদ্ধ হয়ে যাব। তবে? ওকে অস্নাত অভুক্ত রেখে শুচি-অশুচির নিয়ম আমি মানতে পারব না। আমার রাণাকে ছুঁলে যদি অপরাধ না হয় ত গোপালকে ছুঁলেও অপরাধ হবে না—এই ছিল আমার অন্তরের বিশ্বাস।

সেদিন ব্যাকুলভাবে গোপালকে ডেকে বলেছিলাম, 'এমন আনন্দ কোথায় পাব যার মধ্যে কোনো দুঃখের সুরই বাজবে না? সেজন্য তোমায় দোষ দিই না। একদিকে সাধের রাণাকে তার নবজীবনের দ্বারে পৌছে দেবার আনন্দ অন্যদিকে আবাল্য সুখদুঃখের আশ্রয় মাকে হারানোর ব্যথা—দুটি বিবাদী সুর মেলাবার কঠিন পরীক্ষায় যদি ফেলেছ, তুমিই এ সঙ্কট উত্তীর্ণ করিয়ে দাও। শোককে জয় করবার, বেদনাকে বোধনায় রূপান্তরিত করবার শক্তি দাও প্রভু।

গোপাল শুনলেন ত সেই প্রার্থনা। দিলেন ত শক্তি। শুভকাজ সুসম্পূর্ণ হোলো। বিয়ে হোলো। বড় সাধের বালিকাবধূ ঘরে এল। সকলের পুলকের প্লাবন, উচ্ছ্বাসের উলুধ্বনিতে আমিও যোগ দিয়েছি। কাউকে বুঝতে দিইনি মনের মধ্যে কি ঝড় বইছে যখন রাঙা-চেলী-পরা বালিকাবধূর হাত ধরে রাণা গোপালের পরই তার দিদিমাকে প্রণাম করতে পারল না বলে। সকল কাজ আশ্চর্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবার পর মন ভরে উঠেছিল একটি চেতনার উদ্ভাসে,—আমি ধন্য হয়েছি। ঠাকুরের মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি।

গত সপ্তাহের 'অমৃত'খানা নিয়ে পড়তে বসেছি হঠাৎ দেখি স্যাণ্ডি (আমার কুকুর) দু-পা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বইটা কেড়ে নিয়ে ছেঁড়বার উপক্রম করছে। 'কি হোলো, এত রাগ কেন?'—যত আদর করে শান্ত করবার চেষ্টা করি ওর গোঙানী আর চীৎকার থামে না। রাণা আর বুলা (আমার পুত্রবধূ) ত হেসেই অস্থির। কি ব্যাপার? ওরা বলল, 'সত্যি মা, এ তোমার ভারী অন্যায়। তোমার জীবনীতে তুমি বিশ্বশুদ্ধ লোকের কথা বললে, আর স্যাণ্ডি তোমায় এত ভালবাসে ওর কথা এক লাইনও লিখলে না? ওর ক্ষেপে যাবার অধিকার নিশ্চয় আছে।' শুধু রাণা বুলাই নয়, দিদি দাদাবাবু বাড়ির সবাই এমন কি আমার মালী পর্যন্ত স্যাণ্ডির দিক নিল।

সত্যিই ভারী ভুল হয়ে গেছে। আমার সারাক্ষণের সঙ্গী স্যাণ্ডির কথা না লেখাটা নিশ্চয় অপরাধ। প্রতিক্ষণ শুধু আমাকেই নয় বাড়ির সকলকেই ও প্রহরায় রাখে। আমার মা যখন স্নানের ঘরে ঢুকতেন একটু দেরি হলেই ও ছুটে গিয়ে জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দিত। মা চেঁচিয়ে বলতেন, 'স্যাণ্ডি, আমার হয়ে গেছে আসছি'—তবে শান্ত হোতো। আমার পাশে কেউ বসলে (এমন কি আমার ছেলে পর্যন্ত) ও ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ঠেলে মাঝখানে বসবেই। জানোয়ার হলে কি হবে? হৃদয়ের ক্ষেত্রে ও পুরোপুরিই ক্যাপিটালিস্ট। রাণাকে আমার কাছ ঘেঁসতে দেয় না, কিন্তু আমি যদি কখনও রাণাকে বকি ও রাণার পক্ষ নিয়ে চেঁচিয়ে আমায় কামড়াতে আসে। কয়েক বছর আগে আমার হার্ট অ্যাটাকের সময় যখন আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়েছিলাম আর পুরো তিনদিন কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুয়েছিলাম ওকে কেউ খাওয়াতে পারেনি। চুপটি করে বিষণ্ণ হয়ে খাটের তলায় শুয়ে থাকত আর কাঁদত। বাড়িতে সবার কাছে শুনেছি আমায় যখন অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল ও জলভরা চোখে সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসেছিল। কি করুণ দৃষ্টি! স্যাণ্ডির সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে "The more I see man, the more I respect my dog". এত ভালবাসা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এরই মধ্যে আমার প্রোডাকসনের 'অভয়া-শ্রীকান্ত' মুক্তিপ্রাপ্ত হোলো। সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেও এ ছবির কমার্শিয়াল সাকসেস একেবারেই হয়নি। কোনোরকমে লোকসানটাই শুধু বেঁচে গিয়েছিলো।

ছবি রিলিজ হবার এগার দিনের মাথায় পাকিস্তানের যুদ্ধ ব্লাকআউট ইত্যাদির কারণে জনসাধারণ বিপর্যস্ত। মোটমাট সব মিলিয়েই এ ছবি খুব একটা চলেনি।

এর পরে, পরেই বা বলি কেন, অনেক আগেই 'বিপ্রদাস' করবার পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু কত বাধা যে বাংলা সিনেমায় চিত্র-প্রযোজকদের। ১৯৫১ সালে যখন বিপ্রদাসের মহরৎ হোলো—ভেবেছিলাম বন্দনার রোল করব আমি। মহরতের পরই আমরা বিদেশে চলে গেলাম। ফিরে এসে স্যুটিং-এর কাজে হাত দেব এইটেই মনে ছিল। কিন্তু ওখানে থাকাকালীন খবর পেলাম রাম চৌধুরী মহাশয় 'বিপ্রদাসের' কপিরাইট নিয়ে আমার বিরুদ্ধে কেস করেছেন। কেস চলতেই থাকল—বছরের পর বছর গড়িয়ে, আমারও বয়স বাড়তে বাড়তে বন্দনার ভূমিকা গ্রহণের সময় চলে গেলো। তখন ভাবলাম নাই হোলো বন্দনা, সতীর ভূমিকাতেই নামব। দিন যেতে যেতে সতী সাজার পর্যায়ও অতিক্রান্ত হোলো। তখন ভাবতে শুরু করলাম 'বিপ্রদাসের মা সাজলে কেমন হয়?'—অবশেষে একদিন কেস সমাপ্ত হোলো, শেষ পর্যন্ত আমাদেরই জিত হোলো। কিন্তু তার অনেক আগেই মনটা অভিনয়-জগৎ থেকে সরে গিয়ে অন্যজগতে আশ্রয় নিয়েছে।

এমনই আমাদের বিচার-বিভাগের সুব্যবস্থা যে সামান্য একটা কপি-রাইটের ব্যাপারে রায় দিতে কুড়ি বছর গড়িয়ে যায়। কেস জিতেছি। কিন্তু টাকার হিসেব নিকেশের পালা আজও কোর্ট থেকে শেষ হয়নি। অর্থ ও সময়ের অপব্যয়ের পরিমাণ কল্পনার অতীত। প্রাপ্য টাকা কোনোদিনও পাব কিনা জানি না। কিন্তু বিশ বছর আগে এ প্রোডাকসন শুরু হলে হয়ত আড়াই বা তিন লাখ টাকায় ছবিটি হয়ে যেত। এখন করতে গেলে কমপক্ষেও খরচ পড়বে সাত লাখ টাকা।

সমান্তরাল বিপাকের মধ্যে চলেছে 'চরিত্রহীন'। এ বই-এর কপি-রাইটের মীমাংসাও কুড়ি বছর ধরে অনড় অবস্থায় পড়ে আছে। এর শেষ কোথায়—ঈশ্বর জানেন।

এই প্রসঙ্গেই মনে আসে বাংলা ফিল্মের বর্তমান দুরবস্থার কথা। এত চিত্ররসিক, এমন রুচিসম্পন্ন দর্শক, এবং সাহিত্যিক-প্রধান দেশ হয়েও বাংলা ছবির অগ্রগতি যেন আজ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কেন? চট্ করে

কোনো বিশেষ কারণ, বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠিকে এর জন্য দায়ী করা চলে না। অনেক কারণ এমনভাবে জট পাকিয়ে আছে যে যথার্থ কারণটা দু-চার কথায় স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা কঠিন। তবু চেষ্টাই করি না।

ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে প্রোডিউসার, ডিরেক্টর ও একজিবিটারের ভূমিকাই প্রধান। একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিটি জনের মত এঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। এঁরা তিনজন যদি বাংলা সিনেমার উন্নতিকল্পে হাতে হাত মিলিয়ে ব্যক্তিগত লাভের কথাটা একটু কম চিন্তা করে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির কথা চিন্তা করেন তাহলে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হওয়া সম্ভব বলেই আমি মনে করি।

প্রথমেই নিবেদন করি প্রোডিউসার ও ডিষ্ট্রিবিউটার সংবাদ। আজকাল যদিও প্রোডিউসার নামক ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানটি প্রায় বাতিল হবারই উপক্রম হয়েছে (যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটারই একাধারে সব), তবু প্রোডিউসারের অস্তিত্ব আছে এমন ছবির কথাই ধরা যাক।

প্রোডিউসার ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে টাকা নিয়ে ছবি শুরু করলেন। অনেক প্রোডিউসারেরই প্রবণতা থাকে স্যুটিং চলাকালেই ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে পাওয়া অর্থের বেশ কিছু অংশ আগেভাগেই নিজের তহবিলে জমা করার দিকে। বলা-বাহুল্য ডিস্ট্রিবিউটার বোঝেন সবই। কারণ তিনি নির্বোধ নন। ব্যবসার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সং-অসতের তফাতটাও তাঁর জানা। তবু বাধ্য হয়েই নীরব থাকেন। কারণ অনেক টাকাই তখন ছবিতে নিয়োগ করা হয়ে গেছে। ফেরার পথ আর কই?

এইভাবে ছবিটি শেষ হোলো। তখন মঞ্চে এলেন ডিস্ট্রিবিউটার। তিনি পূর্বচুক্তি মত ছবিটি কয়েক বছরের জন্য চালাতে শুরু করলেন কমিশন-বেসিসে। হাউসে ছবিটি চলতে শুরু হওয়ার পর থেকেই অনেক ডিস্ট্রিবিউ-টারেরই দৃষ্টি থাকে লভ্যাংশের প্রায় সমস্তটার ওপর এবং তাঁর এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় সং-অসং উভয় প্রোডিউসারই প্রায়ই মার খান। (বলা বাহুল্য সব ডিস্ট্রিবিউটারের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।)

যেমন কোলকাতায় ফ্লপ-করা ছবি অনেক সময় মফঃস্বল এবং অন্যান্য জায়গায় হয়ত ভালই চলল, কিন্তু সে হিসেবের অনেকখানিই থেকে যায় যবনিকার অন্তরালে। প্রোডিউসারকে ক্ষতির অঙ্কটাই দেখানো হয়ে

থাকে। অতএব একটা দু'টা ছবি করার পরই জোরালো আদর্শবাদী প্রোডিউসারের তরফের শিল্পানুরাগ অথবা শিল্পচর্চা স্তিমিত হয়ে আসে। তখন স্বাভাবিক কারণেই প্রযোজকের পরবর্তী ছবির সংখ্যা পরিকল্পনা ছোটো হয়ে আসে।

এর পরে—একজিবিটারের মঞ্চগ্রহণ। এ-দৃশ্যের হিরো তিনিই। শুধু হিরো বললে কমই বলা হয়। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। ছবি ফ্লপই করুক অথবা হিট্‌ই করুক—ঝড়, তুফান, বৃষ্টি, বজ্রপাত, যুদ্ধবিগ্রহ যাই হোক তাঁর নির্ধারিত প্রাপ্য তাঁকে দিতেই হবে। নইলে কড়া হুমকী বাংলা ছবির বদলে হিন্দী অথবা ইংরাজী ছবি চালান হবে। হাউস ফুল হলে ত লভ্যাংশের অর্ধেক তাঁরই প্রাপ্য। আবার এ নিয়মও আছে যদি কোনো ছবিতে সপ্তাহে তাঁদের নির্দিষ্ট টাকার টিকিট বিক্রী না হয়, তাহলে তাঁরা হল থেকে ছবি তুলে দেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় আমার শ্রীমতী পিকচার্সের কোনো একটি হিট্ পিকচারের কথা। ছবিটি প্রত্যেকটি হাউসে বেশ ভালভাবেই চলছিল, কিন্তু উত্তর কলকাতার কোনো একটি হলে দুদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ভেসে যাবার দরুন কোনো এক সপ্তাহে চুক্তিমত যত টাকার টিকিট বিক্রী হওয়ার কথা ছিলো তার চেয়ে মাত্র ত্রিশ টাকার মত কম বিক্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হলের মালিক ছবি তুলে দিলেন। বলা বাহুল্য এই নির্মম ব্যবসায়িক ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হোলো আমাদের অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটার এবং প্রোডিউসারকে। আর এই ক্ষতির আশঙ্কা যখন প্রতি পদেই, ডিস্ট্রিবিউটারকেই বা দোষ দিই কেমন করে? তাঁকেও ত দেখতে হবে, যে টাকা তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে নিয়োগ করেছেন সেটা যেন খোয়া না যায়? এইসব নানা কারণেই বাংলা ছবির সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে। যাও বা হচ্ছে রিলিজড্ হতে পাচ্ছে না হলের অভাবে। বেশীর ভাগ হাউসের মালিকদের চেষ্টা থাকে হিন্দী অথবা ইংরাজী ছবি চালানোর দিকে। কারণ তাতে টাকা বেশী পাওয়া যায়।

আবার এইসব কারণেই আমার মনে হয় সেন্সার বেসিসেই ছবি রিলিজড্ হলে ভাল হয়। তাতে করে অন্ততঃ অকারণে নিশ্চল হওয়া অবস্থা এবং রিলিজের ব্যাপারে কোনো কারসাজীর হাত থেকে বাংলা ছবি বেঁচে যেতে পারে। বাংলাদেশে হাউসের সংখ্যাদৈন্যও বাংলা ছবির

দুর্দশার অন্যতম কারণ। হাউসের সংখ্যা না বাড়ালে বাংলা ছবির এই অমানিশা কাটবে না।

এ-ছাড়া হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলা ছবির পরাজয় ত স্বাভাবিক ঘটনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আগেই বলেছি, যে কোনো হাউসের মালিক বাংলা ও হিন্দী ছবির মধ্যে দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দেবার দিকেই ঝুঁকবেন। কেন? না তাদের ছবি চালালে লাভের অঙ্ক মোটা হবে। তাছাড়া বোম্বাই ছবির চাহিদাও বাংলা ছবিকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। কারণ? এক টাকা সত্তর নয়া পয়সায় দর্শক এখানে একাধারে রঙিন ছবি দেখার আনন্দ পাচ্ছেন। নিত্য নূতন দর্শনীয় মুখ (কারণ ওখানে রূপসমৃদ্ধ নায়ক-নায়িকার সংখ্যাধিক্য) দেখার বৈচিত্র্য উপভোগ করছেন। নাচ, গান, উত্তেজক সেক্সের দৃশ্য ইত্যাদি সাড়ে বত্রিশভাজার মত পাঁচমিশেলী আমোদের উপকরণ পাচ্ছেন। সে জায়গায় বাংলা ছবিতে রঙিন ছবির সংখ্যা প্রায় শূন্য বললেই চলে। তারপর হিরো-হিরোইনদের ক্ষেত্রে স্বল্প কয়েকটি চেহারাকেই প্রায় সব ছবিতে ঘুরেফিরে আসতে দেখা যায়। এঁদের মধ্যেও আবার সকলের বক্স-অফিস সমান নয়। এবং সেই কারণেই বক্স-অফিসের নায়ক বা নায়িকা এমন একটা দক্ষিণার দাবী করেন যে প্রোডিউসার অথবা ডিস্ট্রি-বিউটারকে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়। শিল্পীদেরও দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা জানেন ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা, অতএব দিন থাকতে তাঁর অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার করবেন নাই বা কেন? আর এতবড় প্রতিষ্ঠানের সবাই যদি আপনাপন স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন তাঁর একার বিবেচনায়—চলচ্চিত্র শিল্পের আর কতটা উন্নতি হওয়া সম্ভব?

তারপর সেন্সারবোর্ডের বিচারও পক্ষপাতহীন নয়। বাংলা ছবির এস্থেটিক বিচারের সময় তাঁরা যতটা কঠোর ঠিক ততখানিই উদার হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে। বোম্বাই ফিল্মের এমন অনেক ছবি আজকাল আসছে যা সপরিবারে বসে দেখার অযোগ্য। এসব ছবির উদ্দেশ্য থাকে তরুণ সম্প্রদায়ের যৌন-লালসাকে উদ্দীপ্ত করা আর বোধহয় পরোক্ষভাবে খানিকটা তৃপ্ত করাও (যদি দেখার মধ্যে কোনো তৃপ্তি থাকে)।

তাছাড়া হিন্দী ছবির মার্কেট বাংলা ছবির তুলনায় অনেক ব্যাপক হওয়ার ফলে শুধু বাংলাদেশের বাইরেই নয়, ভারতের বাইরে হিন্দী ছবির

নায়ক প্রযোজক, সঙ্গীত পরিচালক অথবা পরিচালককে তাঁরা যত বেশী চেনেন বাংলা ছবির স্রষ্টা অথবা নায়ক-নায়িকাদের তার সিকিভাগও চেনেন না। কয়েক বছর আগে রবিশঙ্করকে একবার আমার বাড়িতে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সুকমলবাবু এবং আরো অনেকেই সেখানে ছিলেন। তখনই বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের বর্তমান প্রসার সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে রবু বলল ওদেশের কয়েকটি জায়গায় গিয়ে একেবারে প্রথমের দিকে ও আশ্চর্য হয়ে যেত, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বোম্বাই ছবির বিশেষ কয়েকজন সঙ্গীত পরিচালক ছাড়া কাউকেই ওদের চিনতে না দেখে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিপুল সম্পদ তাঁদের কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল। এখন রবু ও আলি আকবরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রকৃত শিল্পীদের কয়েকজনকেও অন্ততঃ ওঁরা চিনতেই শুধু নয়, যথার্থ সম্মান দিতে শিখেছেন। আজ সঙ্গীতের আলাপ শুনলে ওঁদের চোখে জল আসে। শুনে আনন্দ হয়েছিলো, আবার ক্ষোভও হয়েছিলো সঙ্গীতের ক্ষেত্রের এই সুবিস্তৃত জনপ্রিয়তা বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও কেন বিস্তৃত হবে না? কেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচালক ছাড়া বাংলা সিনেমা জগতের কাউকেই ওঁরা চিনবেন না? বাংলা দেশে যত অভাবই থাক, প্রতিভার অভাব ত কোনোদিন ঘটেনি।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা যারা ফিল্ম ল্যাবরেটরীর এবং স্টুডিওর সঙ্গে জড়িত আছি তাদের করণীয় অনেক কিছু আছে একথা আমি মানি। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সব সময় সব কিছু করা সম্ভব হয় কি?

বাংলা দেশে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির অগ্রগতির জন্য আমরা কি কি করতে পারি? হিন্দী ছবির যখন এত সুবিস্তৃত বাজার, বাংলা দেশেও হিন্দী ছবি হওয়া নিশ্চয় দরকার, যেমন হোতো নিউ থিয়েটার্সের যুগে। আগেকার দিনে চিত্রনির্মাতা এবং স্টুডিও মালিক একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ছবি তৈরীর যন্ত্রপাতি এবং স্টুডিওর অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপার সবই তাঁরা দেখতেন, যথাসম্ভব যত্ন নিতেন এবং যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টায় মন দিতেন। কিন্তু এখন স্টুডিও-মালিক ও চিত্রনির্মাতা দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠান। ফলে স্টুডিওগুলিও ভাড়া দেওয়া বিয়েবাড়ির মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা আসেন কাজ করে চলে যান—স্টুডিওর যন্ত্রের দিকে তাদের দৃষ্টি থাকে না। থাকার কথাও নয়। আর এই সব স্টুডিও ভাড়া নিয়ে আমরা এমন কিছু পাই

না বা আধুনিক যন্ত্রপাতি অথবা অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে ব্যয় হ'তে পারে। কারণ লেবার চার্জ ছাড়াও সেটিং-এর উপকরণ এবং অন্যান্য প্রোডাকসন খরচ যতখানি বেড়েছে সেই তুলনায় স্টুডিও ভাড়া বাড়েনি। সরকারের ট্যাক্সের হারও প্রচুর বেড়ে গেছে। হাউসের ভাড়া ত অসম্ভব রকম বেড়েছে। কিন্তু মজা এই যে বাড়তি ভাড়ার এক পয়সাও প্রোডিউসার অথবা ডিস্ট্রিবিউটারের হাতে আসে না। যা দিয়ে তাঁরা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির উন্নতি সাধন করতে পারেন।

তাছাড়া কস্ট-অফ-লিভিং মহার্ঘ হওয়ার দরুন কর্মীদের অসন্তোষ, দাবী-দাওয়া বেড়েই চলেছে। সব সময় হয়ত তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তবু আমরা মানে—ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ল্যাবরেটরীর সঙ্গে যারা জড়িত আছি যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাঁদের কাজের মর্যাদা দিতে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ডিগনিটি অফ লেবারে। প্রতি বছর বোনাস ছাড়াও লভ্যাংশের একটা ভাগ আমরা এঁদের দিই। শুধু টাকাটাই এখানে বড় নয়। সবার পরিশ্রমে যা পেলাম তার আনন্দের পরিমাণটাও সবাই মিলে মিশে ভাগ করে নিতে চাই—সে যতটুকুই হোক না কেন? কখনও কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি এমন কথা বলতে পারি না। তবে এঁরা অবুঝ নন। সবাই মিলে বসে পরিস্থিতির কথা আলোচনা করে বুঝিয়ে বললে আমাদের সমস্যাকে এঁরাও নিজেদের সমস্যা বলে গ্রহণ করেন। তাই এঁদের সঙ্গে আমাদের ভারী সুন্দর একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমরা সবাই এখানে এক পরিবারের মতই।

তবে আমাদের ক্ষমতা ও আয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই স্টুডিও ইকুইপমেন্টসের সংস্কার করাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বুঝেও করে উঠতে পারি না একথা আগেই বলেছি। যেমন কালার ফিল্মের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে আর সব দেশের মতই কালার ফিল্মের চাহিদা আছে। কিন্তু প্রসেসিং-এর ব্যবস্থা নেই। সে সুযোগ বোম্বাই ও মাদ্রাজে আছে বলেই চিত্র-ব্যবসার ক্ষেত্রে ওদের অগ্রগতি লক্ষ্য করার মতই।

বড় ছবি ছাড়াও ডকুমেন্টারী ছবি ও প্রাইভেট পার্টির ছবি যদি করা যায় তাতে আয় বাড়ে এবং তা নিয়ে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির উন্নতিও করা যায়। কিন্তু অর্ডার পেলেও আমরা নিতে পারি না আমাদের ল্যাবরেটরীতে ব্যবস্থার অভাবে।

অতএব শেষ পর্যন্ত একটি কথাতেই দাঁড়াতে হয়, সরকারী সাহায্যের অভাব। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রি একটা ব্যাপক জিনিস, এর উত্থান-পতনের সঙ্গে অনেক পরিবারের ভাগ্য জড়িত, এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও। কারণ, এ থেকে সরকারের আয় প্রচুর। দেশের কল্যাণের দিকে তাকিয়েই এদিকে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়ানো প্রয়োজন। পৃথিবীর সব দেশের চলচ্চিত্র যখন দ্রুত অগ্রগতির পথে—আমরাই কি পিছিয়ে থাকব—উপযুক্ত সরকারী সাহায্যের অভাবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদিকে একটু সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব বলেই আমি মনে করি।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে বোম্বাই ও মাদ্রাজী ছবি সরকারী সাহায্য ছাড়াই চলে কেমন করে (যতদূর জানি বোম্বে-মাদ্রাজের চলচ্চিত্রে সরকারী অবদান নেই)? সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক হিন্দী ছবির টেকনিকাল প্রোগ্রেস এত উচ্চমানে পৌঁছনো সম্ভব হোলো কেমন করে? এখানেই ঘুরে ফিরে আসে ঐ একই কথা। ওদের বহুধাবিস্তৃত ব্যবসা ক্ষেত্র, এবং সেই কারণেই অর্থাগমও প্রচুর। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণেই তাঁরা সাহিত্য বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে নিকৃষ্ট মানের হয়েও বাংলা ছবির ওপর সগৌরবে বিজয়-পতাকা ওড়াচ্ছেন। অবিলম্বে সিনেমা হাউস বাড়ানো, স্টুডিও ও ল্যাবরেটরীর সকল রকম প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া সরকারের অবশ্য কর্তব্য। এ-বিষয়ে তাঁদের আশ্বাস আমরা বহুদিন ধরেই পেয়ে আসছি। কিন্তু আজ বাংলা সিনেমার এই নাভিশ্বাস ওঠার মুহূর্তেও কি সে প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার সময় আসেনি?

অবশেষে স্মৃতিপরিক্রমার শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছলাম। এ-ও এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বইকি। কোনো দিন এ ধরনের স্মৃতিচারণে ব্রতী হবার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কারণ প্রথমেই বলেছি 'জীবনী' লেখার মত বৃহৎ জীবনের অধিকারী বলে আমি নিজেকে কোনোদিন মনে করি না। জীবনী লেখা তাদেরই সাজে যাঁদের আলোকস্তম্ভের মত জীবন অপরকে অন্ততঃ বিস্তর পথের দিশা দিতে পারে; আমার সে সম্বল কই? তাই অনেকেরই অনুরোধ, অনুনয়কে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। 'অমৃত'র তরফ থেকে যখন তাগিদ এল তখনও যে মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল না তা নয়। তবু রাজী না হয়ে উপায় ছিল না যখন জানলাম এ ইচ্ছেটা এমন একজন মানুষ

প্রকাশ করেছেন যাকে ফেরাবার সাধ্য আমার নেই। তুষারবাবুর অপরিসীম স্নেহের কাছে আমি চিরঋণী। যখন যেখানে দেখা হয়েছে উনি সেইভাবেই আমার সমাদর করেছেন যেমন করে দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর নিজের মেয়েকে দেখলে তার বাবা কাছে টেনে নেন। ওঁর সান্নিধ্যে যখনই এসেছি অনুভব করেছি ওঁর অনাড়ম্বর স্নেহ ও আবেগের উত্তাপ। এ স্নেহ তথাকথিত স্নেহের ভঙ্গি নয়। এ তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত উচ্ছ্বাসের কোমলধারা তার প্রমাণ পেয়েছি বহুবার। এতবড় কাগজের অধিকর্তা কিন্তু কোনো উন্নাসিকতা তাঁর মধ্যে কখনও দেখিনি। জীবনে যা কিছু বড়, মহৎ—তার প্রতি তাঁর অকৃপণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন—শুধু আমারই নয় যে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তার মনেই শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে।

চিত্রজগতে আমার অবদান কতটুকু জানি না, কিন্তু এ কথা ত কোনো দিন অস্বীকার করতে পারব না যে অমৃতবাজার পত্রিকাতেই আমি সর্বপ্রথম 'ফার্স্ট লেডি অফ্ বেংগলী স্ক্রিন' বলে সম্মানিত হয়েছি।

জীবনী লেখার দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা আমার নেই সত্যি। কিন্তু এ কথাও সমান সত্যি যে তাঁর স্নেহের দানকে উপেক্ষা করবার মত ঔদ্ধত্যও আমার নেই। কারণ এমন করে স্নেহ করবার মত মানুষ জীবনে কটা মেলে? এই নির্মল সম্পর্কের প্রতি সম্মান জানাবার জন্যই অত্যন্ত সংকোচভরে এ কাজ শুরু করেছিলাম। আর এ দায়িত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথাসম্ভব সচেতন থাকবার চেষ্টাও করেছি।

চেতনার শুরু থেকে জীবনের প্রতিটি পরিচ্ছেদ, অনুভূতির প্রতিটি মোড়-ঘোরাকে দেখেছি পুণ্যার্থী তীর্থপরিক্রমীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভরা দৃষ্টি নিয়ে। পুণ্যার্থী বলছি এই কারণে কোনো মানুষের জীবনই শুধু আপনাকে নিয়েই সম্পূর্ণ হতে পারে না। চারপাশের পরিবেশ, দৃশ্য, জনপদ, মানুষ, বিভিন্ন মানুষের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর অভিজ্ঞতা থেকে তিল তিল করে বৈচিত্র্য সম্ভার আহরণ করেই গড়ে ওঠে আমাদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব। আপন লক্ষ্যে পৌঁছবার পরও যদি তীর্থপরিক্রমার মতই ফেলে-আসা সুদীর্ঘ জীবনপথের স্মৃতিচারণা করা যায় তখন সেই অনুভবের জ্বলে ওঠা আলোতেই দেখতে পাই এমন অনেক কিছু যা আগে দেখা হয়ে ওঠেনি হয়ত, বা এগিয়ে চলার দুর্বার আবেগের প্রসাদেই চেনা যায় এমন অনেক সত্যকে, যে চেনা সম্ভব হোতো না গভীরতাবোধে স্থিতধী না হলে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার পর প্রথম

প্রথম উচ্ছল চঞ্চল দীপ্ত মুখরতার মুহূর্তে মনে হয়েছিলো আলোকোজ্জ্বল পার্টি, সিনেমা, বড় বড় হোটেলের চটকদার রঙিন পরিবেশ, নিত্যনূতন চমক লাগানো শাড়ি গয়না—এরই মধ্যেই বুঝি জীবনের চরম গৌরব পরম সুখ। কিন্তু এ জীবনে জীবন যোগ করতে না করতেই শ্রান্তি এল। দেখতে পেলাম চোখ ধাঁধানো আলোর পিছনের থমকে দাঁড়ানো পুঞ্জীভূত অন্ধকারের হতাশাকে। অবহিত হলাম এর অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে। এ জীবন ক্ষণিকের আমোদ দিতে পারে কিন্তু আনন্দ দিতে পারে না। সর্বত্র একই ধরনের কথা, একই আলোচনা তথাকথিত অভিজাত্যের অন্তরালের হীনপ্রভ লঘুতা জীবন ও জগত সম্বন্ধে দৃষ্টিকে যেন সংকুচিত করে দেয়।

হঠাৎ একদিন দেখলাম কখন কোন ফাঁকে আনমনেই ঐ জগৎ থেকে সরে এসে গৃহমুখী মনটা আশ্রয় নিয়েছে ঘরের নিভৃত নীড়ে। প্রিয়জনের সান্নিধ্যে—তাদের সঙ্গে মিল অমিলে রচিত নানান বাঁধনে, পারস্পরিক সেবায় যত্নে স্নেহে সবার ওপর আমার গোপালের মধুর হাসির অভয়দানে যে সুখ শান্তি, অনাবিল আনন্দ তার তুলনা কোথায়? সারা বিশ্ব ঘুরেও ত এর ছিটে ফোঁটা খুঁজে পাইনি। এই ঘরোয়া জীবনে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতাই যে আমার মজ্জায় মজ্জায়? হয়ত সেইজন্যই বাহিরের গড্ডলিকাপ্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারিনি।

তাই বলছিলাম স্মৃতিরেখার এই পথ বেয়ে অতীতচারণ করতে করতেই যেন তীর্থযাত্রার আনন্দ ও শুচিতার পুণ্যস্পর্শে ধন্য হলাম। নূতন করে জানলাম জীবন ও জীবনদর্শনকে। আর প্রণাম জানাবার অবকাশ পেলাম তাদের যাঁদের অবদানে জীবনপাত্র ভরে উঠেছে। হয়ত সবকথা গুছিয়ে বলতে পারিনি, অতি নিকটত্বের কারণে অতি আপনজনও অনেকসময় দৃষ্টির পরিধির বাইরেই থেকে গেছেন, এমন কোনো অপরাধ ঘটাও বিচিত্র নয়। তবু আমি এই আশাই রাখব, আমার এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে কেউ অকৃতজ্ঞ মনের ঔদ্ধত্য ভেবে আমার প্রতি অবিচার করবেন না।

আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনকাহিনী শুরু হবার পর থেকে বহু পাঠকের চিঠি, টেলিফোন, বন্ধুজনের অভিনন্দন আমায় মন খুলে কথা বলবার প্রেরণা যুগিয়েছে। সকলের দরদী দৃষ্টির স্নিগ্ধ ছায়ায়, ক্ষমা-সুন্দর চিত্তের অভয় আশ্বাসে বেরিয়ে এসেছে মনের অনেক গোপন বিদ্রোহ, অন্তরগহনের অভিমানী বেদনা। একবারও মনে হয়নি অগণিত অপরিচিত পাঠক-

পাঠিকার কাছে জীবনের কথা বলতে এসেছি। এই ক্রমাগত সহৃদয় পাঠকের স্নেহবন্ধনে যেন ভারী সুন্দর একটা সংসার গড়ে উঠেছে, যার গোড়াপত্তন ছিল আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাভরা বোঝাপড়া।

আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, প্রতি মুহূর্তেই একটি ছবি ভাসত আমার চোখের সামনে। আমি যেন ঝড়ের রাতে ছোট্ট একটি নৌকো বেয়ে সমুদ্রের বুকের ঝঞ্ঝা-তুফান অতিক্রম করে ছুটে আসছি বালুকাবিস্তৃত সমুদ্র-বেলার দিকে। মাঝে মাঝে আলোর রেখার মত তটভূমির আভাস জেগে উঠছে। আবার পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ-এর আঘাতে মিলিয়ে যাচ্ছে কোন অতলে। কিন্তু দুরন্ত ইচ্ছাশক্তির তাড়নায় সে অচৈতন্য-ভাব কাটিয়ে আবার ভেসে উঠছি সেই ঢেউ-এর চূড়ায়—দেখছি সেই আলোতট যেন আমায় ডাকছে।

অবশেষে একসময় এসে পৌঁছলাম। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। নীল চন্দ্রাতপের তলায় অগণিত মানুষের ভীড়। তাঁদের দিকে এগোতে এগোতে মনে হোলো সবাই যেন আমার পরমাত্মীয়,—উদ্বিগ্নচিত্তে আমারই প্রতীক্ষায় বসে। আমায় দেখে সবাই ছুটে এলেন। কেউ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন সিক্ত চুল। কেউ বা ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। সকলেরই চোখে ফুটে উঠল সাগ্রহ জিজ্ঞাসা—তুফান-ভরা সাগর পেরিয়ে কেমন করে তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারলাম? শুধু কি তারাই? টোকলামাথায় দুষ্টু মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চাঁদও যেন স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ঝিকমিকে ফুলের মত তারারা পাপড়ি মেলে ফুটে উঠলো। কানে আসছে তটের বুকে সমুদ্রের অশ্রান্ত আছড়ে-পড়ার মিলন রোল। এ কল্লোলধ্বনি উচ্ছল, তা মানি, কিন্তু কান পেতে শুনলেই যেন অনুভব করা যায় যে সমুদ্রের এই অঝোরধ্বনি ছলকায় তার জলগর্ভের এক অতল নীরবতার উৎস থেকে।

একনিমেষে জনতা হয়ে উঠল মিলনমেলা। এ যেন আমার অগণিত পাঠকের সঙ্গে বোঝাপড়ার মিলনোৎসব। কত রকমের মানুষ এই মেলায়। কিন্তু তাঁদের স্নেহ ও সহানুভূতির আনুকূল্যেই জীবনের সকল বিরোধ যেন পলে ডুবে মজে গেছে অতল সিন্ধুমৌনে। সকলের দৃষ্টি থেকে যেন ঝরে পড়ছে একটি সুরের আভাস যা শান্ত রসাস্পদ আর যার মধ্যে আছে সামগ্রিকের উদাত্ত শান্তি। এ দুষ্টু শিশুর চঞ্চল, নিকলুষ চাউনীর চেয়েও

শুভ্র, রোগশয্যায় পীড়িত সন্তানের দেহাশ্রয়ী মায়ের অন্তঃদৃষ্টির চেয়েও করুণাভরা। ভাবের জোয়ারে এই আনুকূল্যের ঢেউ:য়েই বুঝি বেজেছে চাপা সুখের ছন্দ। এই করুণাভরা দৃষ্টির আলোই যেন আমার অন্তরে লুকোনো অদেখা জগৎকে আমার কাছে উদ্ভাসিত করে তুলল।

জীবনে এইখানেই যত সত্যকার অন্তরঙ্গতা—এই বেদনার অন্তঃপুরে।

কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই নীলাকাশের তাঁবুর তলায় এই মিলনমেলাতেই ঠিক দলাদলি না হোক ছাড়াছাড়ি দুটো সুরবৈষম্য কি মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়নি আর? একটি সংসারের মধ্যেই যেন আর একটি সংসার। আর এই দুটি সংসারের রান্না আলাদা নয় বটে—কিন্তু কান্না আলাদা।

আমার স্বীকৃতিতে ভান নেই, আমার জীবনদ্বন্দ্ব এ কাহিনীতে অন্তর-স্পর্শী রূপ নিয়েছে, আমার নিঃসঙ্কোচ নির্ভয়তা সবাইকে আনন্দ দিয়েছে একথা যেমন শুনেছি, শুনেছি তার উল্টোটাও।

যেমন আমি অনেকের সম্বন্ধে এমন কথা বলেছি যা না বললেও পারতাম, এমন জায়গায় পর্দা তুলে ধরেছি যা অন্তরালে থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিল। আবার কোনো বন্ধুকে এমন মতামতেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, আমি নিজের ছবি যতটা ভাল করে এঁকেছি অত 'ভাল' আমি নই। এর অনেকটাই আমার ভান।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে এই কথাই বলব, আমি শুধু অভিনয় অথবা সঙ্গীতশিল্পের সঙ্গেই জড়িত নই, প্রযোজনা, পরিচালনা, বিচারকমণ্ডলী, ডিরেক্টরবোর্ড তথা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির প্রতিটি বিভাগের সঙ্গেই আমি যুক্ত—এবং দীর্ঘকাল ধরেই সংশ্লিষ্ট। যখন নীরব ছিলাম,—নীরবই ছিলাম। কিন্তু বলার দায়িত্বে যখন স্বীকৃতির স্বাক্ষর দিয়েছি তখন সত্যকথনের তাগিদে কিছুটা নির্মম না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ আমার এ বিবৃতি ত শৌখীন ভাববিলাস নয়, অবসরবিনোদনের আমোদজাতীয় কোনো বস্তুও নয়। মরণ পণ করে যে জীবন সৃষ্টি করতে চেয়েছি (কতটা পেয়েছি তা আমার বিচার্য নয়, যদিও আনন্দটাই আমার) তাকে নিয়ে আর যাই হোক ছেলেখেলা করা যায় না। এ নিয়ে কেউ যদি ব্যথা পেয়ে থাকেন দুঃখিত হলেও আমি নিরুপায়।

সত্য সামনে এসে যখন দাঁড়ায়, ব্যথা পেলেই বা চলবে কেন? সত্য

যে আসলে ডাকাত। যখন এসে বলে, দাও আমার খাজনা, তখন উট-পাখির মত মিথ্যার বালুতে মুখ লুকালেই সে তো আর অদৃশ্য হবে না? কোনো কিছুতে সত্যনিষ্ঠ হব এ অঙ্গীকারের মানে কি এই নয় যে সত্য বলে যাকে বুঝব তাতে ব্যথা পেলে সবার আগে সেই ব্যথাকেই দেব বিদায়? আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি থাকতে পারে কি? সত্যকে যদি বলি এসো তাহলে তার পদার্পণে ব্যথা পেলেও মিথ্যাকে বলতেই হয় যাও। নইলে সত্যকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে অতিবিনয় অথবা ঔদ্ধত্য কোনোটাকেই প্রশ্রয় না দিয়েও সাধারণভাবেই বলা যায়, মানুষকে অনেকসময় ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক অরুচিকর পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয়, যার ওপর তার কোনো হাত থাকে না এবং সেজন্য তাকে দোষীও করা যায় না। কিন্তু সচেতনভাবে কদর্য আবেষ্টনীর সঙ্গে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করাটা অবশ্যই অমার্জনীয় অপরাধ। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। যে জীবন পড়ে-পাওয়া তার অনিবার্য অশুচিতার দায়দায়িত্ব আমার নয়। কিন্তু এই পড়ে-পাওয়া জীবনকে অতিক্রম করে যে জীবন ও জগৎ আমি রচনা করেছি আমার সারাজীবনের ভাবভাবনা, চিন্তাকল্পনা, একাগ্রতা ও অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা দিয়ে, গর্ব করে নয় সবিনয়েই জানাচ্ছি, আমার সে সৃষ্টি এতবড়ই হোক, আর এতটুকুই হোক তার মধ্যে কোনো খাদ নেই। আমার সারাজীবনের এত সাধের সৃষ্টি সম্বন্ধে এতটুকু বিদ্রূপের আঘাতও আমি সইব না। এ বিষয়ে আমি স্পর্শকাতরই শুধু নই—এ হোলো আমার সারাজীবনের চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জে যদি কোনো গলদ থাকত আজ সকলের স্নেহসিক্ত হয়ে এমন মন খুলে এত কথা বলতে পারতাম না। আর যদি তা মিথ্যার বেসাতি বা আষাঢ়ে গল্প হোতো, আপনারাও এত ধৈর্যসহকারে এতদিন ধরে তা পড়তেন না। কারণ যা মিথ্যা তা আপন স্বভাব-ধর্মেই ভেঙ্গে যায়, মনের গভীরে কোনো স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না।

এই অবকাশেই বলতে চাই কতকগুলো বিভ্রান্তিকর কথা সম্বন্ধে আমার ধারণা। যেমন 'চরিত্র' একটি মস্তবড় কথা এবং তার চেয়েও অনেক বড় এর ব্যঞ্জনা ও ওজন। নরনারীর অসামাজিক মিলনমাত্রকেই চরিত্রের অধঃপতন বলা যায় না, একথা সত্য। কিন্তু তাই বলে একথাও আমি বলব না যে, অবাধ দেহউপভোগেও চরিত্র বজায় থাকে। না, তা থাকে

না, থাকতে পারে না। কিন্তু এ সবের বাইরেও মানুষের চরিত্রগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার একটা দায়দায়িত্ব নিশ্চয় আছে এবং সে দায় মনুষ্যত্বের দায়। জীবনে কোনোরকম দেহবিলাস না করেও মানুষ চরিত্রহীন হতে পারে। অনেকসময় খ্যাতিমান মানুষের চেয়েও অখ্যাত, অজ্ঞাত লোকের মধ্যেও চরিত্রের বিকাশ দেখা দেয়। চরিত্র মানে সকল দোষত্রুটি, দুর্বলতা, মহত্ত্ব নিয়ে একটা পরিপূর্ণ মানুষ। কতসময় দেখেছি, কোনো একটা বিশেষ দিকে বড় হতে গিয়ে অন্যান্য দিকে মানুষ এত ছোটো হয়ে যায় যে তাকে তখন ঠিক মনুষ্য পদবাচ্য বলে ধরা যায় না। সেসব কথা যথাযথ-ভাবে তুলে ধরা যায় না বলেই হয়ত বাংলাভাষায় জীবনচরিতের চেয়ে 'চরিতামৃত'র প্রাধান্যই বেশী—যেখানে জীবন্ত মানুষের চেয়ে মৃতের গুণ-কীর্তনের মুখরতাই জুড়ে থাকে অনেকটা জায়গা।

'জীবনী' লেখার যোগ্য জীবন আমার নয়। কিন্তু লিখতেই যদি হয় আমার সমস্ত সম্পূর্ণতা অসম্পূর্ণতা মেশানো পুরোপুরি আমাকেই বা মেলে ধরব না কেন? কেন বলতে দ্বিধা করব আমার অযোগ্যতার পরিমাণকে অগ্রাহ্য করেও চিরকাল বড় কিছুর স্বপ্নই দেখেছি, গভীরের পিপাসাই বহন করেছি?

যতটুকু সার্থক হয়েছি তার জন্য সকলের অবদানের কাছেই আমি নতশির, যা হয়নি তার জন্য কোনো ক্ষোভ নেই। তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এইটুকু সান্ত্বনাই থাকবে যে কোনো সহজলভ্য প্রলোভনের রঙিন মায়ায় আপনাকে হারিয়ে ফেলিনি।

এই প্রসঙ্গেই বলি আর একটি কথা। কেউ কেউ আমার স্মৃতিচারণ পড়তে গিয়ে হতাশ হয়েছেন এই। ত কই ইসাডোরা ডানকান অথবা চার্লি চ্যাপলিনের মত হোলো না? কোনো চাঞ্চল্যকর উত্তেজক বস্তুর অভাবই তাঁদের বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে।

বিদগ্ধ রসিকের এহেন প্রত্যাশা আমাকে হতাশই শুধু নয় বিস্মিত ও করেছে। আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবনদর্শন, জীবনকে অধ্যয়ন ত আমার চিন্তা, ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির ছাঁচেই হবে। একজনের বক্তব্য অপরের কার্বনকপি বা অপরের জীবনের প্রতিধ্বনি হতে পারে কেমন করে? যদি হয় তবে সেই চেষ্টাকৃত আকর্ষণসৃষ্টিতে একটা কৃত্রিমতা এসে যায় না কি?

এছাড়াও একটি সহজ সত্য কেন এঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল যে প্রাচ্যদেশের শিল্পী ও পাশ্চাত্যের শিল্পীর ধ্যানধারণা, স্বপ্ন ও আদর্শে একটা প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকবেই? তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাতেই বোঝা যায় উভয় দেশের মানুষের জীবনকে দেখবার ভঙ্গি কত আলাদা।

বহুদিন আগে কবিগুরুর শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষেই এক পত্রিকায় অধ্যাপক শিশির সেনের একটি রচনা মনকে বড় স্পর্শ করেছিল। হ্যামলেট ও কর্ণের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছিলেন জননীর চিত্তচাঞ্চল্যের প্রতি দুই দেশের দুই সন্তানের দৃষ্টিপাতের তফাৎটা। চরম নাটকীয় মুহূর্তে হ্যামলেট পিতার হত্যাকারী খুল্লতাতের সঙ্গে বিবাহিত মাতার দুই কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলছেন :

'You are your husband's brother's wife.'

আর কর্ণ? সারাজীবন মাতৃস্নেহে বঞ্চিত থাকার দুঃখ, বেদনা, অপমানের সীমাহীন যন্ত্রণা—তাঁর কঠিন সংযমের শাসনে সংহত। শান্ত, নীরব অভিমান যেন দুফোঁটা অশ্রুধারার মত ঝরে পড়ল একটি বাক্যে—'তুমি কুন্তী? অর্জুনজননী?'

একজন অন্তরের ফেটে-পড়া ক্ষোভের দাবানল জ্বালিয়ে যেন অপরের অন্যায়কে কঠোর দণ্ড দিতে উন্মুখ, আর একজনের অন্তরের কাতরতা ধ্বনিত তার কান্নাভেজা অনুযোগে :

"মাতৃস্নেহ কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ,
সে কথার দিও না উত্তর।"

আপন সন্তান যখন অপরিচিতের মত মাকে বলে 'তুমি অর্জুনজননী'—তার চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? এখানে মাতৃস্নেহ পাওয়ার তৃষ্ণা, পেয়েও হারানোর বেদনা,—সবই আছে। কিন্তু অত্যুগ্র ক্ষাত্রধর্মের তেজবিভূষিত বলেই তার মহিমা এমন উজ্জ্বল। মার প্রতি কর্ণের অভিমানের অন্ত নেই। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হয়ে তাঁর এতটুকু অসম্মান করেননি। বিদ্রোহ ও প্রত্যাখ্যানের কঠোরতাও যেন অভিমানে কোমল :

"যে ফিরালো মাতৃ স্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস?"

তারপর সকল প্রখরতা, দুর্জয় অভিমান যেন শুদ্ধ বিষণ্ণতায় রূপান্তরিত :

"জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান

আমি রব নিষ্ফলের—হতাশের দলে।"

জন্মরাত্রে জননীর কাছ থেকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার বেদনা ভুলতে পারেননি আত্মসম্মানী বীর, যদিও স্নেহবুভুক্ষু পুত্রের রিক্ত অন্তর চিরঅশ্রুমুখী।

এই ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম ও বিনয় কি কোনো পাশ্চাত্য কবির কল্পনায় সম্ভব? কি করে তা হতে পারে? জীবনের কাছে ওদের চাওয়ার ধরন যে সম্পূর্ণ আলাদা।

এই প্রসঙ্গে দিলীপদারই সম্প্রতিকালের বইয়ে পড়া একটি ঘটনা উল্লেখের লোভ সামলাতে পারছি না। খুব সম্ভব আমেরিকা ভ্রমণকালেই একটি হোটেলে থাকাকালে পাশের ঘরে পিতাপুত্রের যে সংলাপ তাঁর কানে এসেছিলো সেইটুকুই পাশ্চাত্য জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ করবার পক্ষে যথেষ্ট। গভীররাতে নর্মসহচরীকে সঙ্গে নিয়ে জনৈক মার্কিন তরুণের হোটেলে ফিরে পিতার দরজায় করাঘাত :

'বাবা, দরজা খোলো শীগ্‌গির।'

'অসম্ভব, এখন কি দরজা খোলা যায়?'—পিতার উত্তর।

'কিন্তু, সঙ্গে যে আমার গার্লফ্রেণ্ড।'

'ভেতরে আমার সঙ্গেও একটি আছেন বৎস—এমতাবস্থায় তোমায় দরজা খুলি কি করে?'

ওদেশে পিতাপুত্রের মধ্যে এহেন কথোপকথন কি এদেশে কোনো পিতা অথবা পুত্র ভাবতে পারেন? না, স্ত্রী-পুরুষের এহেন মিলন স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে নির্বিকার চিত্তে মেনে নেওয়া হয়?

প্রেমের কাছে, জীবনের কাছে ওরা চায় কি? শান্তি? স্থায়িত্ব? স্নিগ্ধদ্যুতি? না তো! চায় বিদ্যুজ্জ্বালা, গর্জন, বর্ষণ, উচ্ছ্বাস, বর্ণবৈভব, —সর্বোপরি অফুরাণ বৈচিত্র্য। নিজেদের ওরা ভুলেও গুটিয়ে নেয় না, সংবরণ করতে জানে না। ভেতরের দিকে চায় না, কেবলই হাত পাতে বাইরের কাছে। তাই ত বিজ্ঞান, ভ্রমণ, বেশাবিন্যাস, যানবাহনের গতি-বৃদ্ধি এসবে ওরা আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছে। কিন্তু প্রেম, ত্যাগ, ধ্যান

—তথা অন্তর্মুখী সাধনায় আজও কি এরা শিশু নয়? জীবনের কাছে আমরা যে চাই একেবারেই আলাদা বর।

তাই বলছিলাম ইসাডোরা ডানকানের জীবনের চাওয়া এবং আমার জীবনের চাওয়া যে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে। একের জীবনতৃষ্ণা ঠিক অন্যের মত হতে পারে কেমন করে?

আর চমক, উত্তেজনা, হৃদয়াবেগের নাটকীয় ওঠাপড়ার উপকরণ যোগানোর জন্য ত রয়েছে সহস্র আধুনিক উপন্যাস, বোম্বে ফিল্ম আরো কত কিছুই। তার জন্য এখানেই বা এত অধীরতা কিসের?

আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি, জীবনের কাছে আমি চেয়েছি মধুর শান্তিনিলয়, স্বপ্নভরা আরামকুঞ্জ, উদার আকাশ। লক্ষ্যহীন, সঙ্গীহীন গতি আমায় ত্রস্ত করে। বিষণ্ণতায় মন ভরিয়ে দেয়।

সকল ক্ষুদ্রতাকে উত্তরণের যে স্বপ্ন জীবন-ভোর দেখেছি আমি চেয়েছি শুধু তারই একটু আভাস দিতে। কারণ তার বেশী কিছু দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

জীবনে পরীক্ষা বড় কম দিতে হয়নি। কিন্তু মহাসঙ্কট লগ্নেও উদ্বিগ্ন হলেও চঞ্চল যে হইনি তার কারণ বোধ হয় জ্ঞান হওয়ার আগেই দীক্ষা পাবার আশ্চর্য যোগাযোগ। খুব ছোট বেলায় খেলাঘরের সংসারেই ছোট্ট একটা হাঁড়ির মধ্যে পেয়েছিলাম আইভরীতে খোদাই-করা গোপালের ছোট একটি মূর্তি। হঠাৎ পাওয়া সেই ছোট মূর্তিটিই হয়ে উঠেছিল আমার ধ্যান, জ্ঞান, জপমন্ত্র। তার পর থেকে একটি দিন, একটি মুহূর্তও আমার সঙ্গে গোপালের ছাড়াছাড়ি হয়নি। সেই মূর্তি থাকে আমার লকেটে।

বাড়িতে মন্দির তৈরী করে গোপালকে প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহের খোঁজে গেলাম নানান দোকানে। দেখলাম অজস্র মূর্তি। জয়পুরের, রাজস্থানের, নানা জায়গার—আর কত রকমের। কিন্তু কোনটাই আর চোখে লাগে না। সবই যেন অবাঙ্গালী হৃষ্টপুষ্ট, পরিণত চেহারার মূর্তি। কোথায় সেই বৃন্দাবনের শ্যামলিমা-মাখানো যশোদা মায়ের আদুরে ননীচোরা? যে স্নেহে কোমল, রহস্যে গভীর, কৌতুকে সদাচঞ্চল? ফিরেই আসছিলাম। হঠাৎ ওপরের দিকে অযত্নে রাখা অনেকগুলি মূর্তির মধ্যে একটি মূর্তি চোখে পড়ল। ধুলোর আস্তরণে প্রায় সবটাই ঢাকা। তবু তারই মধ্যে দুটি ডাগর চোখের চাউনি যেন আমায় প্রবল বেগে আকর্ষণ করল। দোকানীকে

বললাম, 'নামান ঐ মূর্তি'। ওরা ত অবাক। সেরা সেরা মূর্তি পছন্দ হল না আর পছন্দ হবে ঐ ধুলোয়-ঢাকা, এক পাশে সরিয়ে রাখা নিরেস বিগ্রহ?

যাই হোক মূর্তিটি নামান হল। একটু ঝাড়মোছ করতেই ধুলোর মধ্যে থেকে হাসির ঢেউ তুলে বেরিয়ে এলেন আলোর দুলাল—আমার সেই ছোট্ট আদরের গোপাল।

বাড়িতে এনেও কিন্তু তাকে মন্দিরে রাখতে পারিনি। রেখেছি আমার শোবার ঘরে। যাতে চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে ওকে দেখতে পাই।

সেই খেলাঘরের সংসার থেকে আমার গোপাল আজ এই বৃহৎ সংসারের আনন্দের কেন্দ্র হয়ে সকল দুঃখ ঝঞ্ঝা, বিপদের সাগর অনায়াসেই পার করে দিচ্ছেন। তাঁরই অন্তহীন ভালবাসাকে অনুভব করি আজ ঘরে, বাইরে সকলের ভালবাসায়। অজস্র মানুষের স্নেহে, সম্মানে, আদরে, অনাদরে। যখনই কারো শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় মন দুলে ওঠে, মনে হয় গোপাল আমার ওপর ভারী খুশী আছেন। তাঁর ভালবাসা, আদরের স্পর্শই রয়েছে এই সম্মানপ্রাপ্তিতে। যদি কোথাও ব্যথা পাই মনে হয় নিশ্চয় আমার গোপালের কাছে কোন অপরাধ হয়েছে। তাই সে রাগ করে আমায় দুঃখ দিচ্ছে। জীবনের প্রতিটি কর্মময় মুহূর্ত আজ যেন পূজার এক একটি লগ্ন। আমার প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের এই পূজোয় তাদের সবার প্রতিই থাকে আমার প্রণাম, যাঁদের আশীর্বাদে, ভালবাসায়, স্নেহাদরে আমি আজ এই আমি হয়েছি। তাই 'রহিল পূজোয় মোর তাঁহাদের সবার প্রণাম'—কবিগুরুর এই চরণটি উচ্চারণ করেই আমার কাহিনীর সমাপ্তি টানলাম।

কানন দেবীর ছায়াছবির জীবনের মোটামুটি একটি হিসেব

১৯২৬ সালে ম্যাডান থিয়েটার্স লিঃ-এর ব্যানারে কানন দেবীর প্রথম অভিনেত্রী জীবনের প্রথম ছবি জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় পরিচালিত **জয়দেব** (রাধার চরিত্রে), এরপর চার বছর তিনি অদর্শনা।

১৯৩১ সালে ম্যাডান কোম্পানীর ব্যানারেই **ঋষির প্রেম** ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা। ঐ বছর এবং ঐ কোম্পানীতেই **প্রহ্লাদ** ও **জোর বরাত** ছবির মধ্যে প্রথমটিতে নারদের ভূমিকায় এবং দ্বিতীয়টিতে নায়িকার ভূমিকায়।

মহাভারতের একটি গল্পকে কেন্দ্র করে রচিত ম্যাডান কোম্পানীরই একটি পৌরাণিক ছবি **বিষ্ণুমায়া** হোলো তাঁর পরবর্তী ছবি। এ ছবিতেও তিনি পুরুষ চরিত্রের (নারায়ণ ও কৃষ্ণর) ভূমিকা গ্রহণ করেন। সুন্দর চেহারা ও মধুর কণ্ঠের জন্যই তিনি এ-দুটি চরিত্রে নির্বাচিত হন।

ম্যাডান থিয়েটার্স লিঃ-এ কানন দেবীর শেষ ছবি সম্ভবতঃ কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত **শংকরাচার্য**।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাধা ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিবদ্ধা।

১৯৩৩-৩৪ সালে রাধা ফিল্মের প্রথম ছবি প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত **শ্রীগৌরাঙ্গ** ছবিতে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র ভূমিকাভিনয়ের পর প্রতিভাময়ীরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হন।

এরপর প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত **মা** ছবিতে ব্রজরাণীর ভূমিকায় অভূতপূর্ব খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৩৫ সালে কেশব ফিল্মসের তরফ থেকে জে. জে. ম্যাডান প্রযোজিত ও সতীশ দাশগুপ্ত পরিচালিত **বাসবদত্তা** ছবিতে বাসবদত্তার ভূমিকায়।

১৯৩৫ সালেই রাধা ফিল্মস লিঃ প্রযোজিত **মানময়ী গার্লস স্কুল** ছবিতে শিল্পী জীবনের প্রকৃত সম্মান ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা।

১৯৩৬ সালে রাধা ফিল্মস কোম্পানীর **কৃষ্ণসুদামা** চিত্রে রুক্মিণী ও **কণ্ঠহার** চিত্রের নায়িকারূপে পূর্বখ্যাতিকে সুনিশ্চিত করেন।

এরপর শ্রীফণী বর্মা পরিচালিত **বিষবৃক্ষ** চিত্রে কুন্দনন্দিনী ও কণ্ঠহারের হিন্দী সংস্করণ **খুনী কৌন** চিত্রের নায়িকারূপে।

মা ছবির হিন্দী সংস্করণে জনপ্রিয় হিন্দী চিত্রাভিনেতা জাল মার্চেন্ট ও জুবেদিয়ার বিপরীতে।

এরপর রাধা ফিল্মের ব্যানারে তার শেষ ছবি **চার দরবেশ**।

১৯৩৬ এর শেষের দিকে কানন দেবী নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধা হন। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ছবি দেবকী বসু পরিচালিত **বিদ্যাপতিতে** ঐতিহাসিক যশের শিখরে উন্নীতা যদিও প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ঘটে নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত দ্বিতীয় ছবি **মুক্তি**-র। **মুক্তি** ১৯৩৭ এর ১৭ই সেপ্টেম্বর 'চিত্রা'য় এবং **বিদ্যাপতি** ১৯৩৮ সালের ২রা এপ্রিল থেকে শুরু হয়।

এরপর যথাক্রমে **সাথী** ও তার হিন্দী সংস্করণ **স্ট্রীট সিংগার** শ্রীফণী মজুমদারের পরিচালনায়। দেবকী বসু পরিচালিত **সাপুড়ে** (হিন্দী ও বাংলা ১৯৩৯ সাল), **জওয়ানী-কী রাত** যার বাংলা সংস্করণ হোলো **পরাজয়** চিত্রের নায়িকা।

১৯৪০ সালে অমর মল্লিক পরিচালিক **অভিনেত্রী** ও তার হিন্দী সংস্করণ **হারজিত**।

১৯৪১ সালে **পরিচয়** ও তার হিন্দী ভার্সন **লগন**। এই ছবির জন্যই বি. এফ. জে. এ-র শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেত্রীরূপে পুরস্কৃতা।

১৯৪২ সালে মুক্ত এম. পি. প্রোডাকসনের ব্যানারে প্রথম ছবি **শেষ উত্তর** ও হিন্দী সংস্করণ **জবাব** এর নায়িকা। এ ছবিতেও বি. এফ. জে. এ র পুরস্কারলাভ।

এম. পি. প্রোডাকসনের পরের ছবিগুলি হোলো **যোগাযোগ** (হিন্দীতে হসপিটাল), **বিদেশিনী**। পরিচালক যথাক্রমে সুশীল মজুমদার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র।

এরপর ডিল্যাক্স পিকচার্সের ব্যানারে পথ বেঁধে দিল (হিন্দী রাজলক্ষ্মী)।

এম. পি. প্রোডাকসনের বাইরের অন্যান্য ছবি হোলো তুমি আর আমি, অনির্বাণ, বনফুল, কৃষ্ণলীলা ও এ্যারাবিয়ান নাইট্‌স।

পায়োনীয়ার ও গীতাঞ্জলী পিকচার্সের ব্যানারে তাঁর দুটি ছবি হোলো চন্দ্রশেখর ও কয়লা।

১৯৪৯ মার্চে কানন দেবী প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচার্সের ব্যানারের প্রথম ছবি অনন্যা-য় কেন্দ্রচরিত্রের ভূমিকায়। পরিচালক সব্যসাচী ইউনিট।

শ্রীমতী পিকচার্সের তৃতীয় ছবি মেজদিদিতে নাম ভূমিকায়। পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য।

শ্রীমতী পিকচার্সের চতুর্থ ছবি দর্পচুর্ণ-র নায়িকার ভূমিকায়। পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য।

শ্রীমতী পিকচার্সের পঞ্চম ছবি নববিধান এর প্রধানা নারীচরিত্রে।

শ্রীমতী পিকচার্সের পরের ছবি দেবত্র। তারও পরে আশা তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। পরিচালনা হরিদাস ভট্টাচার্য। ঐ ব্যানারেই হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত অন্নদাদিদি, শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ এ।

অন্নদাদিদির ভূমিকাগ্রহণের পর এ পর্যন্ত ছায়াছবিতে আর তাঁকে দেখা যায়নি।

সমাপ্ত